কোরআন হাদীস
সংকলনের ইতিহাস
কোরআন হাদীস
সংকলনের ইতিহাস
এ কে এম এনামুল হক
স্কোয়াড্রন লিডার (অব:)

কোরআন হাদীস সংকলনের ইতিহাস

এ কে এম এনামুল হক
বিএ (অনার্স) এমএ
স্কোয়াড্রন লিডার (অবঃ)
বাংলাদেশ বিমান বাহিনী

প্রফেসর'স পাবলিকেশন্স

ভূমিকা

যাবতীয় প্রশংসা বিশ্বজাহানের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য। দরুদ ও সালাম তাঁর প্রিয় হাবিব মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহর উপর। কোরআন ও হাদীস মুসলিম মিল্লাতের এক অমুল্য সম্পদ, ইসলামী শরিয়তের অন্যতম অপরিহার্য উৎস এবং ইসলামী জীবন বিধানের মূল ভিত্তি। কোরআন মজীদ যেখানে জীবন ব্যবস্থার মুলনীতি পেশ করে, হাদীস সেখানে এই মুলনীতির বিস্তারিত বিশ্লেষণ এবং তা বাস্তবায়নের কার্যকর পন্থা বলে দেয়। কোরআন ইসলামের প্রদীপ, হাদীস তার বিচ্ছুরিত আলো। ইসলামী জ্ঞান বিজ্ঞানে কোরআন হল হৃদপিন্ড আর হাদীস হৃৎপিন্ডের সাথে সংযুক্ত ধমনী। ইসলামী জ্ঞানের বিশাল ক্ষেত্রে এই হৃৎপিন্ড ও ধমনী প্রতিনিয়ত তাজা তপ্ত শোনিত ধারা প্রবাহিত করে এর অংগ প্রত্যংগকে অব্যাহতভাবে সতেজ ও সক্রিয় রাখে। তেমনি হাদীস মহানবী (সা.) এর পবিত্র জীবন চরিত, কর্মনীতি ও আদর্শ, তাঁর কথা ও কাজ, হেদায়াত ও উপদেশের বিস্তারিত বিবরণ। এ জন্যই ইসলামী জীবন বিধানে কোরআনে হাকীমের পরপরই হাদীসের স্থান।

সৃষ্টির আদিকাল থেকে মানুষের মনের মানসপটে যেসব জীবন জিজ্ঞাসা উকি দিয়েছে তার উত্তর মানুষ খুজেছে ধর্মে, দর্শনে, সভ্যতায়। মানুষ জানতে চেয়েছে বিশ্ব সৃষ্টির উৎস ও তার পরিনতি। তারা প্রশ্ন করেছেঃ মৃত্যুই কি মানব জীবনের পরিনতি? জীবনাবসান যদি জীবনের পরিসমাপ্তি না হয় তাহলে তার স্বরূপ কি? পরকালের কৃতকার্যতার জন্য ইহকালের কোন ধরণের জীবন পদ্ধতি প্রয়োজন? এসব প্রশ্নের উত্তর মানুষের বিবেক বুদ্ধিকে করেছে সর্বক্ষণ আলোড়িত। যুগে যুগে দার্শনিকগণ এসব প্রশ্নের আলোচনা সমালোচনা করেছেন কিন্তু মানব সমাজকে সঠিক পথ নির্দেশনা দিতে পারেননি। তাই দেখে বিশ্ববিখ্যাত জার্মান দার্শনিক ইম্যানুয়েল ক্যান্ট তাঁর বইতে যুক্তি বা দর্শনের সীমাবদ্ধতা সম্বন্ধে সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন।

"পঞ্চ ইন্দ্রিয় মানুষের জ্ঞান আহরণের প্রাথমিক বাহন হিসেবে গণ্য। যদিও ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে মানুষ যুগে যুগে সত্যের অন্বেষণে সচেষ্ট হয়েছে, প্রত্যাশা করেছে জীবন জিজ্ঞাসার উত্তর। কিন্তু ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান মানুষকে

সঠিক উত্তর দিতে সক্ষম হয়নি, হতে পারেনি জ্ঞানার্জনের একক বাহন।"
তাই আমরা দেখতে পাই প্রসিদ্ধ দার্শনিকগণ ইন্দ্রিয়কে মানুষের জ্ঞান আহরণের দুর্বল বাহন বলে আখ্যায়িত করেছেন। সপ্তদশ শতাব্দির নামজাদা দার্শনিক মিসেল ডি মন্টেগা (Michel De Montigue) বলেন মানুষের জ্ঞান অত্যন্ত অপরিপক্ক, আর ইন্দ্রিয় অনিশ্চিত ও ভ্রান্ত। ইন্দ্রিয় লব্ধ জ্ঞান সঠিক কিনা তা আমরা নিশ্চিতভাবে বলতে পারিনা। কারণ ইন্দ্রিয় শুধু মানুষের কাছে তার প্রকৃতি ও অবস্থানানুযায়ী ইহজাগতিক অবস্থা প্রকাশ করে। পঞ্চ ইন্দ্রিয় মানুষকে তার দৈনন্দিন জীবন যাপনে সাহায্য করে কিন্তু বাস্তব নিগুঢ়তম রহস্য উন্মোচনে অসমর্থ। তাই পঞ্চ ইন্দ্রিয় মানুষকে পরকাল সম্বন্ধে কোনো সঠিক উত্তর দিতে অক্ষম ও সৃষ্টি রহস্য উদঘাটনে অপারগ।

জ্ঞানার্জনের আর একটি বাহন হচ্ছে নবী-রাসুলদের নিকট প্রেরিত স্রষ্টার বাণী বা ওহী। যুগে যুগে প্রেরিত পুরুষগণ মানবজাতিকে শুনিয়েছেন মুক্তির বাণী। পয়গাম্বরগণ আল্লাহ্ প্রদত্ত ওহীর মারফত মানুষের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সব প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়ে অন্ধকার থেকে নিয়ে এসেছেন আলোর পথে। তাঁরা যে বাণী প্রচার করেছেন, তা তাদের নিজস্ব ছিল না এবং তাকে তাঁদের অভিমত বলেও দাবী করেনি, যেমনটি করেছেন দার্শনিকগণ। তাঁদের একমাত্র দাবী, তাঁরাই হচ্ছেন নবী-রাসুল, সৃষ্টি ও স্রষ্টার মাঝে একমাত্র সেতু বন্ধন। আল্লাহ্ তায়ালার প্রেরিত বাণী বা ওহীই হচ্ছে তাদের জ্ঞানের একমাত্র উৎস। তাঁরা আল্লাহ্ তায়ালার অভ্রান্ত বাণী প্রচার করেছেন। মানুষের মুক্তির পথ নির্দেশিকা হিসেবে যা দিয়েছেন তা মানুষের সব প্রশ্নের সঠিক উত্তর। তাঁদের এ দাবীর যথার্থতা ছিল প্রশ্নাতীত। কারণ তাঁরা ছিলেন সৎ, সত্যবাদি ও নিষ্কলুস চরিত্রের অধিকারী। তাঁদের ব্যক্তিগত, সামাজিক আচরণ ছিল সমকালীন মানুষের সমালোচনার উর্ধ্বে। ঘোরতর দুশমনও তাঁদের ব্যক্তি চরিত্র সম্পর্কে কোন প্রশ্ন করেনি। সামাজিকভাবে স্বীকৃত সৎ, সত্যবাদী, নিষ্ঠাবান মানুষ কখনো মিথ্যাচারী হতে পারেনা। তাছাড়া তাঁরা কখনো তাদের প্রচারিত বাণী তাদের নিজস্ব বলে দাবী করেননি। তাই আমরা কোরআন মজিদে দেখতে পাই-

اِنَّمَ اَنَا بَشَرٌ مِثْلُ كُمْ يُوْحَي اِلَيَّ-

"আমি তোমাদের মত মানুষ, ব্যতিক্রম শুধু এই যে আমার নিকট আলাহর বাণী প্রেরিত হয়।" (সুরা কাহাফ, আয়াত-১১০)

বর্ণিত আয়াত থেকে আমরা অনুধাবন করতে পারি যে, পয়গম্বর তাঁর বাণীর ব্যাপারে নিজস্ব কোন কৃতিত্বের দাবীদার নন। নেই কোন আত্মম্ভরিতা, কোন আত্মশ্লাঘা বা আত্মপ্রশস্তি। স্রষ্টার বাণী ওহীর সত্যতার অকাট্য প্রমাণ এর চেয়ে বেশী আর কী হতে পারে?

মানব সৃষ্টির আদিকাল থেকে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন এ পৃথিবীতে মানব জাতির হেদায়াতের জন্য লাখো লাখো নবী- রাসুলগণকে তাদের জীবনাদর্শ বা বিধি বিধান সহ তাঁর বার্তা পাঠিয়েছেন। আল্লাহ্ তায়ালা কোরআনে মাজিদে তাই বলেছেন-

وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ

"প্রত্যেক জাতির নিকট সঠিক পথ প্রর্দশক এসেছে।"(সুরা ফাত্তির,আয়াত-২৪)

অন্যত্র আল্লাহ্ তায়ালা বলেছেন- وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ

"আমি প্রত্যেক জাতিকে তার পথ প্রদর্শক দিয়েছি।" (সুরা হিজর, আয়াত-১০)

এসব পথ প্রদর্শক নবী রাসুলগণ তাদের জাতির নিকট আল্লাহ্‌র বাণী প্রচার করেছেন। তাদের জীবদ্দশায় তাদের প্রচারিত এসব বাণী ছিল অর্ন্তবর্তীকালীন জীবন ব্যবস্থা। তারা তাদের উম্মতকে পরবর্তিকালে শেষ রাসূল-নবী মোহাম্মদ মোস্তফা (সা:) এর আগমন ও তাঁর মাধ্যমে চুড়ান্ত বাণী প্রেরণের ভবিষ্যত বাণী করে গেছেন। কিন্তু তাদের প্রচারিত বাণীর সংরক্ষণের কোন অঙ্গিকার করেননি; যা করা হয়েছিল আল্লাহ্ তায়ালার শেষ প্রেরিত বাণী কোরআনের সুরক্ষার জন্য। সেজন্য সে সব নবীদের বাণী বিশুদ্ধ থাকেনি। তাতে বহু অনাহুত আবর্জনা সংক্রমিত হয়েছে।

আল্লাহ্ কোরআনে বলেছেন-

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

"নিশ্চয়ই আমি নাজিল করেছি কোরআন আর এর হিফাজতকারী নিশ্চয়ই আমি।" (সুরা আল হিজর, আয়াত-৯)

আল্লাহ তায়ালা তাঁর ওয়াদা পরিপূর্ণভাবে পালন করেছেন এবং তাঁর পরিকল্পনা অনুযায়ী রাসূলে খোদা (সাঃ) অত্যন্ত দক্ষতার সাথে তা কার্যকর করেছেন।

আমার এ বইতে কোরআন সংরক্ষণের পরিকল্পনা রাসুল (সাঃ) এবং পরবর্তীকালে মুসলমান রাষ্ট্র ও সমাজ তা কিভাবে বাস্তবায়ন করেছে, তা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বিশেষ করে রাসূলে খোদার নিকট কাফেরদের মোজেজা বা অতি প্রাকৃতিক কর্মকান্ড প্রদর্শনের আবদারের বিপরীতে কোরআনে মজিদকে সে মোজেজা হিসাবে রাসূল কর্তৃক দাবী করা এবং এ বাণীর মত করে একটি সুরা রচনা করার আহবান আজ পর্যন্ত কোন অমুসলিম বিদ্যান ব্যক্তি তা প্রকাশ করতে পারেনি। কোরআন পৃথিবীতে অবিশ্বাস্য মোজেজা হিসেবে কেয়ামত পর্যন্ত টিকে থাকবে। আল্লাহ তায়ালা সুরা মুদ্দাসিরে বর্ণিত ১৯ সংখ্যাকে কোরান মজিদ বুননের মাপকাঠি হিসেবে বর্ণনা করে মানব জাতিকে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, কোরআন মানুষের সৃষ্টি নয়। তা মহাশক্তিধর আল্লাহর বাণী ছাড়া আর কিছুই নয়।

ইসলামী আইনের গুরুত্বপূর্ণ দুটি মুল উৎস হল, আল কোরআন ও হাদীসে রাসূল (সা.)। কোরআন হচ্ছে ঐ সব আল্লাহর বানী বা ওহী যা আক্ষরিক ভাবে জিব্রিল মারফত আল্লাহ কর্তৃক তাঁর প্রেরিত রাসুল মোহাম্মদ (সা.) এর নিকট পাঠিয়েছেন। তার আক্ষরিক ভাবে সংরক্ষণের জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (স.) দায়বদ্ধ। এ রকম প্রেরিত বাণীকে ইসলামী পরিভাষায় ওহীয়ে মাতলু বলা হয়ে থাকে। অপরদিকে হাদীস হচ্ছে মহানবীর বাণী। তাঁর আচরিত, অনুমোদিত ও সর্মথিত কার্যাবলী যা তিনি রাসূল পদের দায়িত্ব পালন উপলক্ষে সম্পাদন করেছেন। এসব বাণী ও আচরিত, অনুমোদিত, সমর্থিত কার্যাবলীকে ওহীয়ে গায়েরে মাতলু বলা হয়। এ ওহী দ্বারা প্রাপ্ত মূল ভাবটি রাসূল (সা.) তাঁর নিজস্ব ভাষায় প্রকাশ করার অধিকার আল্লাহ তায়ালা তাঁকে দিয়েছিলেন। রাসূলের এসব বাণী সংরক্ষণের দায় আল্লাহ তা'য়ালা গ্রহণ করেনি। তাই এর সংরক্ষণের দায় দায়িত্ব বর্ত্তায় মুসলমান রাষ্ট্র ও সমাজের উপর, যা তারা বিশ্বস্ততার সাথে পালনে স্বচেষ্ট হন। তাদের এ সজ্ঞান প্রচেষ্টা বহুলাংশে বিশেষভাবে কামিয়াব হয়। আমার বইটিতে আমি তাদের প্রচেষ্টায় হাদীস সংকলন ও

সম্পাদন বিষয় আলোচনা করেছি। জানিনা আমি আমার প্রচেষ্টায় কতদুর কামিয়াব হয়েছি। বইটিতে প্রথম পর্বে কোরআন সম্বন্ধে আলোচনা করেছি এবং দ্বিতীয় পর্বে হাদীস সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়। এ পর্বের প্রথম অধ্যায়ে সংকলন ও সম্পাদনা নিয়ে আলোচনা করা হয়। দ্বিতীয় অধ্যায়ে হাদীসের যাচাই বাছাই ও জাল হাদীস সম্বন্ধে আলোচিত হয়। বইটির উপকরণ সংগ্রহে আমি বহু মনীষীর বই পর্যালোচনা করি। এছাড়া এ বিষয়ে বিভিন্ন উৎস থেকে যেমন পত্রিকা, ইন্টারনেট এর সাহায্য নেই। তাই বইটি মুলতঃ সেসব জ্ঞানী গুনী ব্যক্তিদের লেখনির নির্যাস। আমি শুধু নিয়ামক হিসাবে তা এ বইটিতে একত্রিত করে দিয়েছি। তাই সব ক্রেডিট তাদের। আমি শুধু দোয়া প্রার্থী।

বইটি লেখার বিভিন্ন পর্যায়ে জনাব শাহবুদ্দিন (এম এ), প্রাক্তন জেনারেল ম্যানেজার, বাংলাদেশ শিপিং করপোরেশনের সাহায্য ও সহায়তা অনস্বিকার্য। বইটি প্রকাশনার ক্ষেত্রে আমার অনুজ আমিনুল ইসলাম, প্রকাশক প্রফেসরস পাবলিকেশন্স এর অনুপ্রেরনা, তার শত ব্যস্ততা সত্ত্বেও বইটির প্রুফ রিডিং এবং কারেকশানে তার সময় প্রদান বইটি প্রকাশের ব্যবস্থাপনায় বিপুল ভূমিকা রাখে। তাই তার প্রতি রইলো দোয়া ও ভালোবাসা। বইটিতে কোন ভুল পরিলক্ষিত হলে অবগত করলে কৃতজ্ঞ থাকবো। আল্লাহ্ আমাদের ত্যাগ ও কোরবানী কবুল করুন এবং বিনিময়ে উত্তম প্রতিদান দিন। আমীন। চুম্মা আমীন।।

–মুহাম্মদ এনামুল হক

উৎসর্গ

মরহুম আব্বাজান আলহাজ্ব হাকীম মাওলানা
আব্দুল হক সাহেব
ও
মরহুমা আম্মাজান মোসাম্মাত মাহবুবা খাতুনের
স্মৃতির উদ্দেশ্যে...

সূচীপত্র

প্রথম পর্ব
কোরআন সংকলনের ইতিহাস

প্রথম অধ্যায়:

দ্বিতীয় পর্ব
হাদীস সংকলনের ইতিহাস

প্রথম অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ

সত্যের কষ্ঠিপাথরে হাদীসে রাসূল

তৃতীয় অধ্যায়

কোরআন হাদীস সংকলনের ইতিহাস

প্রথম পর্ব
কোরআন সংকলনের ইতিহাস

প্রথম অধ্যায়

পটভূমিঃ স্রষ্টার অস্তিত্ব ও একাত্ববাদ

এ অসীম বিশ্ব যে একমাত্র আল্লাহর সৃষ্ট এবং বিশ্বজগতের স্রষ্টা যে সর্বশক্তিমান আল্লাহ; অবিশ্বাসীগণ তা অস্বীকার করে। তাদের বক্তব্য হল সৃষ্টিকর্তার ধারণা মানব কল্পনা প্রসূত। তাদের এ দাবির পেছনে সবচেয়ে বড় যুক্তি তারা এভাবে উপস্থাপনা করে। "আল্লাহকে আমরা দেখিনা, তাঁর কথা শুনিনা, তাঁকে পাঁচ ইন্দ্রিয়ের কোনটা দিয়েই অনুভব করতে পারিনা" পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা কোন কিছু অনুভব করতে বা ধরতে না পারলে তার অস্তিত্ব অস্বীকার করা অবৈজ্ঞানিক। কোন কিছুর সরাসরি বা প্রত্যক্ষ প্রমাণ না দিতে পারলেও পরোক্ষ প্রমাণ দিয়েই তার অস্তিত্ব স্বীকার করে নেওয়া হয়। ধরুণ মানুষের মনও হৃদয় এ দু'টি জিনিস আছে বলেই মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব। কিন্তু এ মন ও হৃদয় কি পাঁচ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ধরা যায়? উত্তর ধরা যায় না। চোখে না দেখলে হাতে না ছুলে শুনতে না পেলে কোন কিছুকে বিশ্বাস করতে আমাদের মন চায় না। যে মন ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য নয় এমন অন্য কিছুর অস্তিত্বে বিশ্বাস করতে অনাগ্রহী; সে মনকে আমরা কি কখনও দেখেছি? এমনকি অনুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়েও কি কেউ পরখ করতে পেরেছি? ছবি তুলতে পেরেছি কি কোন যন্ত্র দিয়ে? মনের কোন গন্ধ, কোন স্বাদ, কোন শব্দ গ্রহণ করতে পেরেছি কি? পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা মনের অস্তিত্বের প্রমাণ না করতে পারলেও আমরা জানি মন আছে। মন আছে বলেই মানুষ চিন্তা করতে পারে কল্পনা করতে পারে।

জ্যামিতিক স্বতঃসিদ্ধের মত আমরা মেনে নিয়েছি আমাদের মন আছে। এভাবে মন আছে বলে ধরে নিয়েছি। মনের অস্তিত্বের কোন সরাসরি প্রমাণ দিতে পারি না। পরোক্ষ প্রমাণ পেয়েই মনের অস্তিত্ব মেনে নিয়েছি। এক কথায় পরোক্ষ প্রমাণ সত্য। অর্থাৎ ফল দেখে আমরা কারণের খোঁজ

পেয়েছি। ফল থাকলে আমরা ধরে নেই তার কারণ থাকবে। এ জন্য পরিকল্পনা মত কাজ দেখলেই আমরা ধরে নেই- মন আছে। কিন্তু আবার প্রশ্ন উঠতে পারে- ফল দেখলেই তার কারণ থাকতে হবে এরও কি কোন মানে হতে পারে? যারা আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাসী নন তারা আদি বস্তুর কারণ আছে বলে কি মানবে? কাজেই ফল থাকলে তার কারণ থাকতে হবে তারও বা কি যুক্তি হতে পারে? সুতরাং ফল দেখে মনের অস্তিত্বের প্রমাণ হল কিরূপে? তবে হ্যাঁ, যদি আমরা ধরে নেই কারণ ছাড়া ফল হতে পারে না, তাহলে অবশ্য মনের অস্তিত্ব প্রমাণ হয়ে যায়। কিন্তু এ যে প্রমাণ- এটা নির্ভর করল ধরে নেওয়ার উপর বা কল্পনার উপর। অন্য কথায় ফল থাকলে কারণ থাকে এ বিশ্বাসের উপর। এবার প্রশ্ন দাঁড়ায় তাহলে যুক্তি কি- প্রমাণ কি? আগের বিশ্লেষণ বলে দেয়; যুক্তি প্রমাণ নির্ভর করে ধরে নেওয়ার উপর। জ্যামিতির স্বতঃসিদ্ধের মত মূলগতভাবে ধরে না নিলে কিংবা বিশ্বাস না করলে যুক্তি চলে না–

প্রমাণ এগোয় না এটমের চারি দিকে ইলেকট্রনগুলো অহরহ ঘুরছে বিভিন্ন চাকে। বোহরের শুরু করা এ তত্ত্ব বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করেন। বিশ্বাস করেন এ জন্য বলা হলো যে, এটম ইলেকট্রন আর এ ঘূর্ণন কেউ দেখেনি। শক্তিশালীতম অনুবীক্ষণ দিয়েও তা দেখা সম্ভব নয়। তবু বিজ্ঞানীরা ধরে নিয়েছেন- এটম আছে ইলেকট্রন প্রোটন আছে- আর এগুলো ঘুরছে সঠিক নিয়মে, সঠিক শৃঙ্খলায়। বিজ্ঞানীরা ধরে নিয়েছেন এজন্যে যে, এভাবে ধরে না নিলে কতকগুলো ঘটনা ব্যাখ্যা করা যায় না। আর এ কারণ নির্দেশ করতে গিয়েই এ ধরে নেওয়ার অপরিহার্যতা।

গতি তত্ত্ব- ডারউইন তত্ত্ব যার উপর ভিত্তি করে নাস্তিকতাবাদীরা সৃষ্টির কারণ ব্যাখ্যা করেন বা অন্য যত তত্ত্বই আমরা বিচার করিনা কেন সবটাতেই আছে এ কারণ নির্দেশের চেষ্টা। আর কাজেই এতে প্রমাণিত হয়, কল্পনা বা ধরে নেওয়া ছাড়া বৈজ্ঞানিক প্রমাণ অচল, অর্থাৎ প্রমাণ ও যুক্তিতেই গা ঢাকা দিয়ে লুকিয়ে আছে ধরে নেওয়া বা অনুমানযোগ্য কল্পনা।

একটা সাধারণ উদাহরণ দেওয়া যাক- বলা হল এ ফুলটি সাদা। যদি প্রশ্ন করা হয়- তার প্রমাণ কি? কি উত্তর দেবেন আপনি তখন? বলবেন আমি চোখে দেখেছি ফুলটি সাদা। যদি বলা হয়, তার প্রমাণ কি? দেখাটাই কি অকাট্য প্রমাণ? আপনি এতে থতমত খেয়ে যাবেন। দেখে আপনার যে অনুভূতি হয়- তাকে আপনি সাদা বলছেন। ধরা যাক- অন্য গ্রহ থেকে একটি

জীব এসে বলল- তার অনুভূতি এক নয় ও ফুল সাদা নয় অন্য কিছু তখন! আপনি এখানে ধরে নিয়েছেন, ঐ ফুল দেখলে সচরাচর একই অনুভূতি বা সাদার অনুভূতি হয়। আপনি বিশ্বাস করেছেন- এই ফুলের ব্যাপারে সকলের অনুভূতি একই রকম হয়। কিন্তু আপনি তো স্বীকার করবেন- রঙ্গিন চশমা দিয়ে দেখলে কিংবা খারাপ চোখ দিয়ে দেখলে বা কালার ব্লাইন্ড হলে ফুলটির রং অন্য রকমও দেখা যেতে পারে। অনুভূতি সাদা হলেই যে ফুলটির রং সাদা হবে তার নিশ্চয়তা নাই। জিনিসের অস্তিত্ব স্বীকার করতে হবে? তাহলে আয়নায় যে ছবি দেখি কিংবা মরুভূমিতে যে মরীচিকা দেখতে পাই অথবা আমরা যে সব সময় দেখছি সূর্য পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরছে কিংবা ট্রেনে চড়ে দেখি যে সব গাছপালা ঘর বাড়ী উল্টো দিকে ছুটছে এসবই কি সঠিক?

কাজেই ধরে নিতে হয়, দেখা জিনিসও সবসময় সত্য নয়। দেখা অনুভূতি প্রমানের ভিত্তি নয়। দেখাটাই যদি প্রমাণ হত তবে অনেক মিথ্যাই সত্য হয়ে উঠত। এ যে সূর্যের চারিদিকে পৃথিবী ঘুরার কথা- এটাও দেখা দ্বারা প্রমাণ করে নয়। ধরে নেওয়ার প্রমাণ। ধরে নেই এ জন্য যে, যদি পৃথিবীকে সূর্যের চারিদিকে ঘুরাই তবে আমরা বহু ঘটনার ব্যাখ্যা করতে পারি নতুবা নয়। এখানে পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘুরার কথা আমরা ধরে নিয়েছি।

অতএব, সিদ্ধান্ত দাঁড়াল সুবিধার জন্য ধরে নিতে হয়। আর এ ধরে নেওয়াটাই অসংখ্য প্রমাণের ভিত্তি হয়ে দাঁড়ায়। ধরে নেওয়া বা ধারণা করা অবৈজ্ঞানিক কিছু নয়। বরঞ্চ বিজ্ঞানসম্মত। তাই সৃষ্টিকর্তার ধারণা যা কোরআন ও অন্যান্য আসমানী কিতাবে বর্ণিত হয়েছে তা একান্ত বিজ্ঞান সম্মত। বিজ্ঞান পরিপন্থি নয়।

সৃষ্টির আদি কারণ জানার আগ্রহ মানুষের চিরন্তন। এখানে বিজ্ঞানী ও দার্শনিকদের নিত্য নতুন প্রচেষ্টার ইতিহাস খুবই চমকপ্রদ। নিহারিকা কল্পনা ও ডারউইনের বিবর্তনতত্ত্ব সৃষ্টির অনেক কিছু ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছে। এসব কল্পনায় সৌরজগতের বিশেষ করে সূর্য বা পৃথিবীর সৃষ্টি কিরূপে হয়েছে তা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হয়েছে। এতে অনেকগুলো ধরে নেওয়া কল্পনা রয়েছে। ধরে নেওয়া হয়েছে যে, পয়লা আদিতে বস্তু ছিল নিহারীকা আকারে। দোসরা কোন কারণে নিহারীকা ঘুরছিল। তেসরা, ঘুর্ণনকালে কোন কোন অংশ রিং এর আকারে বিচ্ছিন্ন হয়। চৌঠা, পৃথিবী ঠান্ডা হলে কোন কোন কারণে জীবের উৎপত্তি হল ইত্যাদি। পৃথিবী সৃষ্টির ও কোটি কোটি বছর আগে যে আদিকালে জীবন বলে কিছু ছিল না। তখন যে

এরূপটি ঘটেছে তা হল নিছক কল্পনা। তা দেখার শোনার বা সে বিষয় কোন ইতিহাস পাওয়ার সূত্র আজ আর নেই। তবুও বিজ্ঞানীরা একে সত্য বলে মেনে নিয়েছিলেন। পরবর্তীকালের বিচারে তা অচল বলে প্রমাণিত হয়েছে।

মজার কথা এই যে, উপরে বর্ণিত সব কটি তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে নাস্তিকতা দাঁড়িয়ে থাকলেও তত্ত্বগুলো আল্লাহর অস্তিত্বকে অস্বীকার করেনি। বরং নিহারীকা বা সূর্য তারকার সৃষ্টি হল কিভাবে। কিভাবে বিভিন্ন প্রাকৃতিক আইনের উৎপত্তি হল আর কেনইবা জীব জগত অজান্তে একশ্রেণী থেকে অন্য শ্রেণীতে বিবর্তিত হল, একটি বিবর্তনের ধারা শেষ অবস্থায় গেলে তা বিলুপ্ত হয় কেন? এর মূল কারণ কি? ইত্যাদির সঠিক ব্যাখ্যাও এসব তত্ত্ব দিতে পারেনি। ব্যাখ্যা দিতে পারেনি বলেই বিজ্ঞানী ও দার্শনিকের মনে সৃষ্টিকর্তার ধারণা উকি দিয়ে ফিরেছে।

সৃষ্টিকে ব্যাখ্যা করার জন্য এরা প্রাকৃতিক আইন তত্ত্ব ও কল্পনার আশ্রয় নিয়েছেন। অনেক কিছু ধরে নিয়েই তারা জীবজন্তুর বর্তমান অবস্থা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। বস্তু ও জীব বর্তমান স্তরে কিভাবে এল তত্ত্বগুলো শুধু তাই ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করে। মূল বস্তু ও শক্তি কোথা হতে এল? কিভাবে এল? এদের বিশেষ ধর্মগুলি পেল কোথায়? আইন বা নিয়মগুলোর মূল কি? আইনগুলো নিয়ন্ত্রিত হয় কিসে? সুশৃঙ্খল সংস্থানের পরিকল্পনা করল কে? ইত্যাদি মৌলিক প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেনি। তত্ত্বগুলোতে গ্রহ উপগ্রহের রূপায়ন ও জীবের রূপান্তর কিভাবে হল শুধু তারই পথ দেখানোর চেষ্টা হয়েছে। বস্তু আইন বা সুশৃঙ্খল অবস্থার মূল কারণ এর কোনটিতে দেখানো হয়নি। কাজেই বলা যায়, বিজ্ঞানের আবিস্কারের মূল তিনটি বিষয়ের ব্যাখ্যা নাস্তিকেরা দিতে পারেনি। অপর দিকে আস্তিকদের ব্যাখ্যা মতে বস্তু শক্তি ও আইন এবং এদের কাজের ফলে যে সুশৃঙ্খল অবস্থান তা সবেরই মূল হচ্ছেন আল্লাহ তায়ালা। আস্তিকেরা যুক্তি দিয়ে বলেন, মানুষের জ্ঞান ও শক্তি অসীম নয়- এজন্য আল্লাহ সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান মানুষের আয়ত্বের বাহিরে। তাদের মতে আল্লাহ সৃষ্টিশক্তির মূল- একমাত্র হোতা। সুতরাং বস্তু, শক্তি, আইনও তারই সৃষ্টি। সমস্ত নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতাও তাঁর। তাই যাবতীয় প্রাকৃতির আইনের সৃষ্টি ও নিয়ন্ত্রণ তাঁর দ্বারা সম্ভব। সব মনের মূল ও আল্লাহ। সুতরাং মূল পরিকল্পনা তাঁরই। ফলে তারই সৃষ্টি শক্তি ও আইনের মারফত বস্তু সাজানো অবস্থায় আসে। কারণ- Arrangement pre-supposes planning and planning Pre-supposes mind. কাজেই বলা যায়, আল্লাহ তত্ত্ব স্বীকার

করে নিলে বিজ্ঞানের দ্বিতীয় কাজ অর্থাৎ আবিস্কৃত বিষয়ের সহজ ব্যাখ্যা মিলে।

নাস্তিক্যবাদী চিন্তাধারার রূপ

নিহারিকা ও অন্যান্য তত্ত্ব

আস্তিক্যবাদী চিন্তাধারার রূপ

আল্লাহ

পরিকল্পনা

ভর, শক্তি ও আইন

নিহারিকা

সূর্য

পৃথিবী
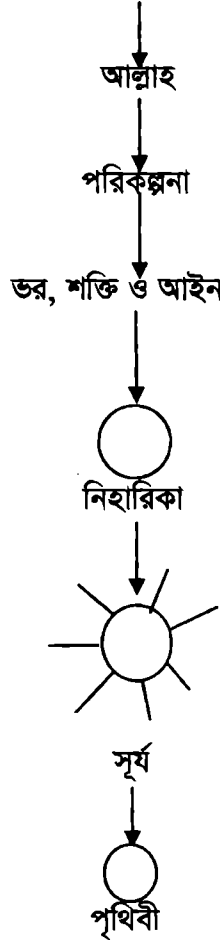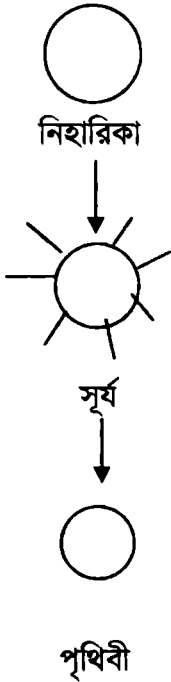
আস্তিক্যবাদীদের সৃষ্টির ব্যাখ্যাকে উপরে অংকিত ছবিতে দেখানো হয়েছে যা তাদের বক্তব্যকে বুঝতে বিশেষ সাহায্য করবে। দ্বিতীয় ছবিটিকে বিবেচনা করা যাক-

মনে করুন আল্লাহ্ তার পরিকল্পনা অনুসারে ভর (Mass) শক্তি ও আইন সৃষ্টি করেছেন যাতে নিহারিকা নেবুলা গঠিত হয়ে আইন ও গুণের প্রভাবে ঘুরন্ত ও উত্তপ্ত সূর্যের উদ্ভব হয়। এরূপ অন্য তারার কাছে আসার জন্যই হোক অথবা যমজ তারার কারণেই হোক কিংবা কোন রকম বিস্ফোরণের বা ঘূর্ণনের ফলে হোক, সূর্য হতে কয়েকটি খন্ড বিচ্ছুরিত হয়ে গ্রহের সৃষ্টি করে। আর একই কারণে গ্রহ থেকে উপগ্রহের উদ্ভব হয়। এর পর পারিপার্শ্বিক অবস্থা জীবন ধারণের উপযোগী হওয়ার পর আল্লাহর আইন অনুসারে জীব ও বর্তমানে বিবর্তিত রূপ লাভ করে।

উপরের বর্ণনা থেকে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়- আল্লাহতত্ত্ব ছাড়া কোন তত্ত্বই সৃষ্টির সুন্দরতম ব্যাখ্যা দিতে পারে না। এমন কি নিহারিকাতত্ত্ব, ডারউইনতত্ত্ব ইত্যাদিকে সত্য বলে ধরে নিলে ও সৃষ্টির ব্যাখ্যা অপুর্ণ থেকে যায়, এমন কি যে তরিকা সৃষ্টি বর্তমান অবস্থা পেয়েছে বলে ধরে নেওয়া হয়- তার কারণের ব্যাখ্যা ও তাতে পাওয়া যায় না। কিন্তু আল্লাহতত্ত্ব মেনে নিলে সৌরজগত সৃষ্টির বিবর্তনের মূল কারণ ও সহজে পাওয়া যায়।

এখানে আর একটি কথা বলে রাখা প্রয়োজন, বিশ্বে সূর্যের সমান কোটি কোটি তারা মহাকাশে ছড়িয়ে রয়েছে। আমরা কল্পনা করতে পারি হয়ত এদের অনেকগুলোর গ্রহ-উপগ্রহ বিরাজমান রয়েছে। এই যে বিরাট সৃষ্টি-বিজ্ঞান কোন তত্ত্বের দ্বারা এর মূল কারণ নিরূপন করতে পারিনি। আল্লাহ তত্ত্ব মেনে নিলে সবকিছু সহজে ধরা পড়ে। এভাবে প্রমাণিত হয়; পৃথিবী ও মহা সৃষ্টির যাবতীয় বস্তু শক্তি ও আইনের এবং জীব জগতের সৃষ্টির কারণ ও পুরো ব্যাখ্যা দিতে পারে একমাত্র আল্লাহতত্ত্ব। এমনকি নিহারিকা তত্ত্ব বা বিবর্তন তত্ত্বের ব্যাখ্যাও এ আল্লাহ তত্ত্ব ছাড়া দেওয়া সম্ভব নয়। অতএব, বিজ্ঞানের আবিস্কৃত বস্তু ও ঘটনার প্রমাণের জন্য আল্লাহতত্ত্ব অপরিহার্য। তাই আস্তিকেরা বলেন, আল্লাহ তত্ত্ব যারা অস্বীকার করেন তারা বিজ্ঞানের মূলনীতিকেই অস্বীকার করে বসেন।

মানুষের অনুসৃত যুক্তি দ্বারাই উপরের সিদ্ধান্তে পৌছানো হয়েছে। আগেই আমরা দেখেছি মানুষের যুক্তি নির্ভর করে প্রধানতঃ কার্য কারণ সম্পর্কের উপর। কোন কাজ দেখলেই আমরা ধরে নেই তার কোন কারণ আছে। বস্তু,

শক্তি, আইন ও তার ফলে সুশৃঙ্খল অবস্থা এগুলো বিজ্ঞানের মূল আবিস্কার। যুক্তি বলে দেয় এগুলোর মূল কারণ অবশ্যই আছে। বিজ্ঞান মহা বিশ্বের বিরাট পরিকল্পনা লক্ষ্য করেছে। পরিকল্পনার জন্য চাই মন। কাজেই সৃষ্টির আদি কারণ কোন নির্মম নির্জীব বস্তু হতে পারেনা, হতে পারে মহা মনের অধিকারী একটি একক সত্ত্বা। একক সত্ত্ব এ জন্য বললাম কারণ যদি একক সত্ত্বা না হত তাহলে এ মহাবিশ্বের সুশৃঙ্খল ও সুসজ্জিত অবস্থায় বিশৃঙ্খলা দেখা দিত। কোরআন মজীদে তা এভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে-

وَلَوْ كَانَ اٰلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا

"আল্লাহ ছাড়া যদি আরও সৃষ্টিকর্তা থাকত তাহলে মহাজগতে (আসমান ও জমীনে) বিশৃঙ্খলা দেখা দিত।" (সুরা আম্বিয়া, আয়াত-২২)

উপরে উল্লিখিত আলোচনা থেকে আমরা সিদ্ধান্ত নিতে পারি- আল্লাহ অর্থাৎ স্রষ্টার ধারণা বিজ্ঞান সম্মত। স্রষ্টার ধারণা এবং বিশ্ব স্রষ্টা আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস একমাত্র বিজ্ঞানের বহু আবিস্কারের রহস্যের ব্যাখ্যা অনুধাবনে সাহায্য করবে। তা না হলে বিজ্ঞানের নানা আবিস্কার তত্ত্ব ইত্যাদি অসম্পূর্ণ থেকে যায়। মহা বিশ্বের স্রষ্টা আল্লাহ তা'য়ালার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি বনি আদমের হেদায়েতের জন্য এবং মঙ্গলময় জীবন যাপনের জন্য রাসুলে খোদার নিকট ওহীর মাধ্যমে তাঁর বাণী প্রেরণ করেছেন। ওহী মারফত প্রাপ্ত কোরআনের বাণীতে বিশ্বাস বিজ্ঞান ভিত্তিক। তাই যে কোরআনের বাণী ওহী মারফত আল্লাহ প্রেরণ করেছেন সে ওহীর তাৎপর্য অনুধাবন করা প্রয়োজন এবং ওহী সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনাও প্রয়োজন। (প্রিন্সিপাল আবুল কাশেমের বিজ্ঞান ও কোরআন গ্রন্থ থেকে সংকলিত)

ওহী

ওহী শব্দের আভিধানিক অর্থ ইশারা করা, ইংগিত করা, মনের মধ্যে কোন কথা নিক্ষেপ করা, গোপনে কোন কথা বলা। আল্লামা আবু ইসহাকের বর্ণনা অনুযায়ী- সকল অভিধানেই ওহীর আসল অর্থ কাউকে গোপনে কিছু জানিয়ে দেওয়া। ইসলামী পরিভাষায় ওহী হচ্ছে- "কালামুল্লাহিল মুনজাল আলা নাবিয়্যিন।"

আল্লাহর প্রেরিত বাণী কোন নবী বা প্রেরিত পুরুষের প্রতি অবতীর্ণ করা। কোরআন মজীদে ব্যাপক অর্থে ওহী শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। তাই দেখা যায় কোরআন মজিদে ওহী আসমান, জমিন, জীব জন্তু, জড় প্রদার্থের উপর

অবতীর্ণ হয়েছে বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। নিম্নে বর্ণিত কোরআনের আয়াতগুলো দৃষ্টান্ত হিসাবে বর্ণিত হল–

وَاَوْحٰى فِىْ كُلِّ سَمَاۤءٍ اَمْرَهَا ـ

“আকাশের উপর ওহী প্রেরণ করা হয় এবং সেই অনুযায়ী তার সমগ্র ব্যবস্থা পরিচালিত।” (হামিম আস সিজদা-১২)

يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا ـ بِاَنَّ رَبَّكَ اَوْحٰى لَهَا ـ

কোরআনের উপরোক্ত বর্ণনানুযায়ী মমার্থ হল- জমিনের উপর ওহী অবতীর্ণ করা হয় যার কারণে কাল বিলম্ব না করে সে নিজের কাহিনী শুনাতে থাকে। (সুরা আল জিলজাল)

وَاَوْحٰى رَبُّكَ اِلَى النَّحْلِ اَنِ اتَّخِذِىْ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا وَّمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُوْنَ ـ

“মৌমাছিদেরকেও ওহীর মাধ্যমে পাহাড়গুলোতে তাদের ঘরবাড়ী তৈরী (প্রাকৃতিক শিল্প) করা শেখানো হয় ।” (আন নাহল, আয়াত-৬৮)

এ ধরণের ওহী থেকে কোন মানুষ বঞ্চিত নয়। পৃথিবীতে যতসব আবিস্কার, যতগুলো নতুন বস্তু বিষয় উদ্ভাবিত হয়েছে, বড় বড় চিন্তাবিদ, রাষ্ট্রনায়ক, লেখক, যে সমস্ত মহৎ কাজ সম্পন্ন করে গেছেন বা আলোড়ন সৃষ্টিকারী দর্শণ ও চিন্তাধারার প্রবর্তন করেছেন তাতে এ প্রকারের ওহীর কার্যকারিতা দেখা যায়। এমন কি সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনে নিত্য নতুন অভিজ্ঞতায়ও ওহীর প্রতিফলন দৃষ্টিগোচর হয়। কিন্তু নবীদের নিকট প্রেরিত ওহী ও এ সমস্ত ওহীর মাঝে পার্থক্য সুস্পষ্ট। নবীদের নিকট প্রেরিত ওহী সম্বন্ধে নবীগণ সচেতন। তা যে আল্লাহ পাকের নিকট হতে অবতীর্ণ হয়েছে সে ব্যাপারে তাঁরা সুনিশ্চিত এবং পূর্ণ বিশ্বাসী। মানবজাতিকে সঠিক পথ দেখানোই এ ধরণের ওহীর উদ্দেশ্য। অন্যসব ওহী এ পর্যায়ে পড়েনা। নবীদের নিকট প্রেরিত ওহীর অভ্রান্ত হওয়া এবং সঠিকভাবে তাঁদের নিকট পৌছানোর দায়িত্ব আল্লাহর নিজেরই, তার জন্য তিনি নিশ্চয়তা দিয়েছেন। কোরআনে তা এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে–

عٰلِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلٰى غَيْبِهٖۤ اَحَدًا ـ اِلَّا مَنِ ارْتَضٰى مِنْ رَّسُوْلٍ فَاِنَّهٗ يَسْلُكُ مِنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهٖ

رَصَدًا ـ لِّيَعْلَمَ اَنْ قَدْ اَبْلَغُوْا رِسٰلٰتِ رَبِّهِمْ وَاَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَاَحْصٰى كُلَّ شَىْءٍ عَدَدًا

"তিনি (আল্লাহ) (অদৃশ্য) সম্পর্কে জ্ঞাত। নিজের গায়েব সম্পর্কে কাউকেও জ্ঞাত করেন না, তবে একমাত্র সে রাসুলকে জ্ঞাত করে থাকেন, যাকে তিনি গায়েবের কোন জ্ঞান দানের জন্য পছন্দ করেন। তখন তিনি সামনে-পেছনে সংরক্ষক নিযুক্ত করেন যাতে তিনি জানতে পারেন যে, তারা নিজেদের প্রতিপালকের বাণী পৌছিয়ে দিয়েছে। আর তিনি তাদের সমগ্র পরিবেশে ঘিরে আছেন এবং প্রত্যেকটি বস্তু গুণে রেখেছেন।" (সূরা জ্বিন, আয়াত ২৬-২৮)

ওহী, ইলহাম ও কাশফ

ওহী, ইলহাম, ইলকা কাশফ সমার্থক। পরিভাষিক অর্থে ওহী শুধু নবীদের জন্য প্রযোজ্য। অন্যগুলো সবাইর জন্য প্রযোজ্য। ইসলামী পরিভাষায় কাশফ ও ইলহাম সাধারণতঃ ওলী, মোজাদ্দেদগণের বৈশিষ্ট হিসেবে গণ্য। কাশফ ও ইলহাম দ্বারা প্রাপ্ত বিষয় দলিল হিসেবে গণ্য করা যায় না। তা যদি কোরআন ছুন্নাহ বিরোধী হয় তাহলে অনুসরণ শরিয়ত বিরোধী।

আল্লামা আসকালানীর বক্তব্য এ ব্যাপারে প্রনিধানযোগ্য। তিনি বলেন "এমন কি যদি কোন ব্যক্তি কাশফ বা ইলহামের মাধ্যমে কোন বিষয় প্রাপ্ত হয় কোরআনের মানদন্ডে তা যাচাই করে নেওয়া তার জন্য জরুরী। নিছক কাশফ বা ইলহামের উপর নির্ভর করে সিদ্ধান্ত নেওয়া ঠিক নয়।" (ফাতহুল বারী ৭ম খন্ড ৩৭পৃঃ)

উপরোক্ত আলোচনা থেকে জানতে পারি যে, ওহী তিন প্রকার। যথা–

(১) এ প্রকার ওহীঃ যার মাধ্যমে আল্লাহ তার প্রত্যেক সৃষ্ট জীবকে তার প্রয়োজনীয় কাজ শিখিয়ে দেন তা জিবিল্লি বা তাবিয়ী ওহী নামে পরিচিতি। এ প্রকার ওহী সর্ব প্রকার জীবজন্তু, পশুপাখী, উদ্ভিদ ও জড় পদার্থ সব কিছুর প্রতি অবতীর্ণ হয়।

(২) দ্বিতীয় প্রকারঃ ওহীর মাধ্যমে আল্লাহ তার কোন বান্দাকে জীবন সংক্রান্ত বিষয়াদির মধ্য থেকে কোন কৌশল শিক্ষা দেন বা হেদায়েত দান করেন। এ ধরণের ওহীকে জুযয়ী বা আংশিক ওহী বলা হয়। পৃথিবীর বড় বড় আশ্চর্যজনক আবিস্কার বা তত্ত্বের উদ্ভাবন এ ওহীর সাহায্যে সফল হয়। সাধারণ মানুষ এ ধরণের ওহী থেকে বঞ্চিত নয়। তাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতায় এ ওহী মদদ জোগায়। গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর পেছনে এর কার্যকারিতা দেখা যায়। দেখা যায় কোন এক যুগ সন্দিক্ষণে ঘটনা প্রবাহের মধ্যে হঠাৎ করে একটি বিশেষ ঘটনা ঘটে গেছে যা ইতিহাসের গতি

প্রবাহে এক বিস্ময়কর যুগান্তসৃষ্টিকারী প্রভাব বিস্তার করেছে। এ ধরণের ওহী হযরত মুসার (আ.) মায়ের উপর অবতীর্ণ হয়েছিল।

وَاَوْحَيْنَا اِلٰى اُمِّ مُوْسٰى اَنْ اَرْضِعِيْهِ ۚ فَاِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَا لْقِيْهِ فِى الْيَمِّ وَلَاتَخَافِىْ ۚ وَلَا تَحْزَنِىْ۔

"এবং আমি মুসার (আঃ) মায়ের অন্তরে একথা উদয় করে দিয়েছি যে, তুমি তাকে স্তন্য প্রদান কর, অত:পর যখন তার সম্পর্কে কিছু আশঙ্কা দেখ তখন তাঁকে নদীতে নিক্ষেপ কর, আর তুমি ভীত ও সন্ত্রস্ত হবে না।" (আল কাসাস, আয়াত-৭)

(৩) তৃতীয় প্রকার: ওহীর মাধ্যমে আল্লাহ তাঁর বান্দাকে গায়েবের (অদৃশ্য জগতের) নিগুড় তত্ত্ব সম্পর্কে অবহিত করেন এবং জীবন ব্যবস্থা সম্পর্কে তাঁকে হেদায়েত দান করেন। উদ্দেশ্য হচ্ছে তিনি জ্ঞান ও হেদায়েত সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছাবেন, তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে আনবেন। এ ওহী একমাত্র নবীদের উপর অবতীর্ণ হয়। কোরআন থেকে জানা যায়, এ ধরণের জ্ঞানের নাম ইলকা, ইলহাম, কাশফ বা পরিভাষিক অর্থে ওহী যা রাখা হোক না কেন পয়গাম্বর বা রাসুল ছাড়া আর কাউকেই দেওয়া হয় না। এ পর্যায়ের জ্ঞান নবীদেরকে এমনভাবে দেওয়া হয় যার ফলে তাঁরা পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করতে সক্ষম হন যে, এ জ্ঞান আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে। যা শয়তানের অনুপ্রবেশ থেকে সম্পূর্ণ সংরক্ষিত এবং নিজেদের চিন্তা, কল্পনা ও প্রবৃত্তির প্রভাব থেকে তা পুরোপুরি মুক্ত।

যুগে যুগে প্রতিটি দেশ ও জাতির নিকট পয়গাম্বর ওহীর মাধ্যমে প্রাপ্ত আল্লাহর বাণী মানব জাতির নিকট প্রচার করেছেন। তাদের সততা ও সত্যনিষ্ঠা ছিল তৎকালীন সমাজের সকলের নিকট প্রশ্নাতীত। তাঁদের ব্যক্তিগত জীবন ছিল কলুষমুক্ত। এ সত্যবাদী সৎ ও কালিমা মুক্ত মানুষগুলো আল্লাহ থেকে প্রাপ্ত ওহী সম্বন্ধে যে দাবি করেছেন তা মিথ্যা হতে পারে না। তাঁরা ওহী মারফত প্রাপ্ত আদর্শ যা আলোর দিশারী হিসেবে মানব সমাজকে সঠিক জীবন ব্যবস্থার প্রতি পথ প্রদর্শন করেছেন। তা তাদের উদ্ভাবিত কিছু বলে কখনও কৃতিত্বের দাবিদার ছিলেন না। তারা শুধু আল্লাহ প্রদত্ত ওহী প্রচারক হিসেবেই নিজেদেরকে উপস্থাপন করেছেন।

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى ۙ اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْىٌ يُّوْحٰى ۔

"রাসুল নিজের ইচ্ছামত কিছু বলেন না। তিনি যা বলেন তা ওহী বা আল্লাহর বাণী হিসেবে প্রাপ্ত।" (আন নাজম, আয়াত- ৩,৪)

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে-

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ-

"নিশ্চয় আমি তোমাদের মতই একজন মানুষ। ব্যতিক্রম শুধু আমার নিকট আল্লাহর বাণী প্রেরিত হয়।" (সুরা কাহাফ, আয়াত-১১০)

অন্যদিকে আমরা দেখতে পাই যুগে যুগে আবিস্কারক, চিন্তাবিদ ও দার্শনিকগণ তাদের আবিস্কার ও মতবাদকে নিজস্ব বলে দাবি করেছেন। আমাদের আলোচনা হতে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত যে, ওহী নবীদের নিকট অবতীর্ণ আল্লাহর বাণী।

ওহীর প্রকারভেদ

ইসলামী চিন্তাবিদগণ আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত পুরুষ হযরত মোহাম্মদ মোস্তফার (সা.) নিকট অবতীর্ণ ওহী দু শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। প্রথম শ্রেণী ওহী মাতলু বা আবৃত বাণী যা হযরত জিব্রাইল (আঃ) কর্তৃক রাসুলে খোদার নিকট আক্ষরিকভাবে আবৃতি করে শুনাতেন যা রাসুল কর্তৃক সাহাবায়ে কেরামের নিকট আবৃতি করে শুনাতেন এবং তারা তা তাৎক্ষণিকভাবে মুখস্ত করে নিতেন। এছাড়া রাসুল (সা.) কর্তৃক তা আক্ষরিকভাবে তাঁর সচিব বা ওহী লিখকদের দ্বারা লিপিবদ্ধ করিয়ে নিতেন এবং প্রতিদিনকার ছালাতেও আয়াতগুলো আবৃত্তি হতে থাকত। রাসুলের জীবদ্দশায় প্রতি রমজানে রাসুলে খোদা সম্পূর্ণ কোরআন জিবরাইলকে (বাণীবাহক ফেরেস্তা) পূনঃ আবৃত্তির মাধ্যমে কোরআনের বাণী সংরক্ষণের প্রয়াস পান। যার সংরক্ষণের অঙ্গিকার কোরআন মাজীদে এভাবে বর্ণিত হয়েছে।

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

"নিশ্চয়ই আমিই কোরআন অবতীর্ণ করেছি এবং আমিই এর সংরক্ষক।" (আল হিজর, আয়াত-৯)

অন্য আয়াতে এভাবে বর্ণিত হয়েছে–

لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ- إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ

- فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ-

"আপনি আপনার জিহবাকে দ্রুত সঞ্চালন করবেন না (কোরআনকে) তাড়াতাড়ি আয়ত্ত্ব করার জন্য, এর সংরক্ষণ এবং পঠনের দায়িত্ত্ব আমারই। সুতরাং আমি যখন পাঠ করি তখন আপনি সে পাঠের অনুসরণ করুন।"

(সুরা আল কিয়ামাহ, আয়াত:১৬-১৮)

রাসুলের উপর ওহী নাজিল হওয়ার পর তিনি তা মুখস্ত করার জন্য বারবার দ্রুত পাঠ করতে থাকতেন, তাই আল্লাহ তাঁকে এ রকম না করার জন্য আহ্বান জানান। কারণ কোরআনের শব্দাবলীর সংরক্ষণ, তার পঠন ও ব্যাখ্যার দায়িত্ব আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং গ্রহণ করেছেন। কোরআনে বর্ণিত শব্দ ও বাক্যগুলো (আয়াত) যেভাবে রাসুলের নিকট অবতীর্ণ হয়েছে তা সেভাবেই হুবহু সংরক্ষিত হয়েছে। তাই কোরআন হল আল্লাহ পাকের আবৃত বাণী বা ওহীয়ে মাতলু।

দ্বিতীয় প্রকার প্রেরিত বাণী ওহীয়ে গায়েরে মাতলু নামে প্রসিদ্ধ। যেসব প্রেরিত বাণীতে শুধু মুল বিষয়বস্তু বা ভাব বর্ণিত হয়েছে শাব্দিক বা আক্ষরিকভাবে বর্ণিত হয়নি বা সেভাবে বর্ণনা করার কোন প্রকার আয়োজন করা হয়নি। রাসুল (সা.) এ প্রকার প্রেরিত শব্দ বা বাক্যের আক্ষরিক বর্ণনায় বাধ্য ছিলেন না। প্রেরিত বাণীর প্রাপ্ত মুল ভাবটি বর্ণনা করার অধিকার তাঁর ছিল। এ ধরণের ওহী হাদীস নামে পরিচিত যা হাদিস গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে।

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى ۝ اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُّوْحٰى

" রাসুল নিজের ইচ্ছামত কথা বলেন না। তিনি যা বলেন তা আল্লাহর বাণী হিসেবে তাঁর নিকট অবতীর্ণ হয়েছে।" (সুরা আন নাজম, আয়াত: ৩-৪)

এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হল যে রাসুলের ধর্ম সম্বন্ধীয় প্রত্যেকটি বক্তব্য আল্লাহর ওহী বা ওহীয়ে গায়েব মাতলু।

ওহী প্রেরণের পদ্ধতি

পবিত্র গ্রন্থ আল কোরআন হচ্ছে আল্লাহ প্রদত্ত ওহীর সমষ্টি। আল্লাহ তায়ালা রাসুলে খোদা হযরত মোহাম্মদ (সা.) এর নিকট সুদীর্ঘ তেইস বছরের নবী জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে ও সময়ে প্রয়োজন অনুযায়ী তাঁর বাণী পাঠিয়েছেন। যখনই রাসুল (সা.) ওহী প্রাপ্ত হতেন তা তিনি তাঁর উপস্থিত কাতেবে ওহী বা বাণী লিখক দ্বারা লিখিয়ে নিতেন। পরবর্তী অধ্যায়ে এ বিষয় বিস্তারিত আলোচনার আশা রাখি।

কোরআন মর্জাদের বর্ণনা অনুযায়ী আল্লাহর বাণী বা ওহী তাঁর রাসুলের নিকট তিন পদ্ধতিতে প্রেরিত হত–

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّكَلِّمَهُ اللهُ اِلاَّ وَحْيًا اَوْمِنْ وَّرَاءِ حِجَابٍ اَوْيُرْسِلَ رَسُوْلاً فَيُوْحِىَ بِاِذْنِهٖ مَايَشَاءُ ط اِنَّه عَلِىٌّ حَكِيْمٌ-

"কোন মানুষের অবস্থা এমন না যে, আল্লাহ তার সাথে কথা বলেন। তবে তাঁর কথা হয় ওহী বা ইশারার মাধ্যমে বা পর্দার অন্তরাল থেকে অথবা তিনি কোন বাণীবাহক ফেরেস্তা পাঠান আর সে তাঁর নির্দেশক্রমে যা কিছু তিনি চান ওহীর মাধ্যমে প্রেরণ করেন।" (আশ শুরা, আয়াত-৫১)

কোরআন ও হাদীস দ্বারা রাসুলের নিকট তিন পদ্ধতিতে ওহী নাযিলের কথা বলা হয়েছে-

(১) ওহী হৃদয়ে উদিত হয়। আবার কখনও তা স্বপ্নের মাধ্যমে প্রেরিত হত।

(২) মেরাজের সময় রাসুলের আল্লাহর বাণী প্রাপ্তি দ্বিতীয় প্রকার ওহী প্রেরণের পদ্ধতি। এ সময়ে রাসুলকে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের নির্দেশ দেওয়া হয়। তুর পাহাড়ে হযরত মুসার (আ.) সাথেও এরূপ ঘটনা ঘটে।

(৩) তৃতীয় পদ্ধতি সম্বন্ধে সুরা আন নাহলের ১০২ আয়াতে কোরআন নিজেই এরূপ সাক্ষ্য দিচ্ছে–

"বলুন হে মোহাম্মদ (সা.) প্রকৃতপক্ষে এ কোরআন তোমার পালন কর্তার তরফ থেকে রুহুল কুদ্দুস (জিবরাইল) অবতরণ করেছে। ঈমানদারদের অন্তর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষে এবং আত্ম সমর্পনকারীদের জন্য পথ প্রদর্শন ও সুসংবাদ দানের জন্য।"

অপর আয়াতে আছে–

اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ- ذِىْقُوَّةٍعِنْدَذِى الْعَرْشِ مَكِيْنٍ- مَطَاعٍ ثَمَّ اَمِيْنٍ-

"এ কোরআন নিঃসন্দেহে আল্লাহর কালাম, একজন সম্মানিত বার্তাবাহকের দ্বারা আনীত, যিনি শক্তিমান আরশের অধিপতির নিকট অত্যন্ত মর্যাদাবান, সেখানে তার আনুগত্য স্বীকৃত, অধিকন্তু তিনি আমানতদার।" (সুরা তাকবীর: ১৯-২১)

হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণিত হাদীস থেকে জানা যায় একবার হারস ইবনে হিশাম রাসুলে খোদাকে ওহী কিভাবে আসে সে সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেন।

উত্তরে হুজুর (সা.) বলেন, কোন কোন সময় ওহী আমার নিকট প্রচন্ড ঘন্টা ধ্বনির মত আসে। ওহী নাযিলের এ অবস্থা শেষ হওয়ার পর ঘন্টা ধ্বনির মাধ্যমে প্রত্যাদিষ্ট সব কিছুই মুখস্ত পাই। আবার কখনও কখনও প্রেরিত ফেরেস্তা মানুষের আকৃতিতে উপস্থিত হন।

নিম্নে বর্ণিত উপায়ে রাসুলুল্লাহর নিকট ওহী পাঠানো হয়

ক) সত্য স্বপ্নঃ রাসুলে খোদার উপর ওহী নাযিলের প্রাথমিক অবস্থা। হযরত আয়েশা (রা.) কর্তৃক এভাবে বর্ণিত হয়েছে।

অর্থাৎ- সর্ব প্রথম নিদ্রাবস্থায় ভাল ভাল স্বপ্নের মাধ্যমে রাসুলে খোদার নিকট ওহী অবতীর্ণ হওয়া শুরু হয়। তখন তিনি যে স্বপ্ন দেখতেন তা প্রভাতের আলোকের মত প্রতিভাত হত।

খ) হৃদয়ে বদ্ধমুল ধারণার সৃষ্টি বা হৃদয়ের কথা ফুকে দেওয়াঃ রাসুলে খোদার হৃদয়ে ফেরেস্তা জিবরাইল (আ.) কোন বদ্ধমুল ধারণার সৃষ্টি করতেন বা নিক্ষেপ করতেন অথচ রাসুল (সা.) তাকে দেখতে পেতেন না। রাসুলুল্লাহ এ অবস্থাকে এভাবে বর্ণনা করেছেন। জিবরাইল (আ.) আমার হৃদয়ে ফুঁকে দিলেন, ইত্যাদি।

গ) সরাসরি বাক্যালাপঃ কোন মাধ্যম ছাড়া আল্লাহর সাথে রাসুলের বাক্যালাপ। মে'রাজের রাত হুজুর (দ.) তাঁর প্রভুর সাথে হযরত মুসার (আ.) মত সরাসরি আলাপচারিতার সুযোগ পান।

ঘ) ফেরেস্তা স্বআকৃতিতে আগমনঃ হযরত জিবরাইল (আ.) কখনও নিজের আসলরূপে সরাসরি আগমন করতেন বলে বর্ণিত আছে (ফাতহুল বারী)।

ঙ) ঘন্টাধ্বনিঃ ঘন্টাধ্বনির মত রাসুলের নিকট ওহী অবতীর্ণ হত। এটি ছিল ওহী নাযিলের কঠিনতম মাধ্যম। এ পদ্ধতিতে ওহী নাযিলের সময় প্রচন্ড শীতের দিনেও রাসুলের শরীর হতে ঘাম ঝরতো। হযরত আয়েশা (রা.) এ অবস্থার বর্ণনা এভাবে করেছেন, 'শীতের দিনে তাঁর নিকট ওহী অবতীর্ণ হতে দেখেছি। ওহী নাযিল হওয়া শেষ হলে তীব্র শীতেও তিনি ঘর্মাক্ত হতেন। তাঁর ললাটে ফোটা ফোটা ঘামের বিন্দু দেখা দিত।'

এ অবস্থা রাসুলের জন্য কষ্টকর ছিল যা হযরত আয়েশা বর্ণিত হাদিস থেকে জানা যায়। উটের পিঠে সওয়ার অবস্থায় ওহী নাযিল হলে উট বসে পড়ত। হযরত যায়েদ ইবনে ছাবেতের উরুতে শায়িত অবস্থায় একবার রাসুলে খোদার নিকট ওহী অবতীর্ণ হয়। হযরত যায়েদের বর্ণনা অনুযায়ী তাঁর

উরুতে এত বেশী চাপ পড়ে যে, তা ভেঙ্গে যাবার উপক্রম হয়। মুসনাদে আহমদের এক হাদিসের বর্ণনা অনুযায়ী রাসুলুল্লাহ স্বয়ং ওহী নাযিলের অবস্থাকে এভাবে বর্ণনা করেছেন। 'যখন আমার প্রতি ওহী অবতীর্ণ হয়, তখন মনে হয় আমার আত্মা বের হয়ে যাচ্ছে। ঘন্টাধ্বনির মাধ্যমে ওহী নাযিলের অবস্থায় কোন কোন সময় রাসূলুল্লাহ (সা.) এর আশে পাশের লোকজনের কানেও এ আওয়াজ শুনা যেত। হযরত ওমর বলেন- 'যখন রাসুলের প্রতি ওহী প্রেরিত হত, তখন তাঁর মুখমন্ডলের চারিদিকে মধুমক্ষিকার গুনজরণের মত গুণগুণ আওয়াজ শুনা যেত।

কোরআন মজিদে বর্ণিত ওহী নাজিলের বিবরণ সংক্ষেপে এভাবে বর্ণনা করা যায়-

(১) আল্লাহ প্রদত্ত ওহী যা কোরআন নামীয় মহাগ্রন্থে বিবৃত হয়েছে তা রাসুলে খোদার হৃদয়ে সঞ্চারিত ও অনুপ্রবেশিত হয়েছে ফেরেস্তা জিব্রাইলের দ্বারা।

(২) আল্লাহ তায়ালার ঐশীবাণী নিয়ে এসেছেন জিব্রাইল রুহুল আমীন যিনি বিশ্বস্ত ও নির্ভরশীল।

(৩) ঘন্টাধ্বনি মত রাসুল (দ.) এর নিকট ওহী অবতীর্ণ হত।

(৪) সরাসরি বাক্যালাপের মাধ্যমে কোন মাধ্যম ছাড়া আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষ থেকে রাসুলের (দ.) নিকট ওহী আসত। কখনো স্বপ্নাদিষ্ট হয়েও রাসুলে খোদা ওহী প্রাপ্ত হতেন।

(৫) কখনও জিব্রাইল (আ.) স্বআকৃতিতে বা কোন মানুষের আকৃতিতে ওহী আনয়ন করতেন।

আরবদের উপর কোরআনের প্রভাব

কোরআন মজিদ আল্লাহ তায়ালার বাণী হওয়ার একটি প্রকৃষ্ঠ নিদর্শন হল যে, ইহা আল্লাহ তায়ালা এমন এক নিরক্ষর ব্যক্তির নিকট জিব্রাইলের (আ:) মাধ্যমে পাঠিয়েছেন, যিনি তার বাল্য ও যৌবনকালে কোন প্রকার শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পাননি। তার বাল্যকাল কেটেছে নানা দুর্যোগের মাঝে। জন্মের পূর্বে তিনি পিতাকে হারান, বাল্যকালে মায়ের মৃত্যুতে মাতৃস্নেহ বঞ্চিত থাকেন। এতিম বালক হিসাবে দাদাজান ও চাচাজান কর্তৃক পালিত হন। এহেন ব্যক্তির নিকট যখন আল্লাহ তায়ালা তাঁর বাণী পৌছালেন এবং মানব সমাজে তা প্রচার প্রচারণার আহ্বান জানালেন তখন আল্লাহ তায়ালার মহিমান্বিত বাণী মানুষের হৃদয়ে এক অপূর্ব শিহরণ জাগ্রত করল। মানুষের

মনে আল্লাহর তাওহীদ বা একাত্ববাদ এক বিপ্লবী চেতনার জন্ম দিল। সূরা জুমুয়ার ২নং আয়াতে আল্লাহ তা এভাবে প্রকাশ করেছেন–

"তিনিই উম্মিদের মধ্যে তাদের একজনকে রাসুলরূপে পাঠিয়েছেন, যিনি তাদের কাছে তাঁর আয়াত আবৃতি করেন, তাদেরকে পবিত্র করেন এবং কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেন। ইতিপূর্বে তারাতো ঘোর বিভ্রান্তিতে ছিল।"

আল্লাহ তায়ালার ওহীর বিপ্লবী চেতনা মানুষকে এত বেশি উদ্বেলিত করল যে, রাসুলে খোদার তেইশ বছরের রেসালত যুগে সমগ্র আরব ভূখন্ড ইসলামের পতাকাতলে আশ্রয় নেয়। আর রাসুলে খোদার রেহলতের পর শত বছরে তৎকালীন পরিচিত বিশ্বের বেশীর ভাগ দেশ ইসলামের ছায়া তলে আশ্রয় গ্রহণ করে। রাসুলে খোদার আগমনকালীন সময় সমগ্র আরব ভূমিতে অর্ধ ডজনের মত মানুষ অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন ছিল যারা শিক্ষিত বলে গণ্য হত। সে নিরক্ষর ও অশিক্ষিত জনগোষ্টি এমন কোন্ শক্তিতে বলিয়ান হল যে, শত বছরের মধ্যে সারা পরিচিত পৃথিবীর অধিকাংশ দেশ তাদের বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য হল। এ অলৌকিক শক্তি আর কিছু নয়- কোরআনের মাজেযা বা আল্লাহর বাণী ও ইসলামী জীবন দর্শন। কোরআন আল্লাহ তায়ালার বাণী হওয়ার এটাও একটি বড় প্রমাণ।

কোরআনে বর্ণিত মাজেজা ও তার বাস্তবায়ন

আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি যে, রাসুলে খোদা (দ.) এক নিরক্ষর ব্যক্তি ছিলেন যা ছিল আল্লাহ প্রদত্ত এক বিশেষ মোজেযা। আল্লাহ তায়লা কোরআন মজিদে ৯৯টি গুনাবলী বর্ণনা করেছেন। কোরআন যদি আল্লাহর বাণী না হয়ে রাসুল (দ.) কর্তৃক রচিত হত তাহলে আল্লাহ তায়ালার ৯৯ গুণাবলী বর্ণনা করা সম্ভব হতনা। মানব ও জ্বীন জাতির কেউ তাদের সৃষ্টিকর্তার ৯৯টি গুণাবলীর বর্ণনা তারা কি তাদের ভাষায় উপস্থাপনে সক্ষম? ইহা কখনই সম্ভব নয়। এটাও আল্লাহর এক চ্যালেঞ্জ। এ চ্যালেঞ্জ কেউ গ্রহণ করতে সাহস করবেনা এবং করেনি।

এর দ্বারাও কোরানের ঐশীবাণী হওয়ার দাবী নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে। এখানে লক্ষণীয় বিষয় যে আল্লাহ তায়ালা কোরআনে বর্ণিত ৯৯টি *গুণাবলীর* বর্ণনায় খৃষ্টানদের ব্যবহৃত 'আব্ব' বা ফাদার বা ফাদার ইন হেভেন আশ্চর্যজনকভাবে অনুপস্থিত। এটাও কোরআনের অলৌকিকতার দাবী রাখে।

কোরআনের ভবিষ্যতবাণী সত্য প্রমানিত

এছাড়া কোরআনে আল্লাহ তায়ালা বেশ কয়েকটি ভবিষ্যতবাণী সবাইর জন্য চ্যালেঞ্জ হিসেবে প্রচার করেছেন। যার প্রতিষ্ঠা রাসুলের যুগে ও পরবর্তীকালে সংগঠিত হওয়ার ভবিষ্যতবাণী করা হয়েছে। তারই একটি ঘটনা সূরায়ে রোমে বর্ণিত হয়েছে। রোমের সম্রাট পারস্য সম্রাজ্যের নিকট পরাজিত হওয়ায় কাফেররা বেজায় খুশী। এখন আল্লাহ তায়ালা পারসিকদের অদূর নিকট ভবিষ্যতে রোমের পরাভূত হওয়ার ভবিষ্যতবাণী করলেন যা অল্প কিছুদিনের মধ্যে কার্যকর হয়। এরকম সূরায়ে লাহাবে বর্ণিত আবু লাহাব ও তার স্ত্রীর ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার ভবিষ্যতবাণী।

কোরআনে বর্ণিত হয়েছে-

تَبَّتْ يَدَا اَبِىْ لَهَبٍ وَّتَبَّ- مَااَغْنٰى عَنْهُ مَالُهٗ وَمَا كَسَبَ- سَيَصْلٰى نَارًاذَاتَ لَهَبٍ- وَّامْرَاَتُهٗ ط حَمَّا لَةَ الْحَطَبِ- فِىْ جِيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَسَدٍ-

"ধ্বংস হউক আবু লাহাবের দুহস্ত এবং ধ্বংস হউক সে নিজেও। উহার ধন সম্পদ ও উহার উপার্জন কোন কাজে আসে নাই। অচিরে সে প্রবেশ করবে লেলিহান অগ্নিতে এবং তাহার স্ত্রী ও সে ইন্ধন বহনকারী, তাহার গন্ড দেশে পাকান রজ্জু।" (সুরা আল লাহাব)

উপরে বর্ণিত আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আবু লাহাব ও তার স্ত্রী ধ্বংস ঘোষণা করেছেন। তাদের এ ধ্বংস আল্লাহ প্রদত্ত ইসলামী জীবন দর্শনের বিরুদ্ধাচরণ করার জন্য। তারা যদি কোরআন মজিদকে মিথ্যা রচনা হিসাবে প্রতিষ্ঠা করতে চাইত, সে সুযোগ তাদের হাতে ছিল। তারা অতি সহজে ইসলাম গ্রহণ করে উপরোক্ত আল্লাহ তায়ালার ঘোষণাকে মিথ্যা প্রমাণ করে কোরআনের বাণীকে রাসুলের (দঃ) রচনা বলে প্রমাণিত করা তাদের জন্য অতি সহজ ছিল। কিন্তু তা হবার নয়। তারা কাফির হিসাবে মৃত্যুবরণ করে। আর কোরআন মজিদ যে মিথ্যা নয় তার সত্যতা প্রতিষ্ঠিত রয়ে গেল।

এভাবে আরেক ভবিষ্যত বাণী দ্বারা কোরআন মজিদে ইহুদিদেরকে ইসলামের বৈরী গোষ্ঠি হিসেবে ঘোষণা করা হয়। গত চৌদ্দশত বছর ইসলামের প্রতি তারা শত্রুতা পরিহার করেনি এবং আগামী অনাদিকালও তারা ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতি তাদের বৈরীতা কখনও পরিত্যাগ করবেনা। তারা যদি কোরআনকে অসত্য হিসাবে প্রমাণ করতে চায় তাহলে

তারা এখনই ইসলাম ও মুসলিমদের প্রতি বন্ধুত্বের হাত প্রশস্ত করে জেরুজালেম ও ফিলিস্তিন থেকে সরে পড়ে তাহলে অতি সহজে কোরআন আল্লাহর বাণী না হওয়া এবং ইসলাম আল্লাহ প্রদত্ত না হওয়ার অকাট্য প্রমাণ হিসাবে প্রতিষ্ঠা করতে পারবে। কিন্তু তা হবার নয়। ইহুদীরা ইসলামের প্রতি তাদের বৈরিতা ও শত্রুতা কখনও পরিহার করতে পারবেনা। আর কোরআনের বাণী আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক প্রদত্ত হওয়ার দাবী প্রতিষ্ঠিত রয়ে যাবে।

কোরআনের বক্তব্য প্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিক তথ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ

কোরআন মজিদ প্রাথমিকভাবে মানুষের জীবন দর্শন হিসাবে আল্লাহর ফিরিস্তা জিব্রিলের মারফত রাসুলের (দ.) নিকট মানুষের হিদায়াত, জীবন পরিচালনা, পথ চলার দিক নির্দেশক হিসাবে প্রেরণ করেছেন। এই কিতাব কোন বিজ্ঞান বিষয়ের উপর লিখা কোন গ্রন্থ নয়। এই মহা গ্রন্থে মানুষের জীবনাচরণের মূলনীতির সাথে কিছু কিছু বৈজ্ঞানিক বিষয়বস্তু ও বিজ্ঞানের তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে। ছয় হাজারের বেশী আয়াত সমৃদ্ধ (সংখ্যা সম্বন্ধে বিভিন্ন মতামত দৃষ্ট হয়) এই মহাগ্রন্থে এক হাজারের বেশী আয়াতে বৈজ্ঞানিক তথ্য বর্ণিত হয়েছে। এ তথ্যগুলো সময় অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথে বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকদের অনুসন্ধানে প্রতিষ্ঠিত সত্য হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে এবং করছে। এসব প্রতিষ্ঠিত সত্যের সাথে কোরআন মজিদে বর্ণিত তথ্যের কোন অমিল নেই।

কোরআনে ওহী মারফত প্রাপ্ত তথ্য আধুনিক বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানীদের দ্বারা সত্যায়নই হচ্ছে কোরআনের ওহী আল্লাহর বাণী হওয়ার প্রমাণ। আর এ সত্যের প্রতি আল্লাহ তায়ালা এভাবে ইংগিত করেছেন–

"অতি শীঘ্র আমরা দেখিয়ে দেব আমাদের নিদর্শন দিগন্তের প্রান্তে এবং তাদের মাঝে যতক্ষণ তা প্রমাণিত হবে যে, আল্লাহর বাণী সঠিক। তোমার প্রভূ কি স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়? তিনিই সব কিছুর প্রত্যক্ষদর্শী।"

আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক কোরআন মজিদে বর্ণিত সত্যায়িত হওয়া তথ্যগুলি হতে কয়েকটি উদাহরণ নিম্নে দেওয়া হল। আল্লাহ তায়ালা কোরআন মজিদে ঘোষণা করেছেন–

"আমি সমস্ত প্রাণী পানি থেকে সৃষ্টি করেছি।" (সূরা নুর, আয়াত-৪৫)

বর্তমানে ইহা প্রতিষ্ঠিত সত্য যে পৃথিবীর বুকে বিচরণকারী সবপ্রাণী পানি থেকে সৃষ্ট। কোরআন মজিদে অন্য আয়াতে বর্ণিত হয়েছে কিভাবে এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হয়েছে–

"অবিশ্বাসীগণ কি দেখে না যে, আকাশ ও পৃথিবী গ্রথিত ছিল একক সত্ত্বা হিসাবে তাদের বিচ্ছিন্ন করার পূর্বে।" (সুরা আম্বিয়া, আয়াত-৩০)

আল্লাহ আরোও বলেন–

"আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন রাত ও দিন এবং সুর্য ও চন্দ্র; প্রত্যেকেই নিজ নিজ কক্ষপথে বিচরণ করে।" (সুরা আম্বিয়া, আয়াত-৩৩)

"পবিত্র ও মহান তিনি, যিনি উদ্ভিদ, মানুষ এবং ওরা যাদেরকে জানেনা তাদের প্রত্যেককে সৃষ্টি করেছেন জোড়ায় জোড়ায়।" (সুরা ইয়াসিন, আয়াত-৩৬)

"এবং তার নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে আকাশ মন্ডলী পৃথিবীর সৃষ্টি এবং তোমাদিগের ভাষা এবং বর্ণের বৈচিত্রজ্ঞানীদের জন্য অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে। (সুরা রুম, আয়ত-২২)

উপরে বর্ণিত আয়াতগুলো আধুনিক বিজ্ঞানের আবিস্কার প্রানের উৎস। মহা বিস্ফোরণ তত্ত্ব, গ্রহ উপগ্রহের নিজ নিজ কক্ষে বিচরণ, প্রতিটি বস্তুও জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি, পৃথিবী ও আসমানের সৃষ্ট, মানুষের ভাষার বৈচিত্র ১৪শত বছর পূর্বে আল কোরআনের বক্তব্যের সাথে সম্পূর্নভাবে সামঞ্জস্যপূর্ন। ১৪শ বছর পূর্বে যা কারো ধারণায় থাকা যেখানে সম্ভব নয়, সেখানে কিভাবে তা অশিক্ষিত মরু সন্তানের মুখে উচ্চারিত হল?

একজন আধুনিক ফরাসি পন্ডিত বলেন, যারা মুহাম্মদ (স.) কে কোরআন রচয়িতা বলে মনে করেন, তাদের ধারণা সঠিক নয়। একজন মানুষ সম্পূর্ণ অশিক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও সমগ্র আরবি সাহিত্যের মধ্যে গুণগত দিক হতে সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থের রচয়িতা তিনি কি করে হতে পারেন? তিনি কিভাবে বৈজ্ঞানিক প্রাকৃতিক সত্য উচ্চারণ করতে পারলেন? অথচ মানব সভ্যতা তখন সে পর্যায়ে পৌছায় নি। কিন্তু যে বিষয় তিনি উচ্চারণ করেছিলেন তার মধ্যে বিন্দু পরিমানও ভ্রান্তি ছিলনা।

এ আয়াতে কোরআনে বর্ণিত ওহী বর্তমান বিজ্ঞানীদের দ্বারা প্রমাণিত বিগ ব্যাংগ তত্ত্ব দ্বারা সত্যায়িত হচ্ছে এবং তার প্রত্যয়ন করে। এছাড়া কোরআনের বিভিন্ন আয়াতে বহু বৈজ্ঞানিক বিষয়বস্তুর আলোচনা দেখা যায়। তা সমুদ্র বিজ্ঞান বিষয় হউক, প্রজনন বিজ্ঞান বিষয়ক হউক, আবহাওয়া বিজ্ঞান বিষয়ক হউক, ফিজিক্স, ক্যামেস্ট্রি, জিওলজি বা জুলজি হউক বা ইতিহাস, সমাজনীতি যেটাই হউক তার আলোচনা দেখা যায়।

এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে বর্তমানে আমাদের আলেম সমাজের একটি অংশ শুধুমাত্র আল্লাহ তায়ালার প্রতি কর্তব্য পালন ও দৈনন্দিন জীবনযাপনের

বিধিবিধানকে কোরআনের শিক্ষা হিসেবে গ্রহণ করেছে। সে হিসাবে ধর্মীয় শিক্ষাকে তারা অপাংতেয় করে ফেলেছে। তারা শুধু কোরআন, হাদীস, ফিকহ্ ও তৎসম্বন্ধিয় কিছু বিষয়, আরবী ভাষার গ্রামার ও কিছু অপ্রয়োজনীয় বিষয়কে মাদ্রাসা শিক্ষার অন্তর্ভূক্ত করেছে। আল্লাহ তা'য়ালা কর্তৃক নির্দেশিত তাঁর আয়াত ও সৃষ্টি সম্বন্ধে এবং মানব জাতির কল্যাণে নিবেদিত শিক্ষাকে এ শিক্ষা পদ্ধতি থেকে সম্পূর্নভাবে নির্বাসিত করে রেখেছে। আর তা তারা করছে সালফে সালেহীনের অন্ধ অনুকরণে। যা হচ্ছে কোরআনের মূল শিক্ষার বিরোধী। কোরআনের শিক্ষা অনুযায়ী জ্ঞান বিজ্ঞানের নানা শাখা প্রশাখা যার ইংগিত কোরআনে বার বার দেয়া হয়েছে তা গ্রহণ করে কোরআনের শিক্ষার ভিত্তিতে নতুন সিলেবাস ও পাঠ্যক্রম প্রচলন অবশ্য কর্তব। চারশত বছরের পুরাতন সিলেবাস বর্জন করে তাতে কোরআন ভিত্তিক আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের নানা বিষয় ও উপকরণ ধর্মীয় শিক্ষায় সংযোজন করা একান্ত প্রয়োজন।

শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ মোহাদ্দেস দেহলবী তার গ্রন্থে কোরআন মজিদে আলোচিত বিষয়াবলী পাঁচ ভাগে ভাগ করেছেনঃ (১) সংবিধান জ্ঞান বা ইলমুল আহকাম (২) ন্যায় শাস্ত্র (৩) স্রষ্টাতত্ত্ব (৪) সৃষ্টিতত্ত্ব ও (৫) পরকাল জ্ঞান।

এ বিষয়বস্তুর ভিত্তিতে ইসলামী শিক্ষার সিলেবাস প্রণয়ন করা উচিত। পূর্বসূরীদের শত শত বছরের পুরাতন সিলেবাস আঁকড়ে থাকা কোরআনের শিক্ষা পরিপন্থি।

কোরআন আল্লাহ্ বাণী হওয়ার প্রমান কোরআনেরই দাবী

ওহী যে আল্লাহ প্রদত্ত বাণী তার প্রমাণ আল্লাহ্ এভাবে বর্ণনা করেছেন–

"হে মুহাম্মদ, তুমি সে সময় পশ্চিম কোণে উপস্থিত ছিলেনা, যখন আমি মুসাকে শরিয়তের আদেশ দিয়েছিলাম এবং তুমি তা প্রত্যক্ষও করোনি বরং তারপর (তোমার সময় পর্যন্ত) আমি বহু বংশের উত্থান ঘটিয়েছি এবং তাদের উপর বহু যুগ অতিক্রান্ত হয়েছে। তুমি মাদায়েন বাসীদের মাঝেও উপস্থিত ছিলেনা। যাতে তাদেরকে আমার আয়াত বা নিদর্শণাবলীর কথা শুনাতে। কিন্তু আমিই (সে সময় এ সব খবর) প্রেরণকারী। আর তুমি তুরের (পর্বত) পার্শ্বদেশে সে সময় ছিলেনা, যখন আমি আহ্বান করেছিলাম। বরং ইহা তল তোমার প্রভুর পক্ষ হতে রহমত (যে তোমাকে এ তথ্য সরবরাহ করা হচ্ছে) যাতে করে এমন একটি জাতিকে ভীতি প্রদর্শন করতে পারে যাদের কাছে

ইতিপূর্বের ভীতি প্রদর্শনকারী (পয়গাম্বর) আসেনি। আর এ ভাবেই হয়ত তারা উপদেশ গ্রহণ করতে পারবে।" (সুরা কাছাছ, রুকু-৫)

কোরআনের উপরোক্ত আয়াতগুলোর বক্তব্য অনুযায়ী আল্লাহ তায়ালা এটাই প্রমাণ করছেন যে, কোরআন আল্লাহর বাণী এবং মোহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহর রাসুল বা প্রেরিত পুরুষ। কারণ হাজার হাজার বছর পূর্বেকার প্রাগৈতিহাসিক যুগের এসব ঘটনাবলী যা আল-কোরআনে বিবৃত হয়েছে এবং একজন নিরক্ষর ব্যক্তির মুখে শ্রুত হয়েছে তা ওহী ছাড়া আর কিছু হতে পারে না।

কোরআন আল্লাহ তায়ালার বাণী প্রমাণের দ্বিতীয় দলিল আল-কোরআনে এভাবে উপস্থাপন করেছেন-

وَإِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيَاتُنَا بَيِّنٰتٍ- قَالَ الَّذِيْنَ لَقَاءَنَا لَا يَرْجُوْنَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْاٰنٍ غَيْرِ هٰذَا اَوْ

بَدِّلْهُ ۚ قُلْ مَا يَكُوْنُ لِيْ اَنْ اُبَدِّلَهٗ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِيْ ۚ اِنْ اَتَّبِعُ اِلَّا مَا يُوْحٰى اِلَيَّ ۚ

"যখন তাদেরকে সুস্পষ্ট কথা শুনানো হয় তখন যারা আমার সাথে সাক্ষাতের আশা রাখেনা (অবিশ্বাসীগণ) তারা বলে এর বদলে অন্য কোন কোরআন অথবা এর মধ্যে কিছু রদবদল কর। হে মোহাম্মদ এদেরকে বলে দাও, এর মধ্যে নিজের পক্ষ থেকে কোন প্রকার পরিবর্তন পরিবর্ধন আনা আমার কাজ নয়, আমি কেবল মাত্র সে ওহীর অনুগত যা আমার নিকট আসে।" (সুরা ইউনুস, আয়াত-১৫)

কোরআনের সত্যতার প্রমাণ আল্লাহ তায়ালা এভাবে পেশ করেন-

"এরা কি লক্ষ্য করে না কোরআনের প্রতি? ইহা যদি আল্লাহ ব্যতিত অন্য কারও পক্ষ থেকে হত, তবে এতে অবশ্যই বহু বৈপরিত্য পাওয়া যেত।" (আন নিসা, আয়াত-৮২)

এখানে উপরোক্ত আয়াতগুলো দ্বারা আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী রাসুল বলেছেন, আমি এ কিতাবের রচয়িতা নই। বরং ওহীর মাধ্যমে এ বাণীগুলো আমার নিকট এসেছে এবং কোন পরিবর্তন-পরিবর্ধনের অধিকার আমার নেই। তিনি এ কিতাবে বর্ণিত ওহীগুলোর রচয়িতা নন। এসব রচনার কোন কৃতিত্ব তাঁর নয়। বরঞ্চ এগুলো আল্লাহ প্রদত্ত ওহী। আরবী সাহিত্যের মহামূল্যবান এ গ্রন্থটির রচনায় তাঁর কোন কৃতিত্ব নেই এ বক্তব্যটি কোন সাধারণ মানুষের হতে পারে না। একমাত্র অসাধারণ মহাপুরুষের ঘোষণা হতে পারে। কারণ কোরআনের মত এত উচ্চমানের সাহিত্য রচনার দাবি যে

কোন মানুষের জন্য গৌরবজনক এবং গর্বের ব্যাপার যা তাকে ব্যক্তিগত মর্যাদার শিখরে পৌছে দিতে পারে।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানুষের মুক্তি ও সঠিক পথ প্রদর্শনের জন্য যখন কোরআন মজিদ ওহীর মাধ্যমে জিব্রাইল (আ.) এর মারফত রাসুলে খোদার নিকট অবতীর্ণ করলেন, তখন মক্কার কাফিরগণ আল্লাহ প্রদত্ত ওহীকে মিথ্যা বলে আখ্যায়িত করে। আল্লাহ তায়ালা এ অবস্থাকে এভাবে কোরআন মজিদে বর্ণনা করেছেন-

وَقَالُوٓا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَىٰ عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا

"তারা বলে, এগুলোতো সেকালের রূপকথা যা সে লিখিয়ে নিয়েছে। এগুলো সকাল সন্ধ্যা তার নিকট পাঠ করা হয়। তুমি বলে দাও, এটা তিনিই অবতীর্ণ করেছেন, যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সমুদয় রহস্য অবগত আছেন। তিনি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।" (সুরা ফোরকান : ৫-৬)

অপর আয়াতে কাফেরগণের এ ধরণের বক্তব্য যে মোহাম্মদ (সা.) কিছু লোকের সাহায্যে এসব ঘটনাবলী বর্ণনা করেছেন তাদের এ দাবী মিথ্যা বলে আল্লাহ অগ্রাহ্য করেছেন। আল্লাহ আরোও বলেন-

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوٓا إِنْ هَٰذَآ إِلَّآ إِفْكٌ افْتَرَىٰهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ ءَاخَرُونَ ۖ فَقَدْ جَآءُو ظُلْمًا وَزُورًا

"কাফিররা বলে, তা মিথ্যা ব্যতিত কিছু নয়। সে এটা উদ্ভাবন করেছে এবং ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক তাকে এ ব্যাপারে সাহায্য করেছে। এভাবে উহারা অবশ্যই জুলুম ও মিথ্যায় উপনীত হয়েছে।"

তারপর কোরআনে সত্যতার প্রমাণ আল্লাহ তায়ালা এভাবে পেশ করেন।

وَمَا كُنتَ تَتْلُوا مِن قَبْلِهِۦ مِن كِتَٰبٍ وَلَا تَخُطُّهُۥ بِيَمِينِكَ ۖ إِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ

"তুমিও ইতিপূর্ব কোন কিতাব পাঠ করনি এবং স্বহস্থে কোন কিতাব লেখনি, যে মিথ্যাচারীরা সন্দেহ পোষন করতে পারে।" (আন কাবুত, আয়াত-৪৮)

তারপর আল্লাহ তায়ালা কোরআন আল্লাহর অকাট্যবাণী হওয়ার পক্ষে যুক্তি দেন–

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْءَانَ ۚ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَٰفًا كَثِيرًا

"এরা কি লক্ষ্য করেনা কোরআনের প্রতি? ইহা যদি আল্লাহ ব্যতিত অন্য কারো পক্ষ থেকে হত তবে তাতে অবশ্যই বহু বৈপরিত্য পাওয়া যেত?" (আন নিসা, আয়াত-৮২)

এরপর আসল অবস্থা বর্ণনায় আল্লাহ তায়ালা উল্লেখ করেছেন-

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

"আমি তোমার নিকট উত্তম কাহিনী বর্ণনা করেছি ওহীর মাধ্যমে এ কোরআন প্রেরণ করে। যদিও ইতিপূর্বে তুমি ছিলে অজ্ঞদের অন্তর্ভূক্ত।" (সুরা ইউসুফ, আয়াত-২)।

আল্লাহ তায়ালা ওহী মারফত আরও জানান-

تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ ۖ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَٰذَا ۖ فَاصْبِرْ ۖ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ

"এ সব অদৃশ্য লোকের সংবাদ আমি তোমাকে ওহী দ্বারা অবহিত করছি যা এর পূর্বে তুমি জানতে না। আর তোমার সম্প্রদায় ও জানত না। সুতরাং ধৈর্য ধারণ কর। শুভ পরিনাম খোদা ভীরু লোকদের জন্যই।" (সুরা হুদ, আয়াত-৪৯)।

এরপর আল্লাহ রাব্বুল আলামীন দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে বলেন-

ذَٰلِكَ الْكِتَٰبُ لَا رَيْبَ ۛ فِيهِ-

"এটি এমন একটি কিতাব যা সম্পূর্ণভাবে সন্দেহ মুক্ত।" (সুরা বাকারা)

কাফেরদের বক্তব্যের প্রতিবাদ ও প্রতি উত্তর দেওয়ার পর আল্লাহ তায়ালা কাফিরদের প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে বলেন-

ذَٰلِكَ الْكِتَٰبُ لَا رَيْبَ ۛ فِيهِ وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ

وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

"আমি আমার বান্দার উপর যে কিতাব নাযিল করেছি তাতে যদি সন্দিহান হও তবে অনুরূপ কোন সূরা আনয়ন কর এবং তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে আল্লাহ ছাড়া তোমাদের সকল সাহায্যকারীকে আহ্বান কর।" (সুরা বাকারা, আয়াত-২৩)

আল্লাহ তায়ালা আরও এরশাদ করেন-

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ ۖ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ

"তারা কি অপবাদ দেয় যে, সেই (মোহাম্মদ ﷺ) এ কিতাব রচনা করেছে। বল তোমরা এটার অনুরূপ একটি সূরাহ্ আনয়ন কর এবং আল্লাহ্ ব্যতিত যাকে পাও তাকে আহ্বান কর। যদি তোমরা সত্যবাদী হও।"

এরপর আল্লাহ্ তায়ালা তাদের অপারগতার কথা চ্যালেঞ্জ হিসেবে তাদের প্রতি ছুড়ে দিয়ে বলেন–

"বল, যদি এ কোরআনের অনুরূপ কোরআন রচনার জন্য জ্বীন ও মানুষেরা সমবেত হয় এবং তারা পরস্পরকে সাহায্য করে তবুও তারা এর অনুরূপ রচনা করতে পারবে না।" (বানী ঈসরাঈল, আয়াত-৮৮)

উপরে বর্ণিত আয়াতগুলি দ্বারা কোরআন আল্লাহ্ তায়ালার বাণী হওয়ার অকাট্য যুক্তি প্রদর্শন পূর্বক আল্লাহ্ তায়ালা কিভাবে এসব আয়াতে কোরআন রাসূলের নিকট অবতীর্ণ করেন তা এভাবে প্রকাশ করেন–

إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ - ذِي قُوَّةٍ عِندَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ - مُّطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ -

"নিশ্চয় এই কোরআন সম্মানিত বার্তাবাহকের (আনিত) বানী যিনি শক্তিমান। আরশের মালিকের নিকট সার্বিকভাবে অবস্থানকারী। যার নির্দেশ মেনে চলা হয়। তিনি তথায় বিশ্বাস ভাজন।" (সূরা তাকবীর, আয়াত ১৯-২১)

যুক্তিতর্ক উপস্থাপনের পর এবং কাফিরদের নানা আবদারের মুখে আল্লাহ তায়ালা এ আলোচনার সমাপ্তি এভাবে ঘোষণা করেন–

قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ ۖ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ -

"নিদর্শন (মোজেযা) নিয়ে আসা কোন রাসুলের এখতিয়ারভূক্ত নয়। একমাত্র আল্লাহর ইচ্ছায় তা হয়।"

এতসব যুক্তিতর্ক ও আলাপ আলোচনার পর আল্লাহ্ তায়ালা কাফিরদের জন্য সহজবোধ্য অকাট্য যুক্তি উপস্থাপন করে তাদের কোরআনের আয়াতগুলির প্রতি অবিশ্বাসের দাতভাঙ্গা জওয়াব এভাবে দিয়েছে (যা ইতিপূর্বেও আলোচনা করেছি)।

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ ۚ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا

"তবে কি তারা কোরআন সম্বন্ধে অনুধাবন করে না? ইহা যদি আল্লাহ ব্যতিত অন্য কারো পক্ষ থেকে নাজিল হত তবে তারা এতে অনেক অসংগতি দেখতে পেত।"

তেইশ বছরের নবী জীবনে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে এ কোরআন রাসূলে খোদার নিকট অবতীর্ণ হয়। এতগুলি বছরের ব্যপ্তিতে অবতীর্ণ এসব আয়াতগুলি যদি মনুষ্য রচিত হত তাহলে নিশ্চয় তাতে নানারকম অসংগতি দেখা যেত। যেহেতু এ মহাগ্রন্থ মানব রচিত নয় তাইতো তাতে কোন প্রকার ব্যাত্যয় বা অসংগতি দেখা যায় না। এ মহাগ্রন্থ আল্লাহর বাণী হওয়ার ইহাই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ যুক্তি।

আল-কোরআন নামের তাৎপর্য

কোরআনের শাব্দিক অর্থ হল পাঠ করা, অধ্যয়ন করা। কোরআন শব্দটি কোরআন মজীদেও এ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

"নিশ্চয়ই উহার সংকলন ও পঠন আমারই দায়িত্ব। সুতরাং আমি যখন তা পাঠ করি, আপনি তখন সে পাঠের অনুসরণ করুন।" (কিয়ামাহ, আয়াত ১৭-১৮)

এখানে কোরআন শব্দটি পাঠ করা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। পারিভাষিক অর্থে কোরআন ঐ গ্রন্থকে বুঝায় যা রাসুলুল্লাহর নিকট ওহী মারফত অবতীর্ণ হয়েছে। বর্ণনা পরম্পরায় অধিক সংখ্যক বর্ণনাকারী মারফত বর্ণিত হয়েছে যা পঠিত হয় এবং সে পঠন ইবাদত হিসাবে গণ্য হয়।

কোরআন সর্বাধিক পঠিত গ্রন্থ যা কোটি কোটি মুসলমান প্রতিদিন তেলাওয়াত বা পাঠ করে থাকে নানাভাবে। দৈনিক পাঁচবার নামাজ আদায়ের সময় সবাইকে কোরআনের আয়াত আবৃতি করতে হয়। তাই এ গ্রন্থটি যে সর্বাধিক পঠিত কেতাব তাতে কোন সন্দেহ নেই। এ জন্যই কোরআন সর্বাধিক পঠিত কিতাব (The most read book) হিসেবে খ্যাত। দুনিয়ার কোটি কোটি মানুষের মুখে কোরআনের আয়াত প্রতি নিয়ত আবৃত হচ্ছে। লক্ষ কোটি মুসলমান এ গ্রন্থটি আদি অন্ত কণ্ঠস্থ করছে। দিবা রাত্রি চব্বিশ ঘন্টার প্রতিটি মুহূর্তে এ কিতাব হাজারো মানুষ কর্তৃক পঠিত হচ্ছে। কোন একটি মুহূর্তে কোরআন পঠিত হচ্ছেনা তা বলা যাবে না।

যুগে যুগে প্রতিটি দেশ ও জাতির নিকট আল্লাহ পথ প্রদর্শক পাঠিয়েছেন। তাঁরা আল্লাহর বাণী ও তাঁর প্রদত্ত জীবন ব্যবস্থা তৎকালীন মানুষের কাছে প্রচার করেছেন। তাঁদের প্রচারিত জীবনাদর্শ ও মূল্যবোধের সার নির্যাস এ গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে যা ইসলাম নামে বর্ণিত হয়েছে। দুনিয়ার সকল জ্ঞান বিজ্ঞানের সমাবেশও এতে রয়েছে। কোরআনে তা (সুরা ইউসুফে)

এভাবে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু কোরআন পূর্বেকার সবগ্রন্থের সত্যায়নকারী এবং সকল বিষয়ের বিষদ বিবরণ প্রদানকারী । অপর আয়াতে বলা হয়েছে–

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَّهُدًى وَّرَحْمَةً وَّبُشْرٰى لِلْمُسْلِمِيْنَ -

"আমি আপনার প্রতি এ গ্রন্থ নাজিল করেছি এবং তাঁর প্রত্যেক বিষয়ের ব্যাখ্যা স্বরূপ পাঠিয়েছি, হেদায়াত, রহমত এবং মুসলমানদেও জন্য সুসংবাদ ।" (আন নাহল, আয়াত-৮৮)

কোরআনের স্ব-পরিচিতি

কোরআন মজিদ এমন এক পবিত্র গ্রন্থ- যাতে বেশ কিছু তথ্য বর্ণিত হয়েছে যা দ্বারা তার সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান লাভ করা যায়। পবিত্র গ্রন্থের নাম, যাঁর নিকট এ পবিত্র গ্রন্থ অবতীর্ণ হয়েছে তাহার নাম, যে মাধ্যমে তা নাযিল হয়েছে তার বর্ণনা, কখন কিভাবে তা প্রেরিত হল তার বিবরণ, কোন ভাষায় এ বাণী প্রেরিত হল তার বর্ণনা এবং সে ভাষায় কেন প্রেরিত হল তার কারণ ব্যাখ্যা এবং গ্রন্থটি যে সন্দেহ মুক্ত ও সংরক্ষিত ঐশী গ্রন্থ এ সব তথ্য কোরআনে বর্ণিত হয়েছে। অন্যান্য ধর্মীয় গ্রন্থের মোকাবেলায় এটি হচ্ছে কোরআনের এক বিশেষ বৈশিষ্ট। কোরআনের (৪৩:৩, ২:১৮৫, ৪৪:৩, ৪৭:১০৬, ১৬:১০২, ৪২:৫১) বর্ণিত আয়াতগুলো দ্রষ্টব্য। কোরআন বর্ণিত এ আয়াতগুলোও প্রনিধানযোগ্য–

بَلْ هُوَ قُرْاٰنٌ مَّجِيْدٌ - فِيْ لَوْحٍ مَّحْفُوْظٍ -

(ক) "এ সম্মানিত কোরআন সংরক্ষিত ফলকে লিপিবদ্ধ ।" (সূরা বুরুজ-২২)

(খ) "হে মোহাম্মদ (সা.)! আমরা তোমার নিকট এ কিতাব সঠিক তথ্য সহকারে পাঠিয়েছি, যাতে করে তুমি আল্লাহ প্রদত্ত পদ্ধতিতে মানুষের মাঝে ফয়সালা করতে পার এবং তুমি যেন খেয়ানতকারীদের উকিল না হয়ে পড় ।"

(গ) "আমার নিকট এ কোরআন ওহীর মাধ্যমে পাঠানো হয়েছে যাতে করে তোমাদেরকে এবং যাদের নিকট (এ বাণী) পৌছাবে তাদেরকে সতর্ক করতে পারি ।" (সূরা আনয়াম)

উপরে বর্ণিত আয়াতগুলো দ্বারা আমরা এ কিতাবের নাম কোরআন ও আল্লাহর রাসুল মোহাম্মদের (সা.) নিকট ওহীর মাধ্যমে পাঠানো হয়েছে বলে জানতে পারি ।

(ঘ) "যে ব্যক্তি জিবরাইলের দুশমন সে জেনে রাখুক নিশ্চয়ই জিবরাইল তোমার (রাসুলের) অন্তরে কোরআন অবতীর্ণ করেছে।" (আল বাকারাহ)

(ঙ) "পবিত্র আত্মা (জিবরাইল) তোমার প্রভু থেকে ইহা যথাযথভাবে তোমার নিকট এসেছে।" (সুরা আন নাহল-১০২)

এ আয়াতগুলোতে জিবরাইল মারফত কোরআন নাজিল হয়েছে বলে বলা হয়েছে।

(চ) "নিশ্চয় আমি কোরআন এক মোবারক রাত্রিতে নাযিল করেছি।"

(ছ) "যারা মুমিন এবং ভাল কাজ করে ও বিশ্বাস করে যা মোহাম্মদের নিকট অবতীর্ণ হয়েছে এবং তা যথাযথ।"

(জ) "নিশ্চয়ই আমি ক্বদরের রাত্রিতে কোরআন নাযিল করেছি।"

(ঝ) "আমি আমার বান্দার উপর যা মিমাংসার দিন (বদর যুদ্ধের দিন) নাযিল করেছি যখন দু'দল পরস্পর সম্মুখীন হয়েছিল।

উক্ত আয়াতগুলো থেকে জানা যায় যে কোরআন নাযিলের সূচনা রমজান মাসে হয় যে রাত্র কদরের রাত্রি ছিল সে দিন বদর যুদ্ধ সংগঠিত হয়।

(ঞ) "আমি কোরআন নাযিল করেছি বিভিন্ন ভাগে ভাগে (অংশ অংশ করে) যেন আপনি তা মানুষের নিকট ক্রমে ক্রমে পাঠ করতে পারেন এবং আমি তা ধীরে ধীরে যথাযথভাবে অবতীর্ণ করেছি।"

(ট) "আমি তা নাযিল করেছি কোরআন রূপে আরবী ভাষায় যেন তোমরা তা ভালভাবে বুঝতে পার।"

কোরআনের দীর্ঘকাল ব্যাপী (২৩ বছর) ক্রমান্বয়ে অবতীর্ণ করা এবং রাসুলের নিকট আরবী ভাষায় প্রেরণ সম্বন্ধে উপরে বর্ণিত আয়াতে বলা হয়েছে। আল-কোরআনের বর্ণনা অনুযায়ী আমরা জানতে পারলাম আল্লাহর প্রেরিত বাণী জিবরাইলের মাধ্যমে তাঁর রাসুল মোহাম্মদ (সা.) এর নিকট পর্যায়ক্রমে অবতীর্ণ হয় এবং লায়লাতুল কাদরের পবিত্র রজনীতে ওহী নাযিলের সূচনা হয়।

আল্লাহ প্রেরিত বাণী যা আল-কোরআন নামে প্রসিদ্ধ তার আরও বেশ কয়েকটি নাম কোরআনে বর্ণিত হয়েছে। সর্বাধিক প্রসিদ্ধ নাম আল-কোরআন যার উল্লেখ সর্বমোট একষট্টি বার পাওয়া যায়। অন্যান্য বিভিন্ন

নাম যা কোরআনে উল্লিখিত হয়েছে তা কোন কোন মনিষী পঞ্চান্ন (৫৫) বলে উল্লেখ করেছেন। আবার কারো মতে তা নব্বই এর অধিক। আল কোরআনে বর্ণিত অন্যান্য মশহুর নামগুলো এরূপ–

আল কিতাব বা গ্রন্থ।

আল-ফোরকান অর্থাৎ- পার্থক্য বর্ণনাকারী, হক ও বাতিল সম্বন্ধে সুস্পষ্ট পার্থক্য বর্ণনাকারী।

আল জিকর অর্থাৎ- স্মারক, যা মানুষকে তার কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন করে (আল্লাহর প্রতি ও অপর মানুষের প্রতি)

আল-হুদা অর্থাৎ- পথ প্রদর্শক, যা মানুষকে সৎ পথ প্রদর্শন করে এবং ন্যায়-নীতির নির্দেশ দেয়।

আল-তানযীল বা অবতীর্ণ বাণী, যে বাণী ওহী মাধ্যমে প্রাপ্ত।

আল-হুকুম আদেশ ও নির্দেশ যাতে সঠিক আদেশ ও নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে।

আল-শিফা অর্থাৎ রোগ মুক্তি।

আল-নিয়ামত অর্থাৎ অনুগ্রহ, আশীর্বাদ।

আল-কায়্যুম অর্থাৎ সত্য সংরক্ষক।

আল-নূর অর্থাৎ জ্যোতি।

আল-রহমত অর্থাৎ করুণা।

আল-খায়ের অর্থাৎ কল্যাণ।

আল-হাদী অর্থাৎ পথ প্রদর্শক।

আল-মোহায়মেন অর্থাৎ রক্ষক।

আল-মাওয়েজাহ অর্থাৎ উপদেশ।

আল-বায়ান অর্থাৎ ব্যাখ্যা।

আল-রূহ অর্থাৎ আত্মা-জীবন।

আল-হাবল অর্থাৎ দৃঢ় রজ্জু।

আল কোরআনের বক্তব্য

ইতিপূর্বেকার আলোচনা থেকে জানা যায় যে, কোরআনের বাণী রাসুলে খোদার নিকট পর্যায়ক্রমে প্রয়োজন মোতাবেক ধীরে ধীরে সুদীর্ঘ তেইশ বছরের নবী জীবনে প্রেরিত হয়। অন্যান্য প্রেরিত গ্রন্থের মত তা এক দফায় অবতীর্ণ করা হয়নি। এর কারণ কোরআন মজীদে এভাবে বর্ণিত হয়েছে–

"কাফেরগণ বলেন- তাঁর উপর সমগ্র কোরআন একবারে অবতীর্ণ হল না কেন? আমি কোরআনকে এভাবে (পর্যায়ক্রমে) অবতীর্ণ করেছি, যাতে আপনার হৃদয়কে মজবুত করি এবং কোরআনকে ক্রমে ক্রমে তেলাওয়াত করেছি।" (সুরা ফোরকান, আয়াত-৩২)

কোরআন মজীদের বর্ণনা ধারায় কোন রকম প্রচলিত পদ্ধতি অনুসৃত হয়নি। মানব রচিত গ্রন্থের মত নিয়মতান্ত্রিকতা রক্ষা করে বিষয়ভিত্তিক পরম্পরা রক্ষা করে প্রণীত হয়নি। কোরআন নাযিলের সুদীর্ঘ তেইশ বছর সময়কালে সময় ও অবস্থা অনুযায়ী ভাষণ বা বক্তৃতা আকারে প্রয়োজন মত রাসুলের (সা:) নিকট ঐশী বাণী প্রেরিত হয়। রাসুল তখন আল্লাহর ভাষণ ওহী বা কোরআনের বাণী দিয়ে তৎকালীন আরব জনগোষ্ঠিকে ইসলামী আদর্শ গ্রহণের আহ্বান জানান। বক্তৃতায় যেমন কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে বার বার উল্লেখ করে শ্রোতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ ও মন জয়ের চেষ্টা করা হয় তেমনি কোরআনের বাণী বক্তৃতার ধরণে নাযিল করে শ্রোতাদের মন মস্তিস্ক, বুদ্ধি বিবেক সব কিছুকেই উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করার প্রচেষ্টা নেওয়া হয়। বর্ণাঢ্য ও অলংকারপূর্ণ ভাষা ব্যবহার, আবেগময় আহ্বান ও ঝংকারপূর্ণ বক্তব্য একমাত্র বক্তৃতাতেই সম্ভব। এভাবে বক্তার বক্তব্য শ্রোতার মনে বদ্ধমুল করে দেওয়া যায় তার ধ্যান ধারণার আমুল পরিবর্তন সাধন ও মনে ভাবাবেগের সৃষ্টি করে কোন আদর্শ ও কর্মসুচীর প্রতি তাকে অনুপ্রাণিত ও উদ্বেলিত করা যায়। আল্লাহ তায়ালা কোরআনে বর্ণিত বাচনভংগী দিয়ে তাই করেছেন।

মানুষ ও মানুষের জীবনাচরণ হচ্ছে কোরআনের মুল বিষয়বস্তু। আর তার আলোচ্য বিষয় হচ্ছে মানুষের কল্যাণ। কোন ধরণের বিশ্বাস ও কর্মকান্ড মানুষের জন্য কল্যাণকর ও অনুসরণীয় আর কোন ধরণের ধ্যান ধারণা ও কার্যকলাপ তাদের জন্য অকল্যাণকর ও পরিত্যাজ্য তারই আলোচনা প্রতিটি আয়াতে করা হয়েছে। এ মূল আলোচ্য বিষয়কে তিন ভাগে ভাগ করা যায়।

(১) সৃষ্টিকর্তার এককত্ত্বতা ও তাঁর যথার্থ পরিচয়।

(২) আল্লাহর সাথে বান্দার সম্পর্ক।

(৩) মানুষের জন্য কল্যাণকর আল্লাহর প্রদত্ত পথ বা জীবনাদর্শ গ্রহণের আকাঙ্খা।

উম্মুল কোরআন সূরা আল- ফাতিহায় এ তিনটি বিষয় উল্লিখিত হয়েছে প্রথম তিন আয়াতে সৃষ্টিকর্তার পরিচয়, চতুর্থ আয়াতে সৃষ্টিকর্তার সাথে বান্দার সম্পর্ক বর্ণনা এবং শেষ তিন আয়াতে মানুষের জন্য কল্যাণকর ও মুক্তির পথ সিরাতে মুস্তাকিম আলোচিত হয়েছে। এই মূল বিষয়বস্তু পাঁচটি বিষয় সূচীর মাধ্যমে কোরআনে আলেচিত হয়েছে। প্রথম বিশ্বাস, দ্বিতীয় এবাদত বা বিশ্বাসের বহিঃপ্রকাশ- তাহল সালাত বা নামায, জাকাত, রোজা ও হজ্জ। তৃতীয় চারিত্রিক উৎকর্ষ ও মূল্যবোধ যার অধিকারী হতে পারলে অতুলনীয় বৈশিষ্ট্য বিকশিত হবে। চতুর্থ জীবন ব্যবস্থা- দৈনন্দিন জীবন যাপন ও আচরণ, সামাজিক ন্যায় নীতি প্রতিষ্ঠার জন্য সঠিক পথ ও দিক নির্দেশনা। পঞ্চম- আদর্শ কায়েমের সংগ্রাম বা জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ।

আল্লাহর ওহী কোরআন মজিদ হচ্ছে ইসলামী শিক্ষার ভান্ডার। এ মহাগ্রন্থে ইসলামের ধর্ম বিশ্বাস ও করণীয় মূলনীতির আলোচনা রয়েছে। রয়েছে আল্লাহর একত্ব বা তাওহীদে বিশ্বাসের প্রতি আহ্বান। আল্লাহ তায়ালার সাথে অন্য কোন দেবদেবীর অংশীদারীত্ব বা যুক্ত করার বিরুদ্ধে হুশিয়ারী। পরকালে মানুষের ভাল কাজের পুরস্কার এবং মন্দ কাজের শাস্তি বেহেস্ত দোজখ সম্বন্ধে অবহিত করণ। ফেরেস্তা ও জ্বিনের অস্তিত্বের বর্ণনা এবং গায়েবে বিশ্বাস স্থাপনের আহ্বান। বিশ্বাসীদের প্রতি আল্লাহ তায়ালার ইবাদত, নামাজ, রোজা, হজ্জ, জাকাত সম্বন্ধে বিশেষ আদেশ। সামাজিক আচার আচারণ বিশেষ করে মানুষের বিবাহ, বিবাহ বিচ্ছেদ, সম্পত্তির উত্তরাধিকার, এতিম, মুসাফির, প্রতিবেশী, দুস্থদের প্রতি সাহায্যের হাত প্রসারণ ও প্রতিপালন আরও অন্যান্য জাগতিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা কোরআন পাকে দেখা যায়।

ব্যক্তিগত পর্যায়ে মহাগ্রন্থ আল কোরআন মানব জাতিকে প্রশংসনীয় নৈতিক চারিত্র অর্জনে উদ্বুদ্ধ করে। বিশ্বাসীদেরকে ইসলামী নৈতিক শিক্ষায় মহামান্বিত হতে, সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা, সর্বপ্রকার মিথ্যা, অনাচার, অবিচার, অত্যাচার পরিহার করার আহ্বান জানায়।

কোরআন মজিদে মানব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার প্রতি বিশেষ নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। এমনকি বেচাকেনায় প্রতিপক্ষকে প্রতারণা

না করা এবং বিক্রিত পন্যে ওজনে হেরফের করতে নিষেধ করা হয়েছে। সব সময় স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে এ পৃথিবী মানুষের জন্য স্বল্পকালীন আবাসস্থল। একদিন তাকে এ পৃথিবীতে কৃত সব কার্যকলাপের জবাবদিহী করতে হবে। আর বলা হয়েছে ধর্ম, ধন, বর্ণ ও বংশ মানুষের সম্মানের মাপকাঠি নয়। খোদা ভীতিই একমাত্র সম্মানের মাপকাঠি। ইতিপূর্বে যে সব জাতি আল্লাহর বাণীকে অস্বীকার করে, অন্যায় অত্যাচার ও মিথ্যাচারে লিপ্ত হয়েছে; আল্লাহ প্রদত্ত নৈতিকতা বিরোধী কর্মকান্ডে সংশ্লিষ্ট হয়েছে তাদের পরিণতি সম্বন্ধে বর্ণনা দিয়ে হুশিয়ার করে দেওয়া হয়েছে বিশ্বাসীদেরকে। ভাল কাজে অংশ নেওয়া এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকতে, নবী রাসুলদের অনুকরণ ও অনুসরণের জন্য তাদের দৃষ্টান্ত স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে, যাতে করে মানুষ তাদের আদর্শ প্রচারণা থেকে শিক্ষা নিয়ে সঠিক পথে চলতে সক্ষম হয়।

কোরআন সংরক্ষণ- আল্লাহর পদ্ধতি

আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোরআন মজীদে ঘোষণা দিয়েছেন, 'জালিকাল কিতাব লা রাইবা ফিহ্' "ইহা এমন এক কিতাব; যাতে সংশয়ের কোনই অবকাশ নেই।" আল্লাহ তায়ালার ঘোষণা অনুযায়ী এ কিতাব সর্বপ্রকার তাহরীফ বা বিকৃতি, পরিবর্তন, পরিবর্ধন থেকে সংরক্ষিত। কোরআনের সংরক্ষিত হওয়া এবং তাতে কোন প্রকার বিকৃতি বা ভুল ভ্রান্তির অনুপ্রবেশ মুক্ত তা আল্লাহ তায়ালা কোরআনে এভাবে দাবী করেছেন–

"আর নিশ্চয় তা এক মহিমাময় বলিষ্ট কিতাব। কোন মিথ্যা এতে অনুপ্রবেশ করতে পারবে না, ইহার সম্মুখ দিক হতেও নয় আর ইহার পশ্চাৎ দিক হতেও নয়। ইহা নাযিল করা হয়েছে সুপ্রশংসিত মহাজ্ঞানীর তরফ হতে।

(হা মীম সিজদা, আয়াত: ৪১-৪২)

সর্বপ্রকার বিকৃতি বা তাহরীফ থেকে কোরআন মুক্ত থাকবে এ দাবির বাস্তবায়নের জন্য আল্লাহ তায়ালা নিজেই তার হেফজতের অঙ্গিকার করেছেন–

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحٰفِظُوْنَ۔

"নিশ্চয়ই আমি কোরআন অবতরণ করেছি, আর আমিই তার মোহাফেজ ও সংরক্ষক।" (সুরা আল হিজর, আয়াত-৯)

কোরআন সংরক্ষণের এ খোদায়ী ওয়াদা বাস্তবায়িত ও পূর্ণ হওয়ার ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সংশয়ের অবকাশ নেই। আল্লাহ তায়ালা তা এ ভাবে ব্যক্ত করেছেন।

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না। এমন কোন ব্যক্তি আছে, যে আল্লাহ্ অপেক্ষা অধিক সত্যবাদিতার দাবি করতে পারে?"

আল্লাহ তায়ালা কোরআন সংরক্ষণ ও হেফাজতের অঙ্গিকার করেই ক্ষ্যান্ত হননি, তিনি এ অঙ্গিকার কিভাবে বাস্তবায়িত করেছেন তারও বর্ণনা দিয়েছেন। কোরআন কিভাবে, কার মারফত রাসুলের নিকট প্রেরণ করেছেন, তিনি কতখানি নির্ভরযোগ্য আমানতদার ও অনুগত; আর পয়গাম্বর ও কোরআনের হিফাজতের মানষে কি কি পন্থা অবলম্বন করেছেন, যেহেতু তিনি উম্মি ছিলেন, যাদের হাতে তিনি কোরআন লিপিবদ্ধ করিয়েছেন, তাদের গুণাবলী ও বৈশিষ্ট সমূহ কি ছিল সবই কোরআনে বর্ণিত হয়েছে।

মহাগ্রন্থ আল কোরআন নিজেই বর্ণনা করেছেন এভাবে–

"হে নবী আপনি বলুন! যে ব্যক্তি জিবরাইলের প্রতি শত্রুতামূলক মনোভাব পোষণ করে তার জেনে রাখা উচিৎ যে, সেই (জিবরাইল) ইহাকে (কোরআনকে) আল্লাহর হুকুমে আপনার অন্তরে নাযিল করেছেন।" (সুরা বাকারা-৯৩)

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে–

"এবং নিশ্চয় ইহা হচ্ছে বিশ্ব জাহানের প্রভু পরওয়ারদিগার কর্তৃক অবর্তীর্ন, রুহুল আমীন (অর্থাৎ- আমানতদার ফিরিস্তা জিবরাইল) উহাকে পৌঁছিয়ে দিয়েছে আপনার অন্তর দেশে।" (সুরা আন নাজহুল, আয়াতা-১২)

এ ফিরিস্তার বৈশিষ্ট ও গুণাবলী কি তা কোরআন এভাবে ব্যক্ত করেছে–

"বলুন! নিশ্চয় এই কোরআন হচ্ছে মহাসম্রান্ত বাণী বাহকের (জিবরাইলের) প্রদত্ত আল্লাহর কালাম: যিনি শক্তিমান আরশ অধিপতির সমক্ষে মর্যাদায় সুপ্রতিষ্ঠিত আজ্ঞানুবর্ত আর বিশ্বাস ভাজন।" (সুরা তাকভীর, ২১ আয়াত)

বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহ কর্তৃক তাঁর নৈকট্য প্রাপ্ত সর্বশ্রেষ্ঠ ফিরিস্তার মাধ্যমে রাসুলের নিকট কোরআন পৌঁছে দেয়া হয়। রাসুল ছিলেন নৈতিক চরিত্রের দিক দিয়ে হিমালয় পর্বতের চাইতেও অধিকতর বোলন্দ এবং এ জন্যই মক্কা ও তাঁর আশে পাশের লোকেরা তাঁকে আমীন (আমানতদার) ও ছদুক (সত্যবাদী) বলে ডাকত। নবী করীমের এহেন অবস্থার বর্ণনা সুরা আন নাজ্মে এ ভাবে দেওয়া হয়েছে।

"সাক্ষ্য ঐ নক্ষত্রের, যখন তাহা নিম্নগামী হয়, তোমাদের সঙ্গী (মোহাম্মদ) দিশাহারাও হননি এবং পথভ্রষ্টও হয়ে পড়েননি। আর তিনি নিজের প্রবৃত্তির বশবর্তি হয়ে কথা বলেন না। (তাঁর) উক্তিগুলো ওহী বৈ আর কিছুই নয়- যা প্রেরণ করা হয়ে থাকে (তাঁর প্রতি), তাঁকে এমন এক ফিরিস্তা তালীম দিয়েছেন, যিনি এক বিরাট শক্তির অধিকারী।

"নবী করীম (সা.) এর ইলম, বুদ্ধিমত্তার, নৈতিক চরিত্র, অন্তদৃষ্টি ও উত্তম গুণাবলী ইহার প্রমাণ যে কোরআনের গুরুদায়িত্ব বহনের যোগ্যতা তাঁর আছে। এ দায়িত্ব পালনের নিষ্ঠাও তাঁর আছে। তাই দেখা যায়, কোরআন নাযিলের সাথে সাথে তা মুখস্ত করার ও স্মৃতিশক্তিতে বেধে রাখার উদ্দেশ্যে রাসুল অত্যন্ত দ্রুততা ও ব্যস্ততা প্রদর্শন করতেন। যা থেকে বিরত থাকার জন্য আল্লাহ তাঁকে এভাবে নির্দেশ দিয়েছেন সুরা্ কি্য়ামাহর ১৬,১৭ ও ১৮নং আয়াতে-

"(হে রাসুল) কোরআন ত্বরিত আয়ত্বের জন্য আপনি নিজের জিহ্বা চালনা করবেন না। নিশ্চয়ই আপনার অন্তরে উহা একত্রিত এবং আবৃত করানো আমারই দায়িত্ব। অতএব, যখন উহা আবৃত করা হয়, তখন আপনি শুধু আবৃত্তি নিবিষ্ট মনে অনুসরণ করবেন। অধিকন্তু তার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের ভার ও রয়েছে আমার উপর।"

সমস্ত প্রাপ্ত সাক্ষ্য প্রমাণ থেকে স্পষ্টভাবে জানা যায় যে সম্পূর্ণ কোরআন যা বর্তমানে সংরক্ষিত তা রাসুলে খোদার জীবনকালে সম্পূর্ণ করা হয় যা রাসূল (দঃ) কর্তৃক মাশহাফ আখ্যায়িত হয়েছে। এ সত্যটি দৃঢ়ভাবে বলা চলে যে, পবিত্র কোরআনে বর্ণিত আয়াতগুলিতে একটি জের জবরেও কোন প্রকার পরিবর্তন দূরে থাক একটি শব্দেও কোন প্রকার পরিবর্তন হয়নি; রাসুলে খোদার সময় থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত। আমাদের নিকট বর্তমানে রক্ষিত কোরআন মজিদের সাথে রাসুলে পাকের নিকট অবতীর্ণ কোরআন মজিদের কোন প্রকার বৈপরিত্ব ও পরিবর্তন নেই এ দাবী দ্ব্যর্থহীনভাবে করা যায়। এটি এমন এক দাবী যা অন্য কোন আসমানী কিতাবের দাবীদার জনগোষ্ঠি কখনও দাবী করতে পারবেনা।

কোরআন সংরক্ষণ- রাসুলের হিফাজত পদ্ধতি

লিখনঃ কোরআনের সংরক্ষণ ও হেফাজতের প্রক্রিয়া হিসেবে রাসুল (সাঃ) ওহী প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে তার লিপিবদ্ধকরণের ব্যবস্থা নিতেন। এ ব্যাপারে

ওহী লেখকবৃন্দ হতে কাউকে ডেকে এনে নাযিলকৃত আয়াত সমূহ লিপিবদ্ধ করে রাখতেন। রাসুলে খোদা কোরআন লিখনের জন্য মর্যাদা সম্পর্ণ ও সুদক্ষ সাহাবীদের নিযুক্ত করেছিলেন। যারা কাতেবে ওহী বা ওহীর লিপিকার বলে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। আল্লামা ইবনে কাইয়্যেম স্বীয় গ্রন্থ যাদূল মায়াদে নিম্নে বর্ণিত সাহাবীদের নাম কাতেবে ওহী হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

১. আবু বকর সিদ্দিক (রা.) ২. ওমর (রা.) ৩. ওসমান (রা.) ৪. আলী (রা.) ৫. উবাই ইবনে কাব (রা.) ৬. আবদুল্লাহ ইবনে আবি সারহ (রা) ৭. আমর ইবনে আস (রা) ৮.আবী কা'আর (রা) ৯. আবদুল্লাহ ইবনে আরকাম (রা.) ১০. মুগীরা বিন শোবা (রা.) ১১. আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রা.) ১২. খালিদ ইবনে সাঈদ ইবনে আস (রা.) ১৩. খালিদ বিন সায়িদ ইবনে আস (রা.) ১৪. মুয়াবীয়া বিন আবু সুফিয়ান (রা.) ১৫.জায়েদ বিন ছাবেত (রা.)

ইহাদের ছাড়া অন্যান্য কিতাবে আরও কতিপয় সাহাবার নামের সন্ধান পাওয়া যায়- ১৬. ইয়াজিদ বিন আবী সুফিয়ান (রা.) ১৭. আল হাজরামী (রা.) ১৮. আবদুল্লাহ বিন হাজরামী (রা.) ১৯. মোহাম্মদ বিন মাসলামা (রা.) ২০. আবদুল্লা বিন উবাই বিন সলুল (রা.) । কাতেবে ওহীর সংখ্যা ৪২ (বিয়াল্লিশ) পর্যন্ত গননা করা হয়েছে।

কোরআনে করীমে এসব লিপিকারদের ব্যাপারে সাক্ষ্য দিয়েছে এবং কোরআন কিসে লিখা হতো তাও বলা হয়েছে। "উহা লিখিত আছে মহিমান্বিত উচ্চ মর্যাদা সম্পর্ণ পরম পবিত্র সহীফা সমূহে সৎ ও মহৎ লিপিকারদের হাতে। কোরানে বলা হয়েছে- "সাক্ষ্য তুর পাহাড়ের- আর সাক্ষ্য লিখিত কিতাবের (যা লিখিত হয়) উন্মুক্ত পত্রগুলোতে।" (সুরা তুর, আয়াত-১,২)

সুরায়ে ফোরকানের এক আয়াতে বলা হয়েছে- মোহাম্মদ (সা.) এগুলোকে অন্যের দ্বারা লিখিয়ে নিয়েছেন, অত:পর সকাল-সন্ধ্যা সেগুলো তার কাছে আবৃতি করা হয়ে থাকে।

এ বর্ণনা থেকেও কোরআন যে লিখিত হয়েছিল তার প্রমাণ মেলে। রাসুলের জীবদ্বশা কোরআনের লিপিবদ্ধ করার ব্যাপারে তৃতীয় খলিফা হযরত উসমানের বর্ণিত হাদিসটি প্রণিধানযোগ্য। হাদিসটি এরূপ–

"নবী করীম (সা.) এর অভ্যাস ছিল যখন তাঁর প্রতি একই সময় কতিপয় সুরা নাযিল হতে থাকত, তখন কোন আয়াত নাযিল হলেই তিনি

লিপিকারদের কাউকে ডেকে এরশাদ করতেন যে, এ আয়াতটি অমুক সুরার যেখানে এ আলোচনা এসেছে লিপিবদ্ধ কর।"

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে, নবী করিম (সা.) কেবল আয়াত সমূহকে লিখিয়ে ক্ষ্যান্ত হতেন না, অধিকন্তু কিতাবে লেখার পরও তা পড়িয়ে শুনতেন। কোন হরফ বা অক্ষর বাদ পড়লে তা শুধরিয়ে দিতেন। যেমন ওহী লিখক হযরত যায়েদ বিন সাবেত বলেছেন– যদি কোন হরফ লেখা থেকে বাদ পড়ে যেত তাহলে তা রাসুলে করিম (সা.) সংশোধন করিয়ে দিতেন, তারপর তা সর্বসাধারণ্যে প্রচার করার হুকুম দেওয়া হত। হযরত যায়েদ বিন সাবেত কর্তৃক বর্ণিত আছে– আমরা রাসুলুল্লাহর (সা.) সামনে বসে কোরআন লিখনের সংকলনের কাজ সম্পাদন করতাম, উৎকৃষ্ট মানের খন্ড পাতলা চামড়ায়।

আল্লামা কাস্তলানী লাসী শারেহ বোখারীর উদ্ধৃতি দিয়ে আল কাত্তানীতে নকল করেছেন– গোটা কোরআনই রাসুলুল্লার (সা.) যুগে লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল। অবশ্য তখন একই স্থানে সমগ্র সুরাগুলোকে জমা করে বাঁধাই করা হয়নি। তখন যেহেতু ওহী নাযিলের সিলসিলা অব্যাহত ছিল তাই বাধাই করা হলে পরবর্তীতে বিভিন্ন সুরার বিভিন্ন আয়াত লিপিবদ্ধ করা কষ্টকর হত। তা ছাড়া রাসুলের জীবনকালে যে কোরআন মজীদ লিখিত অবস্থা বর্তমান ছিল, তা কোরআন হতেই সুস্পষ্ট প্রমাণিত হয়। কোরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে ইহার নাম কিতাব বা গ্রন্থ দেখতে পাওয়া যায়। সুরা বায়্যেনার দ্বিতীয় আয়াতে ইহাকে ছুহুফ বা লিখিত কাগজ বা পৃষ্ঠা সমূহ বলা হয়েছে। এজন্য রাসুলের জীবনকালেই যে কোরআন লিখিত হয়েছিল তা স্পষ্ট বুঝা যায়।

হেফজ করণঃ রাসুলের যুগে কোরআন মুখস্থ করা হয়েছিল। কোন কিতাব সংরক্ষণ করতে হলে তা দু'পন্থাই সম্ভব।

প্রথমতঃ তা লিখে একটি গ্রন্থে রূপ দেওয়া যাতে কোন রদবদল না হতে পারে। এ পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা হয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ তাকে মনুষ্য স্মৃতিপটে মাহফুজ করে রাখা, যাতে একজন হাফিজ বেচে থাকলেও সে কেতাব অবশ্যই মাহফুজ থাকবে। রাসুল এ কোরআন সংরক্ষণের জন্য উপরে বর্ণিত দুপন্থা অবলম্বন করেছিলেন। ইহা কোরআনের বৈশিষ্ট। রাসুলুল্লাহ (সাঃ) কোরআনের হেফজ করণেরও বিশেষ ব্যবস্থা নিয়ে ছিলেন। তাঁর নিকট ওহী নাযিল হওয়া মাত্র তিনি তা উপস্থিত সাহাবাদেরকে

আবৃতি করে শুনিয়ে দিতেন এবং তা লিপিবদ্ধ করার ব্যবস্থা করতেন। যা সাহাবীগণ তাৎক্ষণিকভাবে মুখস্ত করে নিতেন। এছাড়া রাসূলের জীবিতকালে প্রতি রমজানে তিনি সম্পূর্ণ কোরআন একবার জিবরাইল (আ.) কে আবৃতি করে শুনাতেন একে অপরের আবৃতি শুনতেন। তাঁর জীবনের শেষ রমজানে তিনি তা দুবার আবৃতি করে জিবরাইল (আ.)কে শুনিয়েছিলেন। এভাবেই কোরআনের বিশুদ্ধতা রক্ষার ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

খৃষ্টান ঐতিহাসিক স্যার উইলিয়াম মুর তার লাইফ অব মোহাম্মদ গ্রন্থে তা এভাবে বর্ণনা করেছেন।

"আরবের লোকরা কাব্য চর্চার ব্যাপারে ছিল অত্যাধিক উৎসাহী ও উৎসর্গিত প্রাণ। কিন্তু তাদের কাছে লিখনির আসবাব ও সাজ-সরঞ্জাম পর্যাপ্ত ছিল না বিধায় তা লিখার পরিবর্তে তারা তাদের কবিদের কবিতা এবং স্বীয় কওমের ঐতিহাসিক ঘটনাবলী ও পূর্ব পুরুষদের বংশ লতিকা অতি সুন্দরভাবে স্মৃতিপটে অংকিত করে নিত। এভাবে তাদের স্মৃতি শক্তি পরিপূর্ণতার উচ্চ মার্গে পৌছে গিয়েছিল এবং তাদের এ স্মৃতি শক্তিই শেষ পর্যন্ত তাদের ইসলামী আদর্শে নব জীবন লাভের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ণ ঐকান্তিকতা ও উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে কুরআনুল করীম হেফজ করার কাজে লেগেছিল।"

খেলাফত যুগে কোরআনের সংরক্ষণ ব্যবস্থা

হযরত আবু বকর এর যুগ

রাসুলুল্লাহর যুগে যদিও কোরআন লিপিবদ্ধ অবস্থায় ছিল এবং অনেকেই ইহার আদ্যান্ত মুখস্ত করেছিল কিন্তু তা পূর্বাপর ক্রমানুযায়ী এক গ্রন্থকারে একই স্থানে সংগৃহীত ছিল না। কারণ রাসুলে খোদার জীবদ্দশায় ওহী নাযিল বন্ধ ছিল না। তাঁর জীবনের শেষ পর্যন্ত ওহী নাযিলের সম্ভাবনা বর্তমান ছিল এবং নতুন আয়াত অবতীর্ণ হলে সুরার আয়তন বৃদ্ধি বা নতুন সুরা সংযুক্ত হওয়ার সুযোগ ছিল। রাসুলে খোদার পরলোক গমনের পর সেগুলোকে গ্রন্থাকারে একত্রিত করার প্রয়োজন দেখা দেয়। কারণ তখন ওহী নাযিলের পথ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যায়। হযরত মোহাম্মদ (সা.) এর ইন্তিকালের পর প্রথম খলিফা আবু বকর (রা.) মিথ্যা নবুয়্যাতের দাবিদার ও মুরতাদদের বিরুদ্ধে কিছু যুদ্ধ পরিচালনায় বাধ্য হন। এমনই এক যুদ্ধে ৬৩২ খৃঃ যা ইমামার যুদ্ধ নামে খ্যাত বহু সংখ্যক সাহাবী শহীদ হন যার মধ্যে সত্তর জন কোরআনের প্রসিদ্ধ হাফেজ ছিলেন। তখন পর্যন্ত সমস্ত কোরআন একক সমষ্টিরূপে সংকলিত ছিল না।

তাই হযরত ওমর এ ব্যাপারে জরুরী ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য হযরত আবু বকর (রা.) কে অনুরোধ করেন। প্রথমত: যে কাজ রাসুল তাঁর জীবদ্দশায় করে যাননি তা করতে খলিফা আবু বকর দ্বিধা দ্বন্দ্বে ভুগতে থাকেন। পরবর্তীকালে তিনি এ কাজের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে সক্ষম হন এবং হযরত যায়েদ ইবনে ছাবেত (রা.) কে কোরআনের বিক্ষিপ্ত পান্ডুলিপি সংকলনের দায়িত্ব দেন। হযরত যায়েদ ইবনে ছাবেতের বর্ণনানুযায়ী "তিনি আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, 'তুমি তীক্ষ্ণ জ্ঞান-বুদ্ধি সম্পন্ন উদ্যমী যুবক, তোমার সততা ও সাধুতা সম্পর্কে কারো কোন বিরূপ ধারণা সৃষ্টি হওয়ার অবকাশ নেই। হুজুরের (সা.) জামানায় তুমি ওহী লিপিবদ্ধ করার কাজ করেছ। সুতরাং তুমিই বিভিন্ন লোকের নিকট হতে কোরানের বিক্ষিপ্ত সুরা ও আয়াত সমূহ একত্রিত করে লিখতে শুরু কর। "আমিও প্রথমত: এ কাজ করতে অস্বস্থি বোধ করি। কিন্তু হযরত আবু বকর খুব জোর দিয়ে বলেন আল্লাহর কসম একাজ খুবই উত্তম। বারবার তিনি আমাকে একই কথা বলতে থাকলেন। শেষ পর্যন্ত খোদা তা'য়ালা এ কাজের যথার্থতা সম্পর্কে আমার মনেও প্রত্যয় সৃষ্টি করে দিলেন। এরপর থেকেই আমি খেজুরের ডাল, পাথর, হাঁড়, চামড়া প্রভৃতিতে লিপিবদ্ধ বিভিন্ন সূরা ও আয়াত একত্র করতে শুরু করলাম। লোকজনের স্মৃতিতে সংরক্ষিত কোরআনের সাথে যাচাই করে সেগুলি ধারাবাহিকভাবে লিপিবদ্ধ করার কাজ সমাপ্ত করলাম।"

প্রতিটি আয়াতের ক্ষেত্রেই তিনি নিজের স্মৃতি, লিখিত দলিল, অন্যান্য হাফেজগণের তেলাওয়াত প্রভৃতি সবগুলোর সাথে যাচাই করে সর্বসম্মত বর্ণনার ভিত্তিতেই তার পান্ডুলিপি লিপিবদ্ধ করেছেন। হুজুর (সা.) যে সব সাহাবাদের দিয়ে ওহী লিপিবদ্ধ করাতেন সাধারণ ঘোষণার মাধ্যমে সেসব পান্ডুলিপি একত্র করার ব্যবস্থা করেন। সেগুলি যাচাই করার জন্য চার পদ্ধতি অবলম্বন করেন।

১। সর্ব প্রথম তিনি তাঁর স্মৃতিপটে রক্ষিত কোরআনের সাথে সেগুলি যাচাই করতেন।

২। হযরত ওমরও হযরত যায়েদের সাথে এ কাজে নিয়োজিত হন। তারা যৌথভাবে পান্ডুলিপিগুলি গ্রহণ করতেন এবং যাচাই করতেন।

৩। এমন কোন লিখিত আয়াত গ্রহণ করা হতনা, যতক্ষণ পর্যন্ত সে আয়াত সম্পর্কে অন্তত দু'জন বিশ্বস্ত সাক্ষী এ মর্মে সাক্ষ্য দিতেন যে, এগুলি রাসুলে করীম (স.) এর সামনে লিপিবদ্ধ হয়েছিল।

৪। অত:পর লিখিত আয়াতগুলি অন্যান্য সাহাবী কর্তৃক লিখিত পান্ডুলিপির সাথে যাচাই করা হত।

হযরত যায়েদ ইবনে ছাবেত অসাধারণ সাবধানতার সাথে কোরআনের পরিপূর্ণ পান্ডুলিপি লিপিবদ্ধ করেন। প্রতিটি সুরা পৃথক পৃথক করে লিখা হওয়ায় অনেকগুলি ছহিফায় বিভক্ত ছিল। তখনকার পরিভাষায় এ ছহিফাগুলিকে উম্ম বা মূল পান্ডুলিপি বলা হত। পান্ডুলিপিটিতে এ বৈশিষ্টগুলো ছিল।

ক) আয়াতগুলি হুজুর (দ.) এর নির্দেশিত ধারায় লিপিবদ্ধ করা হলেও সুরাগুলির ধারাবাহিকতা ছিলনা। প্রতিটি সুরা পৃথক পৃথক লিখিত হয়েছিল।

খ) সুরায় সাতটি কেরাতই সন্নিবেশিত ছিল।

গ) এ পান্ডুলিপি রাসুল যুগের লিখন পদ্ধতিতে লিখা হয়।

ঘ) পান্ডুলিপিটি মুল দলিল হিসাবে তৈরী করা হয় যাতে করে অন্যরা তা রেফারেন্স হিসাবে ব্যবহার করতে পারে।

হযরত আবু বকর এর তত্ত্বাবধানে সংকলিত পান্ডুলিপিটি তাঁর ইনতিকালের পর হযরত উমরের হেফাজতে থাকে। হযরত উমরের শাহাদাতের পর তাঁর ওছিয়ত অনুযায়ী তা উম্মুল মোমেনীন হযরত হাফছার (রা.) নিকট রাখা হয়। হযরত হাফছার ইনতিকালের পর পরবর্তীকালে মারওয়ান এ নুসখাটি পুড়িয়ে ফেলেন। যাতে করে কোন প্রকার বিভ্রান্তির সৃষ্টি না হয়, তখন সরকারীভাবে প্রচলিত উসমানী সংকলনের সাথে যা ছিল সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত।

উসমানী যুগে হিফাজত

হযরত উসমানের খেলাফতকালে ইসলাম দ্রুত বিস্তৃতি লাভ করে। এ সময় বহু দেশ- ইরাক, শাম, মিশর, উত্তর আফ্রিকা, ইরান এবং হিন্দুস্থানের সমুদ্র উপকুল পর্যন্ত মুসলমানদের করতলগত হয়। আরব-অনারব নির্বিশেষে অগনিত লোক দলে দলে ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নেয়। তাই বিভিন্ন আরবী গোত্রীয় উপভাষার বিভিন্নতা ও অনারব মুসলিমদের ত্রুটিপূর্ণ আরবী উচ্চারণের দরুণ কোরআন মজিদের পঠনে নানা প্রকার ব্যতিক্রম সৃষ্টি হয়। এ নিয়ে তৎকালীন মুসলিম সমাজে বাকবিতন্ডা, মতদ্বৈততা, কোন্দল ও হানাহানি ঘটতে থাকে। সীমান্তবর্তি এলাকায় জেহাদকালীন সময় এসব পর্যবেক্ষণ করায় হোজাইফা ইবনে ইয়ামান (রা.) তৃতীয় খলিফা

হযরত উসমান (রা.) কে এ ব্যাপারে অবহিত করে যথাশীঘ্র বিহিত ব্যবস্থা নেওয়ার অনুরোধ করেন। খলিফা পরিস্থিতির গুরুত্ব অনুধাবন করে নেতৃস্থানীয় সাহাবাদের পরামর্শক্রমে বিশুদ্ধ কোরেশ গোত্রীয় উপভাষায় কোরআন মজিদকে সম্পাদনা ও সংকলিত করার পদক্ষেপ নেন। তদনুসারে হযরত আবু বকরের সময়কালীন লিখিত পাণ্ডুলিপি আনয়নপূর্বক জায়েদ বিন সাবেত, আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের, যাইদ ইবনুল আস, আবদুর রহমান বিন আওফ ও হারিছ বিন হিশামকে মূল কোরআনের পাণ্ডুলিপি থেকে নকল প্রস্তুত করতে আদেশ দেন। মোট সাতটি পাণ্ডুলিপি তৈরী করা হয়েছিল বলে জানা যায়। অন্যান্য সমস্ত বিক্ষিপ্ত নোসখাগুলো সংগ্রহ করে আগুনে পুড়িয়ে বিনষ্ট করা হয়।

তাই দেখা যায়, হযরত উসমান মুসলমানদের মধ্যে ভবিষ্যতে মতভেদ সৃষ্টির পথ রুদ্ধ করার জন্য এবং কোরআন মজিদের বিশুদ্ধতা নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা সম্পূর্ণরূপে দুরীভূত করার জন্য রাজকীয় আদেশ দ্বারা কোরআনের আদি ভাষা বিশুদ্ধ কোরেশী আরবীতে সুরাগুলোকে ক্রমানুপাতে লিপিবদ্ধ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এ হিসেবে তাঁর উপাধি 'জামিউল কোরআন' অর্থাৎ কোরআন সংকলনকারী না হয়ে 'জামেউন্নাসে আলা মোসাহেফিন ওয়াহেদিন' অর্থাৎ এক মাসাহেফের অধীনে সমগ্র মানুষকে সমবেতকারী গণ্য হওয়া উচিৎ। হযরত আল্লামা সুযুতী আল ইতকান গ্রন্থে তা এভাবে বর্ণনা করেছেন। "হযরত উসমান মানুষের মাঝে জামেউল কোরআন হিসেবে প্রসিদ্ধ অথচ তা ঠিক নয়। প্রকৃত পক্ষে তিনি সমগ্র মানবের জন্য একই কিরাত নির্ধারিত করে দিয়েছেন।

কোরআনের আয়াত ও সুরার বিন্যাস্তকরণ

ইতিপূর্বেকার আলোচনায় আমরা জানতে পাই রাসুলে করীমের সময়ই কোরআন শরীফ লিখিত অবস্থায় বর্তমান ছিল। আরও জানা গেছে যে সমস্ত কোরআন একই সময় বা একাধিক্রমে অবতীর্ণ হয়নি, সব সুরাও একই সময় বা একাদিক্রমে অবতীর্ণ হয়নি। কোন সময় হয়ত এক সুরা একই সময়ে অবতীর্ণ হয়েছে। অন্য সময় হয়ত এক সুরা বিভিন্ন সময়ে অবতীর্ণ হয়েছে। কখনও বা এক সুরার অংশ বিশেষও অন্য সুরার অংশ বিশেষ এক সঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। সুতরাং আয়াত সমূহকে বিশেষভাবে রাসুলে করীম (সা.) কর্তৃক সজ্জিত করা হয়েছে, আবার সুরাগুলোকে মর্মানুযায়ী অগ্র পশ্চাৎক্রমে বিন্যাস্ত করা হয়েছে। রাসুলে খোদার যুগে কোরআনের আয়াত ও সুরা সমূহ

যে পদ্ধতিক্রমে বিন্যাস্ত ছিল বর্তমান মুসলিম জগতে যে কোরআন প্রচলিত আছে উহাও সেভাবে সে পদ্ধতিক্রমে সজ্জিত আছে।

সুরা কেয়ামাহ ১৭ ও ১৮ আয়াতে কোরআন সম্বন্ধে, আল্লাহর বাণী এরূপ অবতীর্ণ হয়েছে। "নিশ্চয়ই আমাদেরই উপর ইহা জমা করাও আবৃতি করার (ভার অর্পিত) সুতরাং যখন ইহা আমরা আবৃতি (অবতরণ) করি, তখন ইহার অনুসরণ কর।" এখানে 'জমাকরা' শব্দ সংগ্রহ করা ও সাজান উভয় অর্থ জ্ঞাপক। কারণ এখানে আবৃতি ও জমা করা দুই বিভিন্ন ক্রিয়ারূপে উল্লিখিত হয়েছে। শুধু সংগ্রহ অর্থে জমা হলে জমাশব্দের কোন প্রয়োজনই ছিল না; কারণ আয়াত সমুহ পূর্বেও পরে যে রূপভাবে অবতীর্ণ হয়েছে, তাতে সেগুলো আপনা আপনিই সংগ্রহ হত। বিষয় বিবেচনায় আয়াতগুলোকে বিভিন্ন সুরায় সন্নিবিশ করতে হত বলে এবং সুরাগুলোকেও অর্থ অনুযায়ী সাজাতে হত বলেই আবৃতি ও জমা এ উভয় শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে ঐশী প্রেরণায় নির্দেশক্রমে রাসুলে করীম (সা.) স্বয়ং কোরআনের আয়াত ও সুরা সমুহ বিষয় ও মর্মানুযায়ী সজ্জিত করেছেন। রাসুল (দ.) নিজেও হাফিজ ছিলেন এবং তিনি এমন সব সাহাবীদের দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিলেন যারা অবতীর্ণ ওহী শুনতেন হেফজ করতেন এবং তা স্মৃতিপটে আবদ্ধ করতেন।

মক্কী ও মাদানী সুরা

আল-কোরআনে বর্ণিত সব সুরাগুলোকে দু শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে যা মক্কী সুরা ও মাদানী সুরা নামে চিহ্নিত। ১১৪টি সুরার মধ্যে ৯২টি মক্কী সুরা আর বাকী ২২ টি মাদানী সুরা। হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ সুরা সমুহকে মক্কী সুরা বলা হয়। যদিও কোন কোন সুরা মক্কা ছাড়া অন্যত্র মক্কার বাইরে নাযিল হয়ে থাকবে। পক্ষান্তরে হিজরত পরবর্তীকালে নাযিলকৃত সুরা সমুহ মাদানী সুরা নামে খ্যাত যদিও কোন কোন আয়াত হিজরতের পর মদীনার বাইরে নাযিল হয়ে থাকবে।

মক্কী সুরাগুলোর অবতীর্ণ হওয়ার সময় সহজে চিহ্নিত করা যায়না। অপর দিকে মাদানী সুরাগুলো নাযিলের সময় সহজে চিহ্নিত করা যায়। মক্কী সুরাগুলো সংক্ষিপ্ত, ছন্দময়, জোরালো ও আবেগময় ভাষায় বর্ণিত হয়েছে। মাদানী সুরাগুলো দীর্ঘ গদ্যের আঙ্গিকে সৌকর্যপূর্ণ ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে। রাসুল (সা.) এবং তাঁর মুষ্টিমেয় সাথীদেরকে মক্কার মুশরিক ও কাফিরদের অবিরাম নির্যাতনের মুখে ধৈর্য্য ধারণের আহ্বান জানানো

হয়েছে। মক্কায় প্রথম পর্যায়ে চার পাঁচ বছরে নাযিলকৃত আয়াত সমূহে প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলির প্রতিজ্ঞা দিয়ে শুরু করা হত। কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে তা কোরআনের নিজের কছম ব্যক্ত করা হয়েছে।

মাদানী যুগে রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় বিধি ব্যবস্থা ও যাবতীয় মৌলিক আইন যেমন ফৌজদারী আইন, সামাজিক বিধি ব্যবস্থা, যুদ্ধ পরিচালনা, উত্তরাধিকার আইন, অর্থনৈতিক বিধান ইত্যাদি বর্ণিত হয়। মদীনায় বসবাসকারী ইহুদী ও খৃষ্টান ও মোশরেকদেরকে তাদের জঘন্য কার্যকলাপ ও পরিনাম সম্পর্কে সাবধান করে দেওয়া হয়। কোরআনের কিছু সুরা মিশ্রিত। কোন সুরাকে মক্কী-মাদানী গণ্য করার ব্যাপারে আয়াতের অবতরণের স্থান এবং আনুপাতিক আয়াতের সংখ্যাকে মাপকাঠি রাখা হয়েছে। অর্থাৎ সুরার বেশীর ভাগ আয়াত যেখানে অবতীর্ণ হয়েছে সে হিসেবে মক্কী ও মাদানী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। নবুয়তের প্রাথমিক ১৩ বছর মক্কী যুগ ধরা হয়। এর পরবর্তী ১০ বছর কালকে মাদানী যুগ বলা হয়।

মক্কী ও মাদানী যুগের অবতীর্ণ সুরাগুলোর পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য যা মা'রেফুল কোরআনে এভাবে বর্ণিত হয়েছে।

১। যে সব সুরায় 'কাল্লা' শব্দ অর্থাৎ কখনই নয় ব্যবহৃত হয়েছে, সে সব সুরাগুলো মক্কী। বর্ণিত শব্দটি কোরআনে তেত্রিশবার পনেরটি সুরায় ব্যবহৃত হয়েছে এবং এসব সুরা কোরআনের শেষার্ধে দেখা যায়।

২। যে সব সুরায় (হানাফী মাজহার মতে) সেজদার আয়াত আছে সেগুলো মক্কী।

৩। সুরা বাকারা ব্যতীত যে সব সুরায় আদম ও ইবলীসের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে সেগুলো মক্কী।

৪। যে সব সুরায় জিহাদের নির্দেশ অথবা নিয়ম কানুন বিবৃত হয়েছে সেগুলো মাদানী।

৫। যে সব সুরায় মুনাফেকদের প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে সেগুলো মাদানী।

নিম্নোক্ত বৈশিষ্টগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কিন্তু স্থান বিশেষে বিপরীত হয়ে থাকে।

১। মক্কী সুরাগুলোর মধ্যে সাধারণতঃ হে মানবসন্তানগণ বলে সম্বোধন করা হয়েছে। অপরপক্ষে মাদানী সুরাগুলোয় অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ বলে সম্বোধন করা হয়েছে।

২। মক্কী সুরা এবং আয়াত সাধারণত: ছোট এবং সংক্ষিপ্ত অপর পক্ষে মাদানী সুরা এবং আয়াত সাধারণত: দীর্ঘ ও বিশ্লেষণাত্মক।

৩। মক্কী সুরাগুলোতে তওহীদ, রিসালত এবং আখেরাত প্রমাণ, হাশরের ও শেষ বিচারের চিত্র বর্ণনা, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওসাল্লামকে সান্তনা প্রদান এবং পূর্ববর্তী জাতি সমূহের ঘটনাবলী বর্ণিত হয়েছে। এগুলোতে আহকাম ও আইন কানুন অপেক্ষাকৃত কম বিবৃত হয়েছে। অপরপক্ষে মাদানী সুরাগুলোতে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক নিয়মনীতি, আইনকানুন, জিহাদের নির্দেশ এবং সামাজিক ও রাষ্ট্রিয় জীবনের বিধিবিধান বর্ণনা করা হয়েছে।

৪। মক্কী সুরাগুলোর মধ্যে প্রতিপক্ষ হিসেবে সাধারণতঃ মোশরেক ও মুর্ত্তি পুজকদের দেখানো হয়েছে। অপরপক্ষে মাদানী সুরাগুলোর মধ্যে আহলে কিতাব ও মুনাফিকদের বিষয় পূর্ণাঙ্গ আলোচিত হয়েছে।

৫। মক্কী সুরাগুলোর বর্ণনা রীতি সাধারণত: অত্যন্ত অলংকার বহুল এবং এগুলো উপমা সম্বলিত, বর্ণাঢ্য ভঙ্গিতে উপস্থাপন করা হয়েছে। অধিকন্তু এসব সুরায় অত্যন্ত সমৃদ্ধ শব্দ সম্ভারের সমাবেশ ঘটানো হয়েছে। অপর পক্ষে মাদানী সুরাগুলোর বর্ণনা ভঙ্গী অপেক্ষাকৃত সরল ও সহজবোধ্য।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের বাণী রাসুলে খোদার নিকট তাঁর ১০ বছর মক্কী জীবনে অবতীর্ণ হতে থাকে এবং তাঁর হিজরত পরবর্তী ১৩ বছর মদীনায় অবস্থানকালে অবতীর্ণ হয়। এ সিলসিলা তাঁর রেহলতের পর সমাপ্তি ঘটে। মক্কায় রাসুলে খোদার অবস্থানকালীন সময় যে সব আয়াত অবতীর্ণ হয় তা মক্কী সূরা নামে চিহ্নিত হয়। আর মদীনায় অবস্থানকালীন সময় রাসূলে খোদার নিকট অবতীর্ণ সূরা আয়াতগুলি মাদানী সূরা নামে আখ্যায়িত হয়।

মক্কী ও মাদানী সূরাগুলি এভাবে চিহ্নিত করা হয়–

মক্কী সূরা–

অবতীর্ণের সময়	মোট সূরার সংখ্যা	সূরাগুলির নম্বর
মক্কার প্রাথমিক যুগে	৬০ সূরা	১, ১৭-২১, ৫০-৫৬, ৬৭-১০৯ এবং ১১১
মক্কায় অবস্থানের মধ্যযুগ	১৭ সূরা	২৯-৩২, ৩৪-৩৯ এবং ৪০-৪৬
মক্কায় অবস্থানের শেষ পর্যায়	১৫ সূরা	৬, ৭, ১০-১৬, ২২, ২৩ এবং ২৫-২৮

মাদানী সূরা–

অবতীর্ণের সময়	মোট সূরার সংখ্যা	সূরাগুলির নম্বর
হিজরতের পর প্রথম দু বছরে	৬ সূরা	২, ৮, ৪৭, ৬১, ৬২ ও ৬৪
হিজরতের ৩য় ও ৪র্থ বর্ষে	৩ সূরা	৩, ৫৮ ও ৫৯
হিজরতের ৫ম-৮ম বর্ষে	৯ সূরা	৪, ৫, ২৪, ৩৩, ৪৮, ৫৭, ৬০ ও ৬৩
হিজরতের ৯ম-১০ম বর্ষে	৩ সূরা	৯, ৪৯ ও ৬৬

পর্যায়ক্রমে নাযিল হওয়ার কারণ

কোরআন করীম সুদীর্ঘ তেইশ বছর যাবত রাসুলে খোদার নিকট নাজেল হয়েছে। এ পর্যায়ক্রমিক অবতীর্ণ হওয়ার ব্যাপারে, আরবের মুশরিক ও কাফিরদের সমালোচনার জওয়াবে আল্লাহ্ তায়ালা বলেছেন।

কাফিরগণ বলে কোরআন তাঁর (রাসুলের) প্রতি একবারে কেন নাযিল করা হল না? এভাবে (ধীরে ধীরে পর্যায়ক্রমে নাযিল করেছি) যেন আপনার অন্তরে তা দৃঢ়ভাবে গ্রথিত করে দেওয়া যায় এবং তার পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা (উপস্থাপন) করা যায়। (আল ফোরকান, আয়াত-৩২,৩৩)

পর্যায়ক্রমে কোরআনের আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণ আয়তগুলোকে রাসুলে খোদার (সা.) অন্ত:করণে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করা এবং স্মৃতিপটেও অন্যভাবে সংরক্ষণ করা সহজ করা। কোরআনের আদেশ নিষেধ ধীরে ধীরে কার্যকরী করতে ইসলামের অনুসারীদের অভ্যস্থ করা। এ ছাড়া বিরুদ্ধবাদীদের বিভিন্ন প্রশ্নের জওয়াব এভাবে পর্যায়ক্রমে দেওয়া হয়। এছাড়া বিভিন্ন সময় বিভিন্ন প্রেক্ষিতে ওহী নাযিল হয়।

শানে নযুল বা পটভূমি

কোরআনের আয়াতগুলো দু'ভাবে অবতীর্ণ হয়েছে। বেশ কিছু আয়াত আল্লাহ তায়ালা নিজ তরফ থেকে কোন নির্দেশ বা উপদেশমূলক প্রসঙ্গ বর্ণনা

উপলক্ষে বর্ণনা করেছেন। আর কিছু আয়াত কোন বিশেষ ঘটনা কিংবা আলোচনা সমালোচনা বা প্রশ্নের জওয়াব প্রদান উপলক্ষে নাযিল হয়েছে। সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলো হচ্ছে সেসব আয়াতের পটভূমি। ইসলামী পরিভাষায় এসব পশ্চাৎবর্তি পটভূমিকেই শানে নযুল বলা হয়। যেমন অন্ধ সাহাবীর ঘটনা। তাফসীরের ক্ষেত্রে শানে নযুল অত্যন্ত গুরুত্ববহ। এমন অনেক আয়াত আছে যেগুলোর প্রকৃত অর্থ ও তাৎপর্য শানে নযুল ছাড়া অনুভব করা বা উদ্ধার করা কষ্টসাধ্য।

কোরআন পাঠে সাত ক্বিরাত

রাসুলুল্লাহ (সাঃ) সাত পদ্ধতিতে কোরআন পাঠের অনুমোদন দিয়েছেন।

"সাত হরফে কোরআন নাযিল করা হয়। তোমাদের যার পক্ষে যে হরফে তেলওয়াত করা সহজ হয় সেভাবেই তেলওয়াত করবে।" বোখারী কোরআন যদিও কোরেশদের গোত্রীয় ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে কিন্তু সাতটি গোত্রীয় বা আঞ্চলিক ভাষায় (Dialect) তা পড়ার অনুমতি প্রদান করা হয়। এতে সকলের জন্য কোরআনের উচ্চারণ সহজ হয়। আরবে তখন প্রসিদ্ধ সাতটি গোত্র ছিল। গোত্রগুলো হল- কুরাইশ, হুযায়েল, তামীম, ইষদ, রবীয়া, বনি বকর। অপরদিকে সাত এখানে নির্দিষ্ট সংখ্যা বোধক না হয়ে তা একাধিক সংখ্যা জ্ঞাপকও হতে পারে; অর্থাৎ একাধিক প্রণালীতে কোরআন পাঠ সমর্থিত হয়েছে। আরবের বিভিন্ন সম্প্রদায়ে একই আরবী ভাষা প্রচলিত ছিল কিন্তু তাদের কথ্য ভাষায় কোন শব্দের উচ্চারণে কিঞ্চিৎ পার্থক্য ছিল। মাঝে মাঝে ইডিয়াম বিশেষেও বিভিন্নতা দেখা যায়। যেমন আমাদের দেশের আঞ্চলিক ভাষায় তারতম্য দেখা যায়। এক বাংলাদেশে স্থান ভেদে 'করিব' 'করব' 'করমু' 'করবাম' বিভিন্ন প্রণালীতে উচ্চারিত হয়।"

এখানে হাদিস গ্রন্থ তিরমিজীতে উল্লিখিত উবাই বিন কাবের বর্ণিত হাদীসটি প্রনিধানযোগ্য।

"রাসুল (সা.) এর নিকট জিবরাইল আসলে তিনি তাঁকে বলেন হে জিবরাইল নিশ্চয়ই আমি এমন এক জাতির নিকট প্রেরিত হয়েছি যারা নিরক্ষর। তাদের মধ্যে বুড়াবুড়ি, বালক-বালিকা এমন লোকও আছে যারা কখনও কোন বই পুস্তক পড়েনি। জিবরাইল (আ.) বলেন, হে মোহাম্মদ, নিশ্চয়ই কোরআন সাতটি সাম্প্রদায়িক ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে।" সাম্প্রদায়িক ভাষায় (Local

dialect) এর অনুমতি সবার পক্ষে সহজে আবৃতির জন্য দেওয়া হয়েছিল। যতদিন ইসলামের আহ্বান কোরাইশ ও মক্কাবাসীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল ততদিন এরূপ অনুমতির প্রয়োজন হয়নি এবং তার প্রয়োজনও ছিল না। যখন ইসলাম মক্কাবাসী ও কোরেশদের বাইরে বিস্তৃতি লাভ করল তখনই এরূপ অনুমতির প্রয়োজন অনুভব করা হয় এবং তখন তা দেওয়া হয়। আর পরবর্তীকালে যখন ইসলামের বিস্তৃতি অনারবদের মাঝে ছড়িয়ে পড়ে এবং আবৃতিতে নানা বিকৃতি দেখা দেয় তখন হযরত উসমান (রা.) এর সময় আবার কোরআনের আবৃতি ও লিখন কোরাইশদের উপভাষায় অনুমোদিত ও নির্ধারিত করে দেওয়া হয়। ইহাই হল কোরআন সংকলনে হযরত উসমানের মুসলিম উম্মাহর প্রতি বিশেষ দান।

কোরআন আবৃতি ও কেরাত

আল্লাহ তায়ালা কোরআন মজিদকে সাতটি উচ্চারণ পদ্ধতিতে পঠনের অনুমতি দিয়েছেন। হাদীসে বর্ণিত আছেঃ

অর্থাৎ- এ কোরআন সাত উচ্চারণে নাযিল করা হয়েছে এর মধ্যে তোমাদের যার পক্ষে যেভাবে সহজ হয় সেভাবেই তিলাওয়াত কর (বোখারী)।

ইসলামের প্রাথমিক যুগে উচ্চারণের সুবিধার্থে সাত কেরাতের মাধ্যমে সাত আঞ্চলিক বা গোত্রীয় উপভাষায় বা উচ্চারণে কোরআন তেলওয়াতের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। পরবর্তীকালে আরব ভূখন্ডের বাইরে ইসলামের বিস্তৃতির কারণে এবং অনারবদের মাঝে ইসলামের প্রসার হওয়ার দরুণ উচ্চারণে বিভিন্নতা সৃষ্টি হয় এবং তৎকালীন মুসলিম জনগোষ্ঠির মাঝে নানা বৈরিতা ও ভুল বুঝাবুঝির আবির্ভাব হয়। এ বৈরীতা ও ভুল বুঝাবুঝি নিরসনের জন্য তৃতীয় খলিফা হযরত উসমান সর্বসম্মতিক্রমে কোরআনের উচ্চারণ পদ্ধতি কোরাইশ গোত্রের উচ্চারণ পদ্ধতি অনুযায়ী নির্ধারিত করেন। তাই পরবর্তীকালে হযরত উসমানের নির্ধারিত কোরেশীয় উচ্চারণ পদ্ধতি সৃষ্ট সম্মতিতে গৃহীত হয়।

কোরআনের আবৃতি প্রত্যেক মুসলমানের দৈনন্দিন কর্মকান্ডের অংশ। তাই মুসলমানগণ কোরআনের আবৃতিকে তাদের আধ্যাত্মিক উন্নতি ও আত্মার প্রশান্তি লাভের জন্য শিল্প পর্যায়ে উন্নীত করে। আবৃতি শিল্পকে উৎকর্ষ সাধন করে তাকে ইসলামী জ্ঞানের একটি স্বতন্ত্র শাখায় পরিনত করে যা ইলমে ক্বেরাত বা তাজবীদ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। আলেমগণ ক্বেরাত পদ্ধতিগুলোর খুঁটি নাটি সব দিক বিশ্লেষণ করে কিতাব লিখা আবার শুরু

করেন। আবদুল্লাহ ইবনে মোজহের (মৃত ৩২৪ হিজরী) তাঁর কিতাবে সাত কারীর আবৃত্তি পদ্ধতি বর্ণনা করেন। পরবর্তীকালে সাত কারীর আবৃত্তি পদ্ধতি জনপ্রিয় হয়। এ সাত কারী হযরত উসমান কর্তৃক নির্ধাতি উচ্চারণ পদ্ধতি অনুসরণে কেরাআত পদ্ধতি প্রচলন করেন। সাত কারীর নাম–

(১) আবদুল্লাহ ইবনে কাসিম আদদায়ী (মৃত ১২০ হিঃ) (২) নাফে বিন আবদুল হেমান (মৃত ১৬৯ হিঃ) (৩) আবদুল্লাহিল হিসবী (মৃত ১১৮ হিঃ) (৪) আবু আমার যাব্বান ইবনুল আলা (মৃত ১৫৪ হিঃ) (৫) হামযা বিন হাবীব আযযাইয়াত (ওফাত ১৮৮ হিঃ) (৬) আসেম বিন আবিন নাজুদ আল আসাদী (মৃত ১৭ হিঃ) (৭) আবুল হাসান আলী বিন হামযা আল কাসারী (মৃত ১৮৯ হিঃ) এ ছাড়া কোন কোন গ্রন্থাকার চৌদ্দজন কারীর কেরাআত বা আবৃত্তির উল্লেখ করেছেন। এ সাত ক্বারীও ক্বেরাত ইসলামের প্রাথমিক যুগের সাত গোত্রীয় পঠন পদ্ধতি এক নয়।

ভ্রান্তির অপনোদন

কোরআন অসম্পূর্ণ বলে কোন কোন মহল দাবি করে থাকে। তা সঠিক নয়। মোল্লা মোহছিন একজন বিখ্যাত ধর্মশাস্ত্রবিদ শিয়া পন্ডিত এবং কোরআনের ভাষ্যকার। শিয়া মুসলিম জগতে বিশেষ প্রভাব প্রতিপত্তি সম্পন্ন কয়েকজন নামজাদা আলেমের মত উদ্ধৃতি করে তিনি দেখিয়েছেন যে তারা সবাই বিশ্বাস করেন হযরত রাসুলে খোদার নিকট যে কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে অবিকল তাহাই এখন দু মলাটের মাঝে আছে এবং তা লোকের মাঝে প্রচলিত।

হযরত আলী রাসুলে খোদার ইন্তেকালের কিছুদিন পর উট বোঝাই তাঁর লিপিবদ্ধকৃত কোরআনের পান্ডুলিপি প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর ও অন্যান্য সাহাবীদের নিকট হস্তান্তর করেন যা তাঁদের নিকট গৃহিত হয়নি। এ ব্যাপারে আসল সত্য হল, হযরত আলী (রা.) যে পান্ডুলিপি হস্তান্তর করেন তা শুধুমাত্র কোরআনের পান্ডুলিপি ছিল না। তা ছিল তাঁর নিজস্ব ব্যাখ্যা সম্বলিত পান্ডুলিপি। মাসহাফে আলীতে তাফসীর ও ব্যাখ্যার বর্ধিত অংশ ছাড়াও রহিতকৃত আয়াত সমূহ, মোনাফেকদের নাম, শানে-নযুল ও অন্তর্ভূক্ত ছিল। এ জন্য মাসহাফে আলীকে কোরআনের পান্ডুলিপি বলা যায় না। হযরত আবু বকরের খেলাফতের যুগে কোরআনের সংকলন প্রস্তুত করার সময় এবং পরবর্তীকালে হযরত উসমানের যুগে চূড়ান্ত সংকলন লিপিবদ্ধ করার সময় হযরত আলীও এ কাজের সহযোগী ছিলেন। কোন প্রকার

ব্যতিক্রম দেখা গেলে তিনি তার প্রতিবাদ করতেন। এছাড়া তাঁর খেলাফতকালীন সময় তাদের মাসহাফ প্রচলন করা তাঁর দ্বারা অসম্ভব ছিল না বা তার সুযোগ ছিল। কিন্তু তিনি এ দু'য়ের কোনটিই করেন নি। তাতে বুঝা যায় বর্তমানে প্রাপ্ত ও প্রচলিত দু মলাটের মাঝে রক্ষিত কোরআনই প্রকৃত কোরআনের সংকলন অন্য কিছু নয়। এ ব্যাপারে হযরত আলীর বক্তব্য প্রনিধানযোগ্য- "তোমরা উসমানের (রা.) ব্যাপারে নেক ধারণা পোষণ কর। কারণ তিনি কোরআন সম্বন্ধে যা কিছু করেছেন তা আমাদের পরামর্শ নিয়েই করেছেন।" এ ব্যাপারে শিয়া মতাবলম্বিদের সঠিক মতামত মাকালাতে দারুল তাকবীর গ্রন্থের ২৫৩ পৃষ্ঠায় এভাবে বর্ণিত হয়েছে। "অতএব এ ব্যাপারে (মাসহাফে আলীর ব্যাপারে) বর্ণনাদি দ্বারা যা বুঝে আসে তাহলো মাসহাফে আলী (রা.) নাযিল হওয়া দৃষ্টে এবং ব্যাখ্যার প্রেক্ষাপটে কিছু অধিক বক্তব্য সম্বলিত ছিল। কিন্তু এসব বর্ণনার কোনটিই বুঝায় না যে, ঐসব বর্ধিত বক্তব্য কোরআনের অংশ রূপে গণ্য ছিল।

বর্তমানে প্রচলিত মাসহাফে উসমানীর দাফফাতাইন তথা মলাটদ্বয়ের মধ্যবর্তি আল্লাহর বাণীই কোরআন, এর বাইরে কোন কিছু কোরআন নয়। এ প্রসঙ্গে আল্লামা তুসী বলেন, "বর্তমানে কোরআন- যা দফফাতাইনের অন্তর্ভূক্ত তাই নির্ভুল কোরআন।" এতে কোন সন্দেহ নেই। কম বেশী হওয়ার বর্ণনাগুলো একক সূত্রে বর্ণিত- খবরে আহাদ যদ্বারা নির্ভুল কোরআন অর্জিত হয়না। যার ভিত্তিতে আমল করাও ওয়াজেব হয়না। কাজেই এরূপ বর্ণনাদ্বারা কোরআনের বিশুদ্ধতায় ফারাক আসতে পারে না। অথচ এসব বর্ণনা বিশ্লেষণ সাপেক্ষ।

দোয়া কুনুত, সুরা নাস ও ফালাক প্রসঙ্গ

হযরত ইবনে মাসউদের (রা.) মাসহাফে মোয়াজ্জ্যেতাইন (সুরা নাস ও ফালাক) অন্তর্ভূক্ত ছিলনা বলে বলা হয়। আর হযরত উবাই ইবনে কাআবের (রা.) মাসহাফে দোয়ায় কুনুত ছিল বলে বলা হয়। এ প্রসঙ্গে আল্লামা কিল্লানী বলেন, 'একক সূত্রে (খবরে ওয়াহেদ) বর্ণিত রেওযায়েত দ্বারা এরূপ তথ্য পরিবেশিত হয়েছে- যা কোরআনের মোতায়াতির (ব্যাপক সূত্রের) বর্ণনার মোকাবিলায় গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ সাহাবীগণ সুরা নাস ও ফালাক কোরআনের অন্তর্ভূক্ত বলে ব্যাপক সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আর দোয়ায় কুনুত কোরআন নয় বলে একমত হয়েছেন। কাজেই মোতাওয়াতির বর্ণনার বিপরীত একক সূত্রে বর্ণিত তথ্য গ্রহণযোগ্য হবেনা। তাই দোয়ায় কুনুত

কোরআন নয় এবং মোয়াজ্জেতাইনকে কোরআন বলে মানতে হবে। এ ব্যাপারে হযরত ইবনে মাসউদ ও ওবাই ইবনে কা'বের পক্ষ থেকে কোন প্রতিবাদ হয়েছে বলেও বর্ণিত হয়নি।'

কোরআন সম্পর্কে এরকম হযরত আবু মুসা আল আশারী (রা.) বর্ণিত হাদীসে যাতে সুরা তওবা সম একটি সুরায় শুধু এক আয়াত বাদে বাকী আয়াতগুলো ভুলে যাওয়া এবং হযরত আয়েশা কর্তৃক বর্ণিত সুরায় আহযাবের দু শত আয়াত হওয়ার যার তিয়াত্তরটি আয়াত গ্রহণীয় হওয়া একক সূত্রে বর্ণনা প্রসূত ও সবসম্মত মতামত বিরোধী, তাই গ্রহণীয় নয়।

কোরআন সম্পর্কে স্যার উলিয়াম মুর এর উক্তি প্রনিধানযোগ্য। "কোরআনের সংগ্রহকারীরা কোরআনের কোন অংশ বাক্য কিংবা শব্দ বাদ দিয়েছে এমন কখনো শুনা যায়নি। কোন বাক্যেরও সন্ধান পাওয়া যায় না যা বাহির হতে কোরআনে প্রবেশ করেছে। যদি এমন হত তাহলে অবশ্যই হাদীসের কিতাবে উহার উল্লেখ থাকত, যা থেকে কোন বিষয় বাদ পড়েনি।"

পরবর্তী যুগের আবৃতি সহজতর করণের প্রচেষ্টা

হযরত উসমান কর্তৃক পাণ্ডুলিপি তৈরীর কাজ চূড়ান্ত হওয়ার পর উম্মতে মোহাম্মদী তাঁর অনুসৃত লিখন পদ্ধতি ব্যতিত অন্য কোন পদ্ধতিতে কোরআন লিপিবদ্ধকরণ অশুদ্ধ বলে ঐক্যমতে পৌঁছে। কিন্তু রাজ্য বিস্তৃতি ও দলে দলে বিপুল সংখ্যক অনারবের ইসলাম গ্রহণ এবং তাদের কোরআন শিক্ষার প্রয়োজনে উসমানী- অনুলিপিতে নোকতা, যের, যবর, পেশ প্রভৃতি যোতি চিহ্ন সংযোজন করার প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভূত হয়। হযরত আলীর নির্দেশে নোকতার প্রচলন আবুল আসওয়াদ দুয়লী (রা.) শুরু করেন। প্রচলিত অভিমত হরকত বা যের-যবর-পেশ এর প্রবর্তক হচ্ছে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ- যিনি বনি উমাইয়া যুগে ইরাকের গভর্ণর ছিলেন। কোরআনের আবৃতি ও শিক্ষার সুবিধার্থে বিভিন্ন সময় মানযিল, পারা, রুকু, আখমাস ও আশার প্রবর্তিত হয় যা পরবর্তীকালের উদ্ভাবনা।

ইসলামের আদিকালের পাণ্ডুলিপি

ইসলামের প্রাথমিক যুগের লিপিবদ্ধকৃত কিছু সংখ্যক পাণ্ডুলিপি আবিস্কৃত হয়েছে যেগুলো পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের লাইব্রেরীতে মজুদ আছে। হযরত উসমান কর্তৃক লিখিত পাণ্ডুলিপিখানি বর্তমানে মস্কোতে রয়েছে। এ পাণ্ডুলিপি খানি আবৃতিকালীন সময় তিনি বিদ্রোহীদের হাতে নিহত হন। হযরত উসমানের সময়কালীন সরকারীভাবে অনুমোদিত সাতখানা

পান্ডুলিপির একখানা বর্তমানে ফ্রান্সে একখানা মিশরের খাদুরিয়া লাইব্রেরীতে একখানা আজহার বিশ্ববিদ্যালয় কুতুবখানায় এবং খলিফা উসমানের নিকট রক্ষিত মাসহাফে ইমাম পান্ডুলিপিটি বর্তমানে কনস্টান্টিপোল শহরে রক্ষিত আছে। হযরত আলী (রা.) কর্তৃক তৈরী পাঁচখানা পান্ডুলিপির মধ্যে একখানা মাসহাদে, দুখানা কনস্টান্টিপোলে ও একখানা বর্তমানে কায়রোর জামে হোসাইনে রক্ষিত আছে। তাঁর তৈরী আর একখানা পান্ডুলিপি দিল্লির জামেয়ায় মিল্লিয়াতে মওজুদ আছে। হযরত ইমাম হোসেন সংকলিত একখানা পান্ডুলিপি ও জামেয়ায় মিল্লিয়ায় এবং অপর একখানা দেওবন্দ মাদ্রাসার কুতুব খানায় মওজুদ আছে।

কোরআনের হস্ত লিখন ও মুদ্রণ

ইতিপূর্বে আমরা আলোচনা করেছি রাসুলে খোদা ওহী প্রাপ্তির সাথে সাথে তা তাঁর কাতেবে ওহী দ্বারা লিখিয়ে নিতেন ও কণ্ঠস্থ করার জন্য সবাইকে আবৃতি করে শুনাতেন। কোরআন লিপিবদ্ধ করার আয়োজন রাসুল নিজ উদ্যোগে নিতেন এবং বিয়াল্লিশ জন কাতেবে ওহী মনোনীত ছিল যাদের কেউ না কেউ সবসময় রাসুলের দরবারে একাজের জন্য হাজির থাকতেন। এমনকি সফরের সময় ও ওহী লিপিবদ্ধ করার জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগে রাখতেন এবং কাতেবে ওহী সফর সাথী হতেন। হযরত আবু বকরের খিলাফতকালীন সময় কোরআনের সংকলনের পর তা থেকে অসংখ্য পান্ডুলিপি তৈরী করা হয়। ইমাম ইবনে হাজম বলেন, প্রথম খলিফার সময় আরব ভূখন্ডে এমন কোন শহর ছিলনা যেখানে লোকদের কাছে পর্যাপ্ত পরিমাণ অনুলিপি ছিলনা। হযরত উসমানের যুগে কোরেশদের নির্ধারিত উপভাষায় কোরআন গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করে তার সাত কপি সরকারী উদ্যোগে বিভিন্ন অঞ্চলে পাঠানো হয়।

রাসুলে খোদার নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় কোরআন মজিদ লিপিবদ্ধ করণের যে কর্মতৎপরতা শুরু হয় তা পরবর্তীকালে এক ধর্মীয় আন্দোলনে পরিনত হয় ও কোরআন মজীদের লিখন পদ্ধতিতে এক বৈপ্লবিক শিল্প সৌকর্য্য প্রদান করে যা পরবর্তীকালে কেলিগ্রাফী (Coligraphy) বা আরবী হস্ত লিখন শিল্পে পরিণত হয়। চতুর্থ খলিফা হযরত আলী (রা.) এর প্রথম উদ্যোক্তা ও উদ্ভাবক হিসেবে প্রসিদ্ধ। হিজরী প্রথম শতাব্দীর পর আরবী লিখন পদ্ধতি বা কেলিগ্রাফীর শিল্প সম্মত সৌকর্য্যের উন্নতিসহ আরবী লিখন পদ্ধতিতে তিনটি প্রধান শাখার জন্ম নেয়। প্রাথমিক পদ্ধতিটি কুফি (Kufi) পদ্ধতি হিসেবে

পরিচিত যা কুফা শহরের নাম অনুসারে প্রসিদ্ধি লাভ করে। কুফা হযরত আলীর রাজধানী। হিজরী দশম শতাব্দীতে নসখ (Nashk) পদ্ধতি কোরআনের প্রতিলিপি করণে ব্যবহৃত হয়। এ পদ্ধতি খুব সুন্দর সৌকর্যপূর্ণ যা তুর্কী হস্ত লিপিকারদের হাতে আরও মনোমুগ্ধকর হয়। তৃতীয় পদ্ধতিটি নাসতালিক নামে পরিচিত যা ইরানী হস্ত লিপিকারদের আবিস্কার। মুসলমান শিল্পীদের শিল্পচর্চায় বিধি নিষেধ আরোপিত থাকায় তাদের শৈল্পিক চাহিদা ও আকুতি মেটানোর জন্য হস্ত লিখনকে তারা তাদের শিল্পের মাধ্যম বা সৌন্দর্য প্রকাশের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে। এবং তোগরা পদ্ধতির লিখনকে শিল্পের বাহন হিসেবে গণ্য করা হয়। যা পাথরে খোদাইতে বা লিখনে ব্যাপক ব্যবহৃত হয়।

ইসলামের আবির্ভাবের সমসাময়িককালে চীনে মুদ্রণ যন্ত্র আবিস্কৃত হয়। যদিও ইসলামের প্রথম যুগ থেকে মুসলিম বিশ্বের সাথে চীনের যোগাযোগ ছিল তবুও মুসলিম বিশ্বে মুদ্রণ যন্ত্রকে গ্রহণ করে তা তাদের দেশে প্রচলন করেনি। কোরআন মজিদ বা অন্য গ্রন্থ মুদ্রণের প্রচেষ্টা নেওয়া হয়নি। মুসলমানগণ মুদ্রণ যন্ত্র দ্বারা কোরআন মুদ্রিত করাকে বিদাআত বা নব উদ্ভাবন হিসেবে গণ্য করে। এ নব উদ্ভাবনের প্রতি তাদের অনীহা দেখা যায়। মুদ্রণ যন্ত্রের জন্য আরবী অক্ষর ও যৌতি চিহ্নগুলোর প্রস্তুত ও তাদের ভঙ্গুঁরতার দরুন ভুল মুদ্রণ হওয়ার সম্ভাবনা ও সঠিকভাবে মুদ্রিত হওয়া সম্বন্ধে সন্দেহ এ কাজে মুসলমানদেরকে নিরুৎসাহিত করে। তা ছাড়া বিপুল সংখ্যক হস্তলিপিকার কোরআনের প্রতিলিপি করণকে তাদের পেশা হিসেবে নিয়ে ছিল। কোরআনের মুদ্রণ ব্যবস্থা প্রচলনের দরুণ তাদের জীবন জীবিকায় আঘাত আসা স্বাভাবিক। তাই তাদের পক্ষ থেকে প্রতিরোধ আসাও কোন প্রকার অস্বাভাবিক ব্যাপার ছিলনা। হাতে লিখা কোরআন মুসলিম সমাজের ধর্মীয় অনুভূতির সাথে যুক্ত হয়ে গিয়েছিল। নতুন পদ্ধতি তাদের আবেগ পরিপন্থি হওয়ায় এ পদ্ধতি গ্রহণে তাদের ছিল অনীহা। এছাড়া মুদ্রণ কাজে ব্যবহৃত কালীও ব্রাসে ব্যবহৃত উপাদান সম্বন্ধে সন্দেহ ও তাদের এ নব পদ্ধতি গ্রহণে বিরত রাখে।

কোরআনের প্রথম মুদ্রণ জার্মানীতে এ. হেলম্যান ১৬৯৪ খৃ: কৃতিত্বের সাথে সম্পন্ন করেন। আরবী ভাষায় টাইটেল পেজ ছাড়া তাতে একটি ল্যাটিন টাইটেল পেজ ছিল। এর কপি ব্রিটিশ লাইব্রেরীতে রক্ষিত আছে। কিন্তু গোষ্ঠাভাস ফ্লুজেল কর্তৃক মুদ্রিত কোরআন সমধিক প্রসিদ্ধ যা ১৮৩৪ খৃ:

লিপজিগে মুদ্রিত হয় ও পরবর্তীকালে ১৮৪১, ১৮৭০, ১৮৮১, ১৮৯৩ সালে পুণঃ মুদ্রিত হয়। যদিও মনে করা হয় ভেনিসে খৃষ্টিয় ১৫০৯-১৫১৮ সালে পাগানিনি-ডা-পাগানিনি কোরআন মুদ্রণ করেন। কিন্তু তার এ মুদ্রণে পোপের অনুমোদন না থাকায় পুরো এডিশন পুড়িয়ে ফেলা হয় পোপ ক্লেসেন্ট এর আদেশে। এছাড়া রাশিয়ার সম্রাজ্ঞী কেথারীন এর রাজত্বকালে ১৭৮৭ খৃঃ রাশিয়ায় কোরআন মুদ্রিত হয়।

তাফসীর শাস্ত্র

তাফসীর ইসলামী জ্ঞানের সে শাখাকে বুঝায় যার মাধ্যমে কোরআন মজীদের অর্থ সমূহ বিস্তারিত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ সহকারে বর্ণনা করা হয়েছে এবং কোরআনের জ্ঞান রহস্যকে তুলে ধরা হয়েছে। কোরআনের বেশ কিছু শব্দ বিভিন্ন অর্থবোধক এবং সবগুলো অর্থই গ্রহণীয়। যেমন 'জাকাত' শব্দটি যার মূল অর্থ বর্ধিত হওয়া। কিন্তু ইসলামী পরিভাষায় ইহার অর্থ বাধ্যতামূলক দান। আবার দেখা যায় কোরআন মজীদে বর্ণিত বেশ কিছু বাক্য বা শব্দ দ্ব্যর্থবোধক ও অলংকারিক। যেমন যে সব আয়াতে আল্লাহ তায়ালার শরীর হাত মুখ ব্যক্ত করেছে অথচ আল্লাহ নিরাকার। তাই এ সমস্ত আয়াতের রাসুলে খোদা প্রদত্ত ব্যাখ্যা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এছাড়া বেশ কিছু আয়াতে কোরআন, কোন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বা উদ্ভুত কোন সমস্যার সমাধানকল্পে নাযিল হয়েছে সে সব ঘটনার প্রেক্ষিত বা উদ্ভুত সমস্যার বর্ণনা তাফসীরে সংরক্ষিত হয়েছে, যাতে করে পরবর্তী প্রজন্মের জন্য কোরআনের সে সমস্ত আয়াতের অধ্যয়ন ও তাৎপর্য অনুধাবন সহজতর হয়। সাহাবায়ে কেরামদের যখন কোন আয়াতের মর্মার্থ বুঝতে জটিলতা দেখা দিত, তাঁরা ব্যাখ্যার জন্য রাসুলে খোদার স্মরণাপন্ন হতেন এবং সন্তোষজনক উত্তর পেয়ে যেতেন। রাসুলে খোদার ইন্তেকালের পর তাঁর প্রদত্ত ব্যাখ্যা নির্ভুলভাবে সংরক্ষণের জন্য ইলমে তাফসীরের উদ্ভব হয়। ইলমে তাফসীরের মূল উৎস ছয়টি। যথা–

কোরআন মজীদঃ কোরআন মজীদে এমন বহুদৃষ্টান্ত আছে যেখানে কোন আয়াতের কোন কথা অস্পষ্ট, সংক্ষিপ্ত বা ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। কিন্তু অপর আয়াতে তা সুস্পষ্ট করে ব্যাখ্যা ও বর্ণনা করা হয়েছে। তাই মোফাসসিরিনগণ কোন আয়াতের ব্যাখ্যা করার সময় লক্ষ রাখতেন কোরআনের অপর কোন্ আয়াতে সংশ্লিষ্ট আয়াতের ব্যাখ্যা রয়েছে কিনা।

হাদীসঃ মহানবীর গোটা জীবনই ছিল কোরআন মজীদের বক্তব্য ও জীবন্ত ব্যাখ্যা। তাঁর বক্তব্য ও কার্যাবলীই হচ্ছে হাদীসে রাসুল। তাই

মোফাসসিরগণ কোরআন মজিদ অনুধাবনের জন্য দ্বিতীয় উৎস হিসেবে হাদীসে রাসুলকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। বিভিন্ন হাদীসের আলোকেই আল- কোরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা নির্ধারণ করেছেন।

সাহাবীদের বক্তব্য: মহানবী থেকে সরাসরি কোরআনের শিক্ষা গ্রহণ ছাড়া সাহাবায়ে কেরামগণ ও ওহী নাযিলের প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন। কোরআন নাযিলের গোটা পরিবেশ এবং পটভূমি প্রত্যক্ষভাবে তাঁদের দেখা ছিল। তাই কোরআনের আয়াতের ব্যাখ্যা বা তাফসীরের বেলায় তাদের বক্তব্য হাদীসের ব্যাখ্যার অনুপস্থিতিতে নির্ভরযোগ্য ও প্রমাণ্য সূত্র হিসেবে গণ্য করা হয়।

তাবেঈনদের বক্তব্য: সাহাবাদের পরবর্তী মর্যাদার অধিকারী হল তাবেঈনগণ। এজন্য তাবেঈনদের বক্তব্য কোরআনের ব্যাখ্যার জন্য বিশেষ গুরুত্বের অধিকারী।

আরবী সাহিত্য: কোরআন মজিদ আরবী ভাষায় অবতীর্ণ হওয়ার দরুণ কোরআনের আয়াতের ব্যাখ্যায় আরবী ভাষাজ্ঞান ও সাহিত্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। কোন আয়াতের ব্যাখ্যায় কোন প্রকার মতদ্বৈততা হলে গ্রহণযোগ্য মত নির্ধারণের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের বেলায় আরবী সাহিত্য থেকে সাহায্য নিতে হয়।

চিন্তা, গবেষণা ও উদ্ভাবনা: কোরআন তাফসীরের সর্বশেষ উৎস হলো চিন্তা- গবেষণা ও উদ্ভাবনী শক্তি। মোফাসসিরিনে কেরামগণ নিজ নিজ উদ্ভাবনী প্রতিভা ও গবেষণার ফলাফল তাঁদের তাফসীর সমূহে লিখে গেছেন। তবে এসব ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ তখনই গ্রহণযোগ্য যখন সে ব্যাখ্যা ইতিপূর্বে উল্লিখিত পাঁচটি উৎসের সাথে সাংঘর্ষিক নয়।

এছাড়া বেশ কিছু ইসরাইলী বর্ণনা তাফসীর গ্রন্থে উদৃত হয়েছে। মুফাসসীরগণ কোরআনে উল্লিখিত ঘটনা আলোচনা প্রসঙ্গে আহলে কিতাব সূত্র থেকে প্রাপ্ত বর্ণনাগুলোও উল্লেখ করতেন। যে সব সাহাবী ও তাবেঈন ইসলাম গ্রহণ যুগের আগে আহলে কিতাব সম্প্রদায়ভূক্ত ছিলেন, তাদের আগেকার জ্ঞান সূত্র থেকে প্রধানতঃ এসব বর্ণনা ইলমে তাফসীরে অনুপ্রবেশ করে। এসব বর্ণনাকে মুফাসসীরিনগণ ইসরাইলিয়াত নামে চিহ্নিত করেছেন। কোরআন সুন্নাহ বিরোধী এসব বক্তব্য গ্রহণযোগ্য নয়। যেখানে কোরআন সুন্নাহ নীরব সে সব বক্তব্য সম্বন্ধে মহানবীর শিক্ষা হল নীরব থাকা। সত্য মিথ্যা মন্তব্য না করা।

কোরআনের কয়েকটি তাফসীর গ্রন্থের নাম দেওয়া হল–

তাফসীর তাবারী: আবু জাফর মোহাম্মদ বিন জারীর আল তাবারী (মৃত ৯২৩ খৃ:) দ্বারা লিখিত। তাঁর তাফসীরের নাম জামেউল বায়ান ফি তাফসীরুল কোরআন।

আল কাসসাফ: আবু আল কশিম মোহম্মদ বিন ওমর আল জামাখশারী (মৃত ১১৪৪ খৃ:) দ্বারা লিখিত। তিনি মোতাজিলা মতাবলম্বী এবং এ মতবাদ অনুসরণ করে এ কিতাব লিখিছেন যা আল-কাসসাফ আন হাকায়েক আল তানযীল সংক্ষেপে আল কাশশাফ নামে প্রসিদ্ধ।

আল-বায়জাবী: আবদুল্লাহ বিন মোহাম্মদ আল বায়জাবী (মৃত ১২৮৬ খৃ:) দ্বারা লিখিত। যার পূর্ণ নাম আনওয়ার আল তানযীল ওয়া আছরার আল তা'বীল সংক্ষেপে তাফসীরে বায়জাবী। তাঁর লিখিত গ্রন্থখানি আল্লামা জামাখশারী লিখিত তাফসীরের সংক্ষিপ্ত সংস্কারকৃত সংস্করণ। তাই সুন্নী মুসলিমদের নিকট গ্রহণযোগ্য।

তাফসীরে রাজী: মোহাম্মদ বিন ওমর আল রাজী (মৃত ১২০৯ খৃ:) মাফাতীহে আল গায়েব নামক তাফসীর লিখেন যা আল- তাফসীর আল কবীর নামেও প্রসিদ্ধ। ইমাম রাজী ইলমে কালামের একজন শীর্ষ স্থানীয় ইমাম। তাই তাঁর এ গ্রন্থে যুক্তি, কালাম শাস্ত্র মতবাদ খন্ডনের প্রতি অধিক গুরুত্ব পায় এবং বাতিল পন্থিদের বিভিন্ন মতবাদ খন্ডনের প্রতি অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বস্তুত: কোরআনের মমার্থ উদঘাটনের দিক থেকে এটি একটি অতুলনীয় গ্রন্থ।

তাফসীরে আলকুমী: আলী বিন ইব্রাহিম আল কুমী একজন শিয়া মোফাসসির তাঁর লিখিত গ্রন্থের নাম তাফসীর আল কুমী যা তৃতীয় হিজরীর শেষ ভাগে প্রকাশিত হয়। এ তাফসীর আল কুমী থেকে বেশীরভাগ শিয়া মতবাদ গৃহীত হয়।

তাফসীরে মোল্লা আল কাশী: মোহাম্মদ বিন আল শাহ মোরতাজা বিন আল শাহ সাধারণভাবে মোল্লা মোহসীন আল কাশী নামে পরিচিত। তিনি একজন কট্টর শিয়া। তাঁর তাফসীরের নাম আল শাফী ফি তাফসীর আল কোরআন আল করীম ১০৭৫ সালে সম্পন্ন হয়। এ গ্রন্থ শিয়া মতবাদের উপর ভিত্তি করে রচিত। এ গ্রন্থে সাহাবীগণ, বিশেষ করে প্রথম তিন খলিফা বেশ অশালীনভাবে আলোচিত হন।

আহকামুল কোরআন লিল জাসসাস: ইমাম আবু বকর জাসসাস রাজী (মৃত ২৭০ হি:) কর্তৃক লিখিত তাফসীরখানি হানাফী মতাদর্শের ভিত্তিতে

লিখিত। এ তাফসীর গ্রন্থের বিষয়বস্তু হলো কোরআন মজিদ থেকে বিভিন্ন মাছআলা-মাছায়েল উদ্ভাবন। তিনি ধারাবাহিকভাবে আয়াত সমূহের ব্যাখ্যার বদলে কেবল ঐ সকল আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন, যে গুলো ব্যবহারিক নিয়ম বিধি সম্বলিত।

তাফসীর আদদুরুল মানসুরঃ এ তাফসীরের লেখক আল্লামা জালালুদ্দিন সুয়ুতী (মৃত ৯১০)! এর নাম "আলদররুল মানসুর ফিত্তাফসীর বিল মানসুর।" এ গ্রন্থে লেখক নিজের সাধ্যানুযায়ী কোরআনের ব্যাখ্যা সম্বলিত সকল হাদীস এক জায়গায় সন্নিবেশিত করার চেষ্টা করেছেন।

রুহুলমাআনীঃ পুরোনাম রুহুল মায়ানী, ফী তাফসীরিল কোরআনিল আযীম ওয়াসসাবায়ে মাসানী বাগদাদের পতনকালের অব্যবহিত আগে আল্লামা মাহমুদ আলসী এ তাফসীরখানা লিখেন। লেখক এ গ্রন্থটিকে সর্বাঙ্গীন ও ব্যাপক ভিত্তিক করার জন্যে যথাসম্ভব চেষ্টা করেছেন। ভাষা, সাহিত্য, ব্যাকরণ, অলংকার ছাড়াও এতে ইসলামী বিধি-বিধান, আকায়েদ বা বিশ্বাস, কালাম শাস্ত্র, দর্শন, জ্যোতিবিজ্ঞান, তাসাউফ এবং সংশ্লিষ্ট হাদীস সম্পর্কে বিষদ আলোচনা করেছেন। বিশ্বের প্রায় ১০৫টি ভাষায় কোরআন অনুদিত হয়েছে।

কোরআনের মোজেজা- আধুনিক বিজ্ঞান দ্বারা পরীক্ষিত

আল্লাহ প্রদত্ত রাসুলে খোদার সর্বশ্রেষ্ঠ মোজেজা হচ্ছে আল-কোরআন। নবীদের অলৌকিক কর্মকান্ডকে মোজেজা বলা হয়। যা সাধারণ মানুষের অসাধ্য। তাই আল্লাহ তায়ালা চ্যালেঞ্জ করে বলেছেন-

"বল যদি এ কোরআনের অনুরূপ কোরআন আনয়নের জন্য মানুষ ও জিন সমবেত হয় এবং পরস্পরের সহযোগী হয় তবুও তারা এর অনুরূপ আনয়ন করতে পারবেনা।"

আধুনিক কম্পিউটার, বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব সৃষ্টি। কম্পিউটার গবেষণা দ্বারা কোরআনের অলৌকিকতা প্রমাণিত সত্য। কোরআনে সুরায়ে মোদসছীরের ত্রিশতম আয়াতে ১৯ অংকটি বর্ণিত হয়েছে যা তাৎপর্যপূর্ণ। 'আলাইহে তিসআতা আসারা' অর্থাৎ- ইহার উপর উনিশ। সুরায়ে মোদাচ্ছিরে আল্লাহ প্রদত্ত চতুর্থ ওহী। ত্রিশতম আয়াতটি বর্ণনার পূর্বে আল্লাহ তায়ালা অবিশ্বাসীদের কোরআন মজিদকে আল্লাহর ওহী হিসেবে অস্বীকার করার পরিনতি ও আখেরাতে কঠোর শাস্তির ভয় দেখিয়েছেন। (২৬-২৯ নম্বর

আয়াত সমূহ দ্রষ্টব্য)। তারপর কোরআনের ওহী হওয়ার সত্যতার মাপকাঠি হিসেবে তাৎপর্যপূর্ণ উনিশ অংক উল্লেখ করেছেন। বর্তমান যুগে কম্পিউটারের বদৌলতে আল্লাহ বর্ণিত উনিশ অংকের তাৎপর্য কিছুটা অনুধাবন সম্ভব হয়েছে।

আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি সুরায়ে মোদ্দাচ্ছির আল্লাহ প্রেরিত চতুর্থ ওহী যা ইতিপূর্বে তৃতীয় ওহীতে প্রদত্ত অঙ্গিকারের সফল বাস্তবায়ন। তৃতীয় ওহীতে প্রদত্ত পঞ্চম আয়াতে আল্লাহ বলেছেন- "শীঘ্রই আমরা (আল্লাহ) নিশ্চয়ই তোমার নিকট ভারী ও গুরুত্বপূর্ণ ওহী পাঠাব" আল্লাহ তাঁর ওয়াদা পূরণের জন্য সুরায়ে মোদাচ্ছির এর ত্রিশটি আয়াত পাঠালেন যার শেষ আয়াতে 'উনিশ' এর অংক বর্ণিত হয়েছে। এর পরই দেখা যায় 'উনিশ' অংকের কার্যকারীতা। আমরা দেখি হযরত জিবরাইল রাসুলে খোদাকে প্রথম ওহী সুরায়ে 'আলাক' এর পাঁচ আয়াতের পর শেষ চৌদ্দটি আয়াত শিক্ষা দিলেন। তাতে এ সুরায় ১৯টি আয়াত হল এবং সুরাটিকে ৯৬ তম সুরা হিসেবে নির্ধারিত করা হল যা পেছন থেকে গুননে ১১৪টি সুরার মাঝে উনিশতম।

কোরআন মজিদে সর্বমোট ১১৪টি সুরা বর্ণিত হয়েছে যা ১৯ দ্বারা বিভাজ্য। কোরআনে একটি সুরা সুরায়ে তওবা ছাড়া প্রত্যেকটি সুরার প্রারম্ভে বিসমিল্লাহির রাহমানের রাহিম বর্ণিত। তাহলে ১১৩টি সুরায় এ আয়াত পাওয়া গেল কিন্তু তা উনিশ দিয়ে বিভাজ্য নয়? তাহলে উপায় কি? উপায় আল্লাহ নিজেই বের করে দিলেন সুরায়ে 'নামলে' এ বিসমিল্লাহ আয়াতটি রানী বিলকিস কর্তৃক আবৃত করে ১১৪ বার আবৃত বা বর্ণিত হওয়ার সুযোগ করে দিলেন যা ১৯ দ্বারা বিভাজ্য। এছাড়া বিসমিল্লাহ বা তাসমিয়াহ আয়াতটিতে ১৯টি অক্ষর আছে এবং চারটি শব্দ আছে। যথাঃ ইসম, আল্লাহ, আররাহমান, আররাহিম যা সব সুরাগুলোতে যতবার ব্যবহৃত হয়েছে সে সংখ্যা ১৯ দিয়ে বিভাজ্য।

১৯ বার	(১৯ × ১)	(ইসম)
২৬৯৮ বার	(১৯ × ১৪২)	(আল্লাহ)
৫৭ বার	(১৯ × ৩)	(আররাহমান)
১১৪ বার	(১৯ × ৬)	(আররাহিম)

কোরআনের ২৯টি সুরার শুরুতে ১৪টি বিভিন্ন বর্ণ ১৪টি ভিন্ন ভিন্ন বিন্যাসে ব্যবহৃত হয়েছে এদের যোগফল ২৯+১৪+১৪=৫৭ যা উনিশ দিয়ে বিভাজ্য

(১৯×৩)= ৫৭। এ বিষয় বিস্তারিত জানার জন্য তারিক সিদ্দিকী ও আহমদ দিদাত কর্তৃক লিখিত কম্পিউটারে কোরআন নামক পুস্তকটি পড়ুন। কুরআন মজিদে কিছু শব্দ যা বিপরীতমূখী অর্থব্যপক বা সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যবহৃত হয়েছে। এ সব শব্দের পরিসংখ্যানে এক ব্যাপক মিল পরিলক্ষিত হয়। এ বিষয়ে জনাব মোহাম্মদ আলী কর্তৃত লিখিত প্রবন্ধ যা দৈনিক ইনকিলাব ২০০৩ সালের ১১ ডিসেম্বও প্রকাশিত হয়। যা ড. তারেক আল সুইদানে গবেষণা হয়। তিনি ই-মেইলে LLTP//w w w ummah net এর মাধ্যমে যা প্রকাশ করেছেন তা সংক্ষিপ্তাকারে প্রকাশ করা হল–

ক. কুরআন মজিদে রেজাল (পুরুষ) শব্দটি ২৪ বার উল্লেখ করা হয়েছে। এর বিপরীত শব্দ ইসরাআ (স্ত্রী) শব্দটিও ২৪ বার উল্লেখ করা হয়েছে।

খ. কুরআন মজিদে দুনিয়া শব্দটি ১১৫ বার উল্লেখ করা হয়েছে এবং আখিরাত শব্দটিও ১১৫বার উল্লেখ করা হয়েছে।

গ. মহান আল্লাহ তায়ালা জীবনের সাথে মৃত্যুর প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন। তাই আল হায়াত শব্দটি ১৪৫ বার উল্লেখ করা হয়েছে এবং আল মাউত শব্দটিও ১৪৫ বার উল্লেখ করা হয়েছে।

ঘ. কুরআন মজিদে আল মালাঈকা শব্দটি ৮৮ বার উল্লেখ করা হয়েছে এবং আশ শায়াতিন শব্দটিও ৮৮ বার উল্লেখ করা হয়েছে।

ঙ. কুরআন মজিদে বলা হয়েছে যে, এমন কোন জাতি নেই যার কাছে আমি নবী-রাসুল বা বার্তাবাহক পাঠাইনি। সে সুত্রে উম্মাহ শব্দটি ৫০ বার উল্লেখ করা হয়েছে আর রাসুল শব্দটিও ৫০ বার উল্লেখ করা হয়েছে।

চ. ইবলিস শব্দটি কুরআনে ব্যবহৃত হয়েছে ১১ বার।

ছ. মুসলিম ও জিহাদ একে অপরের পরিপুরক: তাই মুসলিম শব্দটি কুরআনে উল্লেখ হয়েছে ৪১ বার আর জিহাদ শব্দটিও উল্লেখ হয়েছে ৪১ বার।

জ. বার মাসে এক বছর, তাই কুরআনে আল শাহর শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে ১২ বার।

ঝ. ৩৬৫দিনে এক বছর। তাই কুরআনে আল ইয়াওম বা দিবস শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে ৩৬৫ বার।

উপরে বর্ণিত শব্দগুলো কুরআনে ব্যবহৃত পরিসংখ্যানে কাকতালীয়ভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া কোরআন আল্লাহর বাণী হওয়ার প্রমান নয় কী?

কোরআন সম্পর্কিত কতিপয় স্মরণীয় সন- তারিখ ও পরিসংখ্যান

১) হিজরী ১০ সালে কোরআনের শেষ শুনানী সম্পন্ন হয়।

২) হিজরী ১১ সালের সফর মাসে কোরআন নাযিল সমাপ্ত হয়।

৩) হিজরী ১২ সালে প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর এর শাসনকালে প্রথম কোরআন সংকলিত হয়।

৪) হিজরী ১৫ সালে হযরত ওমরের খিলাফতকালে তারাবীহর নামাযে পূর্ণ কোরআন আবৃতির ব্যবস্থা করা হয়। তারাবীহর ২০ রাকাতের প্রতি রাকাতে ৩৩টি সুরা পড়া নির্ধারণ করা হয়।

৫) হিজরী ২০ সালে হযরত উসমানের খিলাফত যুগে কোরআনের সর্বসম্মতি ক্রমে গৃহীত চূড়ান্ত অনুমোদিত কপি লিপিবদ্ধ হয়।

৬) হযরত আলীর খেলাফতকালীন সময় অথবা তার কিছু পরে যৌতি চিহ্ন প্রবর্তিত হয়।

৭) হাজ্জাজি ইবনে ইউছুফ (ইরাকের গর্ভনর) এর নির্দেশে হিজরী ৭৫ সালে এবার চিহ্ন বা ছোট ছোট রেখা যৌতি চিহ্ন হিসেবে প্রবর্তিত হয় কোরআন আবৃতি সহজতর করার উদ্দেশ্যে।

৮) হিজরী ৭৫ সালে কোরআন তেলাওয়াত সহজতর করার জন্য ও কোরআন বোঝার জন্য ত্রিশ পারা এবং প্রত্যেক পারাকে রোবুউ, নিছফ এবং ছুলোসে বিভক্ত করা হয়।

কোরআন মজীদের সুরা সংখ্যা- ১১৪ (মক্কী-৯৩ টি, মাদানী-২১টি), আয়াত সংখ্যা- ৬৬৬৬টি, শব্দের সংখ্যা- ৮৬৪৩০টি, অক্ষর- ৩২২৬৭১। আলিফ- ৪৮৮৭৬, রা- ১১৭৯৩ তা- ১১০৯৫, ছা- ১২৭৬, জ্বীম- ৩২৭৩, হা- ৩৭৯৩, খা- ২৪১৬, দাল- ৫৬০২, যাল- ৪৬৭৭, রা-১১৭৯৩, যা-১৫৯০, সীন- ৫৮৯১, শীন-২২৫৩, চাদ্দ- ২০১২, দোয়াদ- ১২০৭, ত্বা- ১২৭৭, যা- ৮৪৬, আইন- ৯২২০, গাইন- ২২০৮, ফা- ৮৪৯৯, কাফ-৯৫০০, ক্বাফ- ৬৮১৩, লাম- ৩০৪৩২, মীম- ৩৬৫৬৫, নুন- ৪৫১৯০, ওয়াও- ২৫৫৩৬, হা- ১৯০৭০, লাম আলিফ- ৩৭২০, হামজা- ৪১১৫, ইয়া- ৪৫৯১৯, হরকতের সংখ্যা-জবর-৫৩২২৩, জের- ৩৯৫৮২, পেশ- ৮৮০৪, নোকতা- ১০৫৬৮৪, মদ- ১৭৭১, তাশদীদ- ১২৭৪। আয়াতের শ্রেণী বিভাগ ওয়াদা ঃ

১০০০ অয়িদ বা ভীতি প্রদর্শন- ১০০০ আদেশ- ১০০০ নিষেধ- ১০০০, হালাল বিষয়ক- ২৫০, হারাম বিষয়ক- ২৫০, দৃষ্টান্ত- ১০০০, কেচ্ছাকাহিনী- ১০০০, আল্লাহ্ পাকের তাছবীহ্ সম্বন্ধীয়- ১০০, নামাজ সম্বন্ধীয়- ১৫০, আয়াত, বিবিধ আয়াত-৬৬।

আল কোরআনের প্রথম আয়াত রাসুলে খোদার প্রতি নাজিল হয়েছে রমজান মাসের ১৫ তারিখ রাত্রি বেলায় (অন্য মতে ২৭ রমজান) রাসুলের (দ.) জন্মের ৪১তম বর্ষে। প্রথম সুরাটি নাজিল হয় হেরা পর্ব্বতের গুহায় যা বর্তমানে জাবালে নূর নামে পরিচিত। সুরাটি হল সুরায়ে আলাক

اِقْرَاْبِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ- خَلَقَ الاِنْسَانَ مِنْ عَلَقَ----

প্রথমবার সর্বমোট পাঁচটি আয়াত নাজিল হয়েছিল। সর্বশেষ যে আয়াতটি নাজিল হল তা ছিল-

"আজ আমি তোমার নিকট আমার দ্বীন (জীবন ব্যবস্থা) সমাপ্ত করলাম।" (সুরা মায়েদা, আয়াত-৩)

কোরআনের বিধিবিধান সম্বলিত শেষ আয়াত হিসাবে এটিকে ধরা হয়, তবে কোরআনের সর্বশেষ আয়াতটি রাসুলে খোদার নিকট অবতীর্ণ হয়েছিল ৯ই জ্বিলহাজ্জ হিজরীর দশম সালে এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের ৬৩ বছর বয়সে। এ বর্ণনা হতে আমরা বুঝতে পারি যে, রাসুল (দ.) কর্তৃক আল্লাহ তায়ালার ওহী প্রাপ্তির মোট সময় ছিল ২২ বছর দুমাস ২২ দিন।

সর্বপ্রথম রাসুলে করিমের নিকট ওহী নিয়ে জিবরাইলের আগমন ও ওহী নাযিল হয় হিজরী পূর্ব ১৩ বছর ১৭ বা ২৭ই রমজান মোতাবেক ৬ আগস্ট ৬১০ খৃষ্টাব্দ। সর্ব প্রথম যে পাঁচটি আয়াত নাযিল হয় তা হল সুরায়ে আলাকের প্রথম পাঁচটি আয়াত। সর্বশেষ অবতীর্ণ আয়াত সুরায়ে বাকারায় ৩৭ রুকুর শেষ আয়াত। সর্বশেষ অবতীর্ণ সুরা- নসর। সর্বাপেক্ষা বড় সুরা- সুরায়ে বাকারা। সর্বাপেক্ষা ছোট সুরা- সুরায়ে কাওছার। সর্বাপেক্ষা বড় আয়াত- আয়াতে দাইয়ান অর্থাৎ- ৩৮ রুকু হতে শেষ পর্যন্ত। সবচেয়ে ছোট আয়াত মোদহাম্মাতানে, ওয়াল ফাজরে, ওয়াদ্দোহা। কোরআনে মোট ৫৪০ টি রুকু এবং ১৪টি মতান্তরে, ১৫টি সেজদা আছে।

কোরআন মজিদ রাসুলে খোদার নিকট আল্লাহ্ প্রদত্ত শ্রেষ্ঠ মোজেজা যা আমরা ইতিপূর্বে নানাভাবে প্রমাণ করতে প্রয়াসী হয়েছি। দীর্ঘ ২৩ বছর

ক্রমান্বয়ে আল্লাহর রাসুল জিবরাইল মারফত ওহী প্রাপ্ত হন যার সংরক্ষণের জন্য নিশ্চিদ্র ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। রাসুলে খোদা ওহী প্রাপ্তির সাথে সাথে লিখার ব্যবস্থা করতেন এবং সবাইকে হেফজ করার জন্য আবৃতি করে শুনাতেন। এসব ব্যবস্থা আল্লাহর অনুমোদনে করা হত। তাঁর ওফাতের পর হযরত আবু বকর ও উসমান কর্তৃক গ্রন্থাবদ্ধ করন, শ্রেণী বিন্যাস ব্যবস্থা এবং চুড়ান্ত অনুমোদিত পান্ডুলিপি প্রস্তুত করে তার প্রচার ব্যবস্থা গ্রহণ আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত অঙ্গিকারের ফলশ্রুতি।

"নিশ্চয়ই কোরআন আমি নাযিল করেছি। আর অবশ্যই উহার হেফাজতের দায়িত্ব আমারই।" - এ অঙ্গিকারের সফল বাস্তবায়ন।

খ্যাতনামা মনীষী জর্জ্জ শেল বলেন: "নিঃসন্দেহে কোরআন আরবী ভাষায় সর্বোত্তম এবং দুনিয়ার সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ। কোন মানুষের পক্ষেই এ ধরণের একখানা অলৌকিক গ্রন্থ রচনা করা কিছুতেই সম্ভব নয়। কোরআন মৃতকে জীবিত করার চেয়েও শ্রেষ্ঠ মোজেজা। একজন অশিক্ষিত লোক কি করে এ ধরণের ক্রটি মুক্ত ও নজির বিহীন বাক্যাবলী রচনা করতে পারে তা ভাবতেও আশ্চর্য লাগে।"

মনীষী ডা. মোরনেস ফ্রান্স বলেন: "সমস্ত আসমানী গ্রন্থ সমূহের মধ্যে কোরআন সর্বশ্রেষ্ঠ। মহান আল্লাহ তাঁর বিশেষ অনুগ্রহে মানব জাতির উদ্যেশ্যে এই সর্বোৎকৃষ্ট কিতাবখানা নাযিল করেছেন। মানুষের কল্যাণ সাধনে ইহা প্রাচীন গ্রীকদের দর্শনের চেয়েও অধিকতর ফলপ্রসু। কোরআনের প্রতিটি শব্দ হতেই আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্বের ঝংকার ধ্বনিত হয়।"

খ্যাতনামা পন্ডিত মি. বোরথস্মিথ বলেন: "মোহাম্মদের এ দাবি আমি সর্বন্তকরণে স্বীকার করি যে কোরআন মোহাম্মদের একটি সর্বকালীন শ্রেষ্ঠ মোজেজা।

দ্বিতীয় পর্ব

হাদীস সংকলনের ইতিহাস

প্রথম অধ্যায়

হাদীসে রাসুলুল্লাহ (সা.)

হাদীস শব্দটির প্রয়োগ অনুসারে ও আভিধানিক দৃষ্টিতে- এর অর্থ হলো কথা, সংবাদ, বাণী, খবর, বর্ণনা ইত্যাদি। রাসুল (সা.) তাঁর নবী জীবনে যা বলেছেন, করেছেন বা অন্যের কোন কথা বা কাজের প্রতি সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন তাকে সুন্নাহ বা হাদীস বলা হয়। হাদীস ব্যাপক অর্থে সাহাবা, তাবেয়ীন ও তাবে তাবেয়ীনদের কথা, কাজ ও সম্মতিকে বলা হয়, যা আছার নামে পরিচিত।

হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (সা.) আল্লাহর নবী ও রাসুল ছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি মানুষও ছিলেন। সুতরাং তাঁর নবী জীবনের কার্যাবলীকে দু'শ্রেণীতে ভাগ করা যায়।

১. যা তিনি নবী ও রাসুল পদের দায়িত্ব সম্পাদন উপলক্ষে করেছেন।

২. যা তিনি অপর মানুষের ন্যায় মানুষ হিসাবে করেছেন। যথা- খাওয়া পরা ও অন্যান্য সামাজিক, মানবিক ও পার্থিব কর্মকাণ্ড। প্রথম শ্রেণীর কার্যাবলী সমস্তই খোদায়ী নিয়ন্ত্রনাধীনে সম্পাদিত হত। দ্বিতীয় শ্রেণীর কার্যাবলী এ রকম নহে। প্রথম শ্রেণীর কার্যাবলীর মূল উৎস হল ওহী বা ওহী দ্বারা অনুপ্রানিত। কোরআনে মজীদে ইহা এভাবে বর্ণিত হয়েছে, 'তিনি নিজ থেকে কিছু বলেননি (নবীর দায়িত্ব পালনে)। নিশ্চয় ইহা তাঁর নিকট আল্লাহর তরফ থেকে প্রেরীত বার্তা।

হাদীসের গুরুত্ব

কোরআন মজিদে সাধারণভাবে ইসলাম ধর্মের আদেশ নিষেধ ও মুলনীতিগুলো ব্যক্ত করা হয়েছে। এমন আদেশ নিষেধের বিস্তারিত ব্যাখ্যা বা বিবরণ খুব কমই কোরআনে দেখা যায়। তবে প্রয়োজনীয় বিবরণ আমরা পাই রাসুল (সা.) এর নিকট। তিনি কোরআনের নির্দেশ ব্যক্তিগত জীবনে পালন করে দেখিয়েছেন কিভাবে কোরআন বর্ণিত আল্লাহর আদেশ বাস্তব

জীবনে কার্যকর করতে হবে। কখনো আবার মৌখিক ব্যাখ্যাও প্রদান করেছেন। তাঁর এ কার্যক্রম ও ব্যাখ্যাই পরবর্তীকালে হাদীস বা সুন্নাহ হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করে। আল্লাহ তায়ালা কোরআনে নামাজ কায়েম কর ও যাকাত প্রদান কর- আকিমুছছালাত ওয়া আতুয যাকাত বলেছেন- কখন এবং কিভাবে নামাজ কায়েম করতে হবে তা আমরা পাই রাসুল (সা.) এর কার্যক্রম থেকে। তেমনি কোরআন শুধু যাকাত প্রদানের নির্দেশ দিয়েছে এবং তাঁর বিস্তারিত নিয়ম কানুন ও আদায় পদ্ধতি পাই রাসুল (সা.) এর বিবরণ থেকে। কোরআন সক্ষম মুসলমানের জন্য হজ্জ্ব পালনের নির্দেশ দিয়েছে। হজ্জ্বব্রত পালনের নিয়ম ও আনুষ্ঠানিকতা আমরা পাই রাসুল (সা.) এর জীবন থেকে এবং এসব কিছুই বর্ণিত হয়েছে হাদীসে। কোরআন বর্ণিত আদেশ-নিষেধ, হুকুম-আহকাম সম্বন্ধে বিস্তারিত জ্ঞান লাভ এবং কার্যকরণ পদ্ধতি এবং ইসলামের মুলনীতি অনুধাবন ও পালনের একমাত্র বাহন হলো হাদীস। এ কারণে কোরআন মজীদে বারবার মুসলমানদের প্রতি নির্দেশ এসেছে "মান ইউতিয়্যর রাসূলা ফাক্বাদ আতা আল্লাহ" (সুরা- নিসা)। অর্থাৎ- "যে লোক রাসুলের (সা.) অনুসরণ করে সে আল্লাহর অনুগত।" অপর আয়াতে দেখতে পাই- "কুল ইন্ কুনতুম তুহিব্বুনাল্লাহা ফাত্তাবিয়ুনী ইউহবিব কুমুলল্লাহ।" (আলে ইমরান) -"হে রাসুল আপনি বলে দিন তোমরা যদি আল্লাহকে ভালবাস তা হলে আমাকে অনুসরণ কর। তাহলে তোমাদেরকে আল্লাহ ভালোবাসবেন।" রাসুল (সা.) এর জীবন সব মুসলমানদের জন্য এজন্য অনুসরণীয়; যেহেতু তিনি ছিলেন সবার জন্য উত্তম আদর্শ- 'লাক্বাদ কা' না লাকুম ফি রাসুলিল্লাহি উছওয়াতুন হাছানা' -নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসুলের জীবনে রয়েছে উত্তম ও উন্নত আদর্শ। কোরআন মজিদে বর্ণিত হয়েছে- "মা আতা কুমুর রাছুলু ফা খুজুহু ওয়ামা নাহা কুম আনহু ফানতাহু।" -"আর রাসুল (সা.) তোমাদের যা দেন (নির্দেশ) তাহা গ্রহণ কর এবং যা থেকে বিরত থাকতে বলেন তা থেকে বিরত থাক।" আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আরো বলেন "মা ইয়ানতিকু আনীল হাওয়া- ইন হুয়া ইল্লা ওয়াহয়্যুই ইউহা" অর্থাৎ- রাসুল (সা.) নিজের ইচ্ছামত কথা বলেন না, তিনি যাহা বলেন সবই ওহী যা আল্লাহর বাণী হিসেবে তাঁর নিকট অবতীর্ণ।

উপরে বর্ণিত আয়াতগুলো দ্বারা প্রমাণিত হলো হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (সা.) এর নবী জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপ অনুসরণীয়। আল্লাহর প্রতি আনুগত্য, রাসুল (সা.) এর অনুসরণের উপর নির্ভরশীল। আল্লাহ রাব্বুল

আলামীনের অনুগ্রহ প্রাপ্তির জন্য রাসূলের (সা.) আনুগত্য অপরিহার্য। কারণ রাসূল (সা.) কখনো নিজস্ব ইন্দ্রিয় দ্বারা পরিচালিত হননি। তাঁর কার্যকলাপ ও বক্তব্য অহী বা আল্লাহর বাণী প্রসুত। তাই আল্লাহর প্রেরিত পুরুষ মোহাম্মাদ মোস্তফা (সা.) এর কর্মকান্ডের অনুসরণের মাঝে নিহিত রয়েছে ইহকালের শান্তি ও পরকালের মুক্তি।

রাসূলে করিম (সা.) স্বয়ং তাঁর সাহাবীদেরকে সুন্নাহর অনুসরণের জন্য উদ্বুদ্ধ করেছেন। তাই আমরা দেখতে পাই রাসূল (সা.) যখন মোয়াজ বিন জাবাল (রা.) কে ইয়েমেনের গভর্নর নিযুক্ত করে পাঠালেন, তখন তিনি (রাসূল) মোয়াজকে জিজ্ঞাসা করেন কিসের উপর ভিত্তি করে তিনি (মোয়াজ) শাসন কার্য পরিচালনা করবেন? মোয়াজ (রা.) উত্তর দিলেন, কোরআনই হবে তাঁর শাসন পরিচালনার মাপকাঠি। তখন রাসূল (সা.) বললেন, 'কোন সমস্যার সমাধান যদি কোরআনে না পাও, তখন কি করবে? মোয়াজ (রা.) উত্তর দিলেন- তাহলে রাসূলের (সা.) সুন্নাহ হবে তাঁর পথ প্রদর্শক।' তাই আমরা দেখতে পাই সাহাবায়ে কেরাম তাঁর প্রতিটি কার্যকলাপ ও বক্তব্য বিশ্বস্ততার সাথে অনুধাবন ও অনুসরণের চেষ্টা করতেন। তাঁরা রাসূল (সা.) এর প্রতিদিনের কার্যকলাপ ও বক্তব্য একে অন্যকে পৌঁছাতেন; কেউ আবার লিখে রাখতে ভুল করতেন না। প্রতিদিন রাসূল (সা.) এর নতুন কোন আদেশ নিষেধ সম্বন্ধে নিজেদেরকে অবহিত রাখা তাঁদের প্রাত্যহিক অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল। এ কাজকে তাঁরা আল্লাহর নৈকট্য লাভের শ্রেষ্ঠতম উপায় গণ্য করতেন। তাই আমরা দেখতে পাই সাহাবাগণ একে অপরের সাথে মোলাকাতের সময় তাঁদের প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল রাসূল (সা.) এর প্রাত্যহিক কার্যকলাপ এবং যে কোন নতুন আদেশ নিষেধ সম্বন্ধে জানার অপার আকুতি।

রাসূলে করিম (সা.) এর জীবদ্দশায় তাঁর সাহাবাগণ যে কোন সমস্যার সমাধান ও আদেশ নিষেধের ব্যাপারে রাসূলে খোদার দরবারে উপস্থিত হয়ে জেনে নেয়া তাদের পক্ষে সহজ ছিল। কিন্তু তাঁর ইন্তেকালের পর তাঁর সহচরগণ এ সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন। পরবর্তীকালে ইসলামী রাষ্ট্রের বিস্তৃতি ও বিজিত এলাকার অগণিত মানুষের ইসলাম গ্রহণ এক নতুন পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। এ নও মুসলিমদের রাসূল (সা.) এর জীবন, আচরণ, কর্মতৎপরতা ও বাণী সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হওয়ার উদগ্র বাসনা তাঁদেরকে উদ্বুদ্ধ করেছিল রাসূল (সা.) এর সহচরদের শরণাপন্ন হওয়ার। এ থেকেই

রাসুলের হাদীসের সংগ্রহ ও সংকলন গুরুত্ব সহকারে আরম্ভ হয়। সময়ের অগ্রগতির সাথে সাথে প্রত্যক্ষ্যদর্শীদের বর্ণনা সুন্দরভাবে এবং দক্ষতার সাথে সংগ্রহ হতে থাকে। সাহাবাদের (রা.) পরবর্তী যুগে তাদের নিকট থেকে সংগ্রহকারী দ্বিতীয় স্তরের হাদীস বর্ণনাকারী সৃষ্টি হয়। এর পরবর্তীকালে তৃতীয় স্তরের হাদীস বর্ণনাকারীদের আমরা দেখতে পাই। এভাবে হাদীস বর্ণনাকারীদের এক সুশৃংখল গোষ্ঠির আবির্ভাব হয় এবং প্রতিটি হাদীসের পূর্বেকার বর্ণনাকারীদের নাম উল্লেখপূর্বক হাদীস বর্ণনা প্রচলিত হয় এবং পরবর্তীকালের বর্ণনাকারীদের এক অটুট সম্পর্ক ও সংযোগ স্থাপন করা হয়। সর্বস্তরের বর্ণনাকারীদের নাম উল্লেখের মাধ্যমে এসব বর্ণনাকারীদের বিশ্বস্ত তা, সততা, নির্ভরযোগ্যতা প্রতিটি হাদীসের গ্রহণযোগ্য হওয়ার মাপকাঠি হিসাবে গণ্য করা হয়।

রাসুল (সা.) এর হাদীস বর্ণনার পদ্ধতি পরবর্তীকালের মানুষদের দিয়েছিল হাদীস অধ্যায়নের অপূর্ব সুযোগ। রাসুল (সা.) এর প্রত্যেকটি কার্যক্রম ও বক্তব্য সম্বন্ধে অবহিত থাকার ব্যাকুলতা প্রায় সব সাহাবীদের মাঝে দেখতে পাই। হযরত ওমর (রা.) মদীনা থেকে বেশ খানিকটা দুরে বসবাস করতেন। তাই তাঁর পক্ষে প্রতিদিন রাসুলের (সা.) সান্নিধ্যে উপস্থিতি সম্ভবপর ছিল না। তাঁর অনুপস্থিত থাকাকালীন সময়ে রাসুল (সা.) এর কার্যকলাপ ও আলাপ, আচরণ সম্বন্ধে সম্যক অবহিত থাকার জন্য তিনি একজন আনসারের সাথে এক সমঝোতায় আসেন, যদ্দরুণ তাঁদের দুজনের একজন পালাক্রমে প্রতিদিন হাজির থাকার ব্যবস্থা করেন, যাতে করে রাসুল (সা.) এর প্রতিটি মুহুর্তের কার্যক্রম অবলোকন করে একে অপরকে অবহিত রাখতে পারেন। আমরা আরো দেখতে পাই হযরত আবু হোরায়রা (রা.) কিভাবে তিন বছর দরবারে রাসুলে উপস্থিত ছিলেন। তাঁর ব্যক্তিগত প্রয়োজন তাঁকে কখনো দরবারে রাসুলে (সা.) উপস্থিতি থেকে বিরত রাখতে পারেনি। তাঁর একনিষ্ঠতা তাঁকে রাসুলের (সা.) প্রতিটি বক্তব্য, আচরণ ও কার্যকলাপ শুনার ও স্বচক্ষে দেখার অপূর্ব সুযোগ দেয়। পরবর্তীকালে তাই তিনি সবচেয়ে বেশী হাদীস বর্ণনাকারী হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

রাসুল (সা.)এর সাহাবীগণের একনিষ্ঠ আগ্রহ, পরবর্তীকালের বর্ণনাকারীদের বিশ্বস্ততা ও নির্ভরযোগ্যতা এবং মুসলিম মনিষীদের হাদীস সংগ্রহ ও সংকলনের একাগ্রতা ও কঠোর পরিশ্রম হাদীস শাস্ত্রকে দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন করেছে। যেহেতু হাদীস কোরআনে বর্ণিত আল্লাহর আদেশ নিষেধ

অনুধাবন ও পালনের একমাত্র হাতিয়ার, তাই হাদীস শাস্ত্রবিদগণ অতি সতর্কতার সাথে হাদীসের যাচাই বাছাই করে প্রতিটি হাদীসের মূল্যায়ন করেছেন যার নজির ইতিহাসে অদ্বিতীয়। হাদীসের মূল্যায়নের প্রয়োজনে সৃষ্টি হয়েছে "আছমাউর রেজাল" নামে এক ভিন্নতর শাস্ত্র। এতে হাদীস বর্ণনাকারীদের প্রত্যেকের জীবনালোচনা ও সমালোচনা আমরা প্রত্যক্ষ করি।

আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি যে, কোরআন মজিদে ধর্মীয় অনুশাসন ও সামাজিক আইন সম্বন্ধে কেবলমাত্র সাধারণ ইংগিত করা হয়েছে, কিন্তু বিস্ত ারিত আলোচনা নেই। তাই ইসলামী আইনের বিস্তারিত বিবরণ, বিশ্লেষণ ও কার্যকারিতা সম্বন্ধে জানতে হলে আমাদেরকে হাদীস শাস্ত্রের সাহায্য নেয়া ছাড়া অন্যকোন গত্যন্তর নেই। নিম্নের আয়াতে তা এভাবে বর্ণিত হয়েছে- "ইন্না আনযালনা ইলাইকাজ্জিকরা লিতাবাইয়ানা লাহুম মা নাজ্জালা ইলাইহিম (নাহল)" অর্থ- আমি আপনার প্রতি কোরআন অবতীর্ণ করেছি যাতে আপনি তাদের প্রতি যাহা নাজিল হয়েছে তা তাদেরকে বিস্তারিতভাবে বুঝিয়ে দিন। এ ছাড়া হাদীস শাস্ত্র নিম্নে বর্ণিত বিষয়গুলো জানার ও অধ্যয়নের ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। হাদীস হচ্ছে প্রাক ইসলামী আরবদের সামাজিক, অর্থনৈতিক, নৈতিক অবস্থা এবং ইসলামের প্রাথমিক যুগ সম্বন্ধে জানার এক নির্ভরযোগ্য উৎস। ইসলামী আদর্শ ও আইনের ক্রমবিকাশের ধারা সম্বন্ধে অবগতির এক অনন্য উৎস। বিভিন্ন শ্রেণীর হাদীস বর্ণনাকারীদের মানসিক অবস্থা (তারা সঠিক হাদীস বর্ণনাকারী হউন বা মিথ্যা হাদীস প্রচারকারী হউন) এবং তৎকালীন মুসলিম সমাজে সৃষ্ট রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনগুলো সম্বন্ধে জানার এক উৎকৃষ্ট বাহন। তৎকালীন মুসলিম মনীষীদের গণতান্ত্রিক ধ্যান ধারণা বিভিন্ন মুসলিম দেশের সামাজিক সংগঠনের অবকাঠামোর প্রাথমিক ভিত্তিও জানা যায় হাদীস থেকে।

ওহীর প্রকারভেদ

সর্বশেষ প্রেরিত পুরুষ হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (সা.) এর নিকট আল্লাহ তা'য়ালার প্রেরিত বাণীকে ইসলামী চিন্তাবিদগণ দু'শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। এর একটি হচ্ছে ওহীয়ে মাতলু বা আবৃত বাণী যা হযরত জিবরাইল (আ.) রাসূলুল্লাহর নিকট আক্ষরিকভাবে আবৃতি করে শুনাতেন এবং রাসুল (সা.) তার জীবদ্দশায় প্রতি রমজানে তা আবার জীবরাঈল (আ.) কে পুণরাবৃত্তি করে শুনাতেন। কোরআন পাক এ প্রকার ওহী। আল্লাহর প্রেরিত বাণীর প্রতিটি শব্দ ও বাক্য হুবহু বর্ণিত হয়েছে কোরআন মজিদে এবং তা বহাল

রাখা ছিল রাসুল (দ.) এর অবশ্য কর্তব্য। তাই কোরআন হচ্ছে জিবরাঈল (আ.) এর মারফত প্রেরিত আল্লাহ তা'য়ালার আবৃত বাণী।

দ্বিতীয় প্রকার প্রেরিত বাণী হচ্ছে ওহীয়ে গায়েবে মাতলু। যেসব প্রেরিত বাণীতে শুধু বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে, শাব্দিক বা আক্ষরিকভাবে বর্ণনা করা হয়নি বা করার কোন প্রকার আয়োজন করা হয়নি। রাসুল (সা.) এ প্রকার প্রেরিত বাণীর শব্দ বা বাক্যের আক্ষরিক বর্ণনায় বাধ্য ছিলেন না। প্রেরিত বাণীর প্রাপ্ত মূল ভাবটা নিজের ভাষায় বর্ণনা করার অধিকার তার ছিল। এ পুস্তকের মূল আলোচ্য বিষয়বস্তু হচ্ছে দ্বিতীয় প্রকারের ওহী যা সাধারণভাবে হাদিস নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। রাসুল (সা.) এর নবী জীবনের সর্বপ্রকার কর্মতৎপরতা, উক্তি, বক্তব্য এবং তাঁর সম্মুখে অনুষ্ঠিত অন্যের কার্যকলাপ যার প্রতি তাঁর সমর্থন ও মৌন সম্মতি পরিলক্ষিত হয়েছিল। ইসলামের পরিভাষায় তাকে সুন্নাহ নামে আখ্যায়িত করা হয় এবং এর অপর প্রতিশব্দ হল খবর। রাসুল (সা.) ছিলেন তাঁর উম্মতের জন্য জীবন্ত আদর্শ। তাঁর প্রতিটি কার্যকলাপ আল্লাহ তা'য়ালার ইচ্ছানুযায়ী পরিচালিত হয়েছে। হযরত আয়েশা (রা.) কে একবার প্রশ্ন করা হয়েছিল, রাসুল (সা.) সম্বন্ধে বর্ণনা দিতে। উত্তরে তিনি বলেছিলেন রাসুল (সা.) এর জীবন হচ্ছে কোরআনের মূর্তপ্রতীক বা প্রতিফলন অর্থাৎ কোরআন থিওরী এবং মোহাম্মদ (সা.) এর জীবনাচরণ প্রাকটিক্যাল কোরআন।

হাদীসের প্রকারভেদ

হযরত মোহাম্মদ (সা.)এর নবী জীবনের কর্ম তৎপরতাকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়-

(ক) যা তিনি পয়গাম্বরের দায়িত্ব পালনোপলক্ষে করেছেন।

(খ) যা তিনি অপরাপর মানুষের ন্যায় তাঁর জৈবিক চাহিদা, অভ্যাস বা জীবনাচার পূরণের প্রয়োজনে করেছেন।

প্রথম প্রকার কার্যাবলী খোদাতায়ালার নিয়ন্ত্রণাধীনে সম্পাদিত হয়েছে। দ্বিতীয় প্রকার কার্যাবলী অবশ্য এরূপ নয়। রাসুল (সা.) এর জীবনের এ দ্বৈত ভূমিকায় আল্লাহ তায়ালা এভাবে বর্ণনা করেছেন, "আনা বাসারুম মিসলুকুম ইউহা ইলাইয়্যা" অর্থাৎ– আমি তোমাদের মতই মানুষ ব্যতিক্রম শুধু এই যে, আমার নিকট ওহী প্রেরিত হয়।

ভারতের বিখ্যাত আলেম শাহওয়ালী উল্লাহ্ দেহলবী উপরোল্লিখিত দু' প্রকার হাদীস সমুহের বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তিনি লিখেছেন প্রথম স্তরের হাদিসগুলোতে নিম্ন বর্ণিত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত:

১। যাতে বিভিন্ন স্তরের সমাজ ব্যবস্থা ও নিয়ম শৃংখলার বিষয় বর্ণিত রয়েছে। উহার কোনটির উৎস স্বয়ং রাসুল (সা.) এর ইজতেহাদ। তাঁর ইজতেহাদ ও ওহী সমপর্যায়ের কারণ তাঁকে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন শরীয়ত সম্পর্কিত বিষয়ে ভুল সিদ্ধান্ত থেকে বিরত রেখেছেন।

২। যাতে সার্বজনীন ও সর্বকালীন জনকল্যাণমূলক কার্যক্রম ও নীতিমালা সমূহ রয়েছে যেমন চারিত্রিক বিষয়, উহার উৎস সাধারণত: ইজতেহাদ। যাতে কার্যকলাপ ও কার্যক্রমের গুরুত্ব ও মহত্ব বর্ণিত হয়েছে। ওহী ইজতেহাদ এ গুলির উৎস। নীচের দ্বিতীয় স্তরের হাদীসগুলো যা তার নবয়ুতের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত নয় তাতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত:

৩। (ক) যাতে চাষাবাদ জাতীয় কোন কথা রয়েছে। যথা- খেজুর সম্বন্ধীয় হাদীসটি। ঘটনাটি এরূপ: মদীনায় লোকেরা খেজুরের অধিক ফলনের জন্য নর খেজুর গাছের শীষ নিয়ে মাদী খেজুর গাছের কান্ডের সাথে বেঁধে দিত (Pollination)। একদিন রাসুল (সা.) সে প্রক্রিয়াটি দেখে বললেন, "তোমরা এ কাজটা না করলেও পার।" রাসুল (সা.) এর এরূপ মন্তব্য শুনে ছাহাবীগণ (রা.) এরূপ করা বন্ধ করে দিলেন ফলে সে বছর খেজুরের ফলন খুব কম হয়। যখন রাসুল (দ.) ব্যাপারটি জানতে পারলেন তখন তিনি বললেন, "আমি মনে করেছিলাম এরূপ না করলেও চলে। এরূপ ধারণা প্রসুত কথায় তোমরা আমার দোষারোপ করোনা কেন না ধারণা সঠিক নাও হতে পারে। কিন্তু আমি যখন আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন কথা বলি উহাকে নিশ্চয়ই গ্রহণ করবে কেননা আল্লাহর প্রতি আমি কখনো অসত্য আরোপ করি না।

খ) যাতে চিকিৎসা বিষয়ক কোনো কথা রয়েছে।

গ) যাতে কোনো বস্তু বা জন্তুর গুণাগুনের কথা বলা হয়েছে যেমন- কালজিরা মৃত্যু ছাড়া সর্বরোগের ঔষধ এবং ঘোড়া কিনতে গাঢ় রং বা সাদা কপালওয়ালা কিনবে ইত্যাদি।

ঘ) যাতে সেসব কাজের কথা রয়েছে যে সকল কাজ তিনি ইবাদত রূপে নয় বরং অভ্যাস অথবা ঘটনাক্রমে করেছেন।

ঙ) যাতে আরবদের মধ্যে প্রচলিত কাহিনী সমুহের মধ্যে তাঁর কোন কাহিনীর বর্ণনা রয়েছে যেমন উম্মেজারা ও খোরাফার কাহিনী।

চ) যাতে সমকালীন কোনো বিশেষ মোছলেহাতের বা পরামর্শের কথা রয়েছে যেমন- সৈন্য পরিচালনার কথা।

ছ) যাতে তাঁর বিশেষ বিচার ফয়সালার কথা রয়েছে। এ সকলের কোনটির উৎস তাঁর অভিজ্ঞতা, কোনটির উৎস তাঁর ধারণা। কোনোটির উৎস তাঁর অভ্যাস ও দেশ প্রথা আর কোনটির উৎস সাক্ষ্য প্রমাণ যথা বিচার সিদ্ধান্ত। প্রথম প্রকার সুন্নাহর অনুসরণ আমাদের কর্তব্য দ্বিতীয় প্রকারের সুন্নাহ অনুকরণীয়।

সংকলন ও সংগ্রহ

ইসলামের প্রাথমিক যুগ থেকে হাদীস সংগ্রহের প্রচলন শুরু হয়। যে সকল মনীষী হাদীস সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের উদগ্র বাসনা পোষণ করেছেন তাঁরা হাদীসের অধ্যয়ন ও সংগ্রহের ব্যাপারে তাঁদের জীবন উৎসর্গ করেছেন। এ ছিল তাদের একান্ত ব্যক্তিগত উদ্যোগ। হাদীসের প্রচার ও হেফাজতের জন্য তৎকালীন মুসলিম মনীষীগণ চারটি উপায় অবলম্বন করেছেন। যা হলো-

(ক) শিক্ষা গ্রহণ (খ) হেফজ করণ (গ) উহা লিখন (গ) শিক্ষা দান এবং উহা মোতাবেক আচরণ।

সাহাবীগণ রাসুলুল্লাহর (সা.) প্রতিটি কথাকে নিজেদের স্মৃতিপটে জাগরুক রাখার ব্যাপারে সর্বদাই সচেষ্ট ছিলেন। অত:পর তাবেয়ী ও তাবে তাবেয়ীগণ হাদীস লিপিবদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত সাহাবীদের ধারা অনুসরণ করেন। রাসুল (সা.) পরবর্তী যুগে শত শত ধী শক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি জন্ম গ্রহণ করেন যারা হাদীস সংগ্রহ করণের জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন এবং সুন্নাহর প্রতিটি শব্দকে সনদ সহকারে কণ্ঠস্থ করেছেন। এতদভিন্ন সতর্কতা হিসেবে রাসুল (সা.) এর সুন্নাহকে তারা লিপিবদ্ধ করেছেন যার সূচনা আমরা দেখতে পাই রাসুল (সা.) এর যুগ থেকে। হাদীসের অধ্যায়ন, সংগ্রহ ও সংকলনের কাজ ইসলামের প্রথম যুগ থেকে পঞ্চম শতাব্দির শেষ পর্যন্ত ব্যাপকভাবে চলতে থাকে। এই সময়কে তিন যুগে ভাগ করা হয়।

প্রথম যুগঃ যা রাসুল (সা.) এর নবুয়তের প্রথম হতে হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজিজের খেলাফত লাভ পর্যন্ত (৯৯হি.) ১১২ বৎসর কালকেই বুঝায়।

দ্বিতীয় যুগঃ শতাব্দীর প্রথম থেকে তৃতীয় শতাব্দীর প্রথম পাদ পর্যন্ত প্রায় এক শতাব্দী ব্যাপী।

তৃতীয় যুগঃ তৃতীয় শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদ থেকে পঞ্চম শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত প্রায় তিন শতাব্দী ব্যাপী।

প্রথম যুগ

এ যুগের শেষ পর্যন্ত সাহাবীগণ জীবিত ছিলেন। হযরত আনাছ ইবনে মালেক (রা.) ৯৩ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। সাহাবীদের রাসুলুল্লাহর (সা.) হাদীস জানার আগ্রহ সম্বন্ধে আমরা ইতিপূর্বে কিছুটা আলোকপাত করেছি। অনেক সাহাবী এজন্য তাঁদের জীবনকে উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন। যেমন আসহাবে সোফফাগণ যাঁরা (সংখ্যা ৭০/৮০ জন) সার্বক্ষণিকভাবে রাসুলের (সা.) সান্নিধ্যের জন্য মসজিদে নববীতে বসবাস করতেন। যাঁরা অন্যান্য দায়িত্বের দরুণ সর্বক্ষণ রাসুল (সা.) এর খেদমতে উপস্থিত থাকতে অপারগ ছিলেন তারা যখনই সুযোগ পেতেন তাঁর খেদমতে হাজির হওয়ার চেষ্টা করতেন বা অন্যের নিকট হুজুরের দরবারে কখন কি ঘটেছে তা জেনে নিতে সচেষ্ট থাকতেন। কেউ আবার এর জন্য নিজেদের মধ্যে পালা ঠিক করে নিয়েছিলেন যেমন হযরত ওমর ফারুক (রা.) এর ঘটনা পূর্বে আলোচিত হয়েছে।

সাহাবীগণ রাসুল (সা.)এর জীবদ্দশায় শুধু হাদীসের হেফাজত ও প্রচারে তৎপর ছিলেন তা নয় বরং তাঁর ওফাতের পর তাদের তৎপরতা শতগুনে বেড়ে গিয়েছিল। হাদীস সংগ্রহের জন্য তাঁরা শত শত মাইল ভ্রমণ করেছেন। যদিও সেকালের সফর সহজ সাধ্য ছিলনা। হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রা.) একটি মাত্র হাদীস এর জন্য মদীনা হতে মিসর পর্যন্ত ভ্রমণ করেন যা তিনি তথায় ওকবা ইবনে আমরের নিকট হতে নিয়েছেন। হযরত আনাস (রা.) হযরত আবদুলাহ্ ইবনে উনাইদের নিকট হতে হাদীস সংগ্রহের জন্য এক মাসের পথ অতিক্রম করে শাম (সিরিয়া) দেশে গিয়েছিলেন, তেমনিভাবে হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে উনাইদের নিকট সিরিয়ায় যায় এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) প্রবীন সাহাবীদের নিকট হাদীস শিক্ষার্থে দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়াতেন। সাহাবীগণ আল্লাহর কেতাবের ন্যায় রাসুল (সা.) এর হাদীস ও রীতিমত কণ্ঠস্থ করেন এবং তা নিয়ে আলোচনা করতেন। হযরত আনাস (রা.) বলেন আমরা (পরবর্তী বর্ণনাকারী বলেন, আমার মনে হয় ৬০ জন) রাসুল (সা.) এর সান্নিধ্যে

বসতাম। তিনি আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করতেন। অত:পর তিনি নিজ কাজে চলে যেতেন আর আমরা বসে উহার পুনঃ পুনঃ আলোচনা করতাম- তখন হাদীস আমাদের অন্তরে গ্রথিত হয়ে যেত। (মাজমাউল জাওয়ায়েদ)।

রাসুল (সা.)এর সহচরগণ যেভাবে হাদীস এর জ্ঞান অর্জনকে জরুরী মনে করেছেন তেমনি তার প্রচার করাকেও অবশ্য কর্তব্য বলে মনে করতেন। তাই রাসুল (সা.) এর ইন্তিকালের পর এ কর্তব্য পালনে বহু সংখ্যক সাহাবী তৎপর হন। ফলে আমরা হাদীস এর প্রশিক্ষক হিসেবে মদীনায় দেখতে পাই হযরত আয়েশা (রাঃ), হযরত আবু হোরায়রা (রা.) হযরত আবদুল্লা ইবনে ওমরকে, কুফায় দেখতে পাই হযরত আলী (রা.) ইবনে মাসউদ (রা.), আনাস ইবনে মালেক (রা.) প্রমুখ বিশিষ্ট সাহাবীদেরকে। বসরায় দেখতে পাই হযরত আবু মুছা আশয়ারীকে যিনি শাসন কার্য পরিচালনার সাথে সাথে হাদীস প্রশিক্ষকের দায়িত্ব পালন ও অব্যাহত রাখেন। মিশরে ছিলেন হযরত আমর ইবনুল আস (রা.) এবং সিরিয়ার আবু সায়িদ খুদরী (রা.)। এছাড়া অন্যান্য সাহাবীগণ যিনি যেখানে গিয়েছেন, হাদীস এর শিক্ষাদানকে সমস্ত করণীয় কাজের মধ্যে অগ্রাধিকার দিতেন। হাদীসের সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও শিক্ষাদানের ব্যাপারে সকল সাহাবীদের সমান সুযোগ ছিলনা। তাই সকলের পক্ষে সমান পরিমান হাদীস শিক্ষা দেয়া বা রেওয়ায়েত করা সম্ভবপর হয়নি। যাঁরা এক হাজার বা ততোধিক হাদীস শিক্ষা দিয়েছেন মোহাদ্দেসগণ তাদেরকে "মুক্সসিরিন" নামে আখ্যায়িত করেছেন। যাঁরা পাঁচশত থেকে অনুর্ধ হাজার হাদীস শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দিয়েছেন তারা "মোতাওয়াছ্ছেতিন" নামে খ্যাত। যারা চল্লিশ থেকে অনুর্ধ ৩০০ হাদীস এর প্রশিক্ষক তারা হলেন 'মুক্কিল্লীন' আর যারা চল্লিশের কম হাদীস শিক্ষা দিয়েছেন তাঁদেরকে বলা হয় 'আক্কাল্লীন'। প্রথম তিন শ্রেণীর সাহাবীদের নাম ও তাঁদের বর্ণিত হাদীস এর সংখ্যা দেওয়া হলো। চতুর্থ শ্রেণীর সাহাবীদের সংখ্যা অধিক হেতু তাঁদের নাম উল্লেখ করা হলনা।

মুক্সসিরিন

১। হযরত আবু হোরায়রা (রা.) (মৃত ৫৭ হি.) ৫৩৬৪

২। হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) (মৃত ৯১ হি.) ২২৩৬

৩। হযরত আবদুল্লা ইবনে আব্বাস (রা.) (মৃত ৬৮ হি.) ২৬৬০

৪। হযরত আবদুল্লা ইবনে ওমর (রা.) (মৃত ৭৩ হি.) ১৬৩০

৫। হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লা (রা.) (মৃত ৭৪ হি.) ১৫৪০

৬। উম্মুল মোমেনীন হযরত আয়েশা (রা.) (মৃত ৫৭ হি.) ২২১০

৭। হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রা.) (মৃত ৭৪ হি.) ১১৭০

মুতাওয়াচ্ছেতীন

১। হযরত আবদুল্লা ইবনে মাসুদ (রা.) (মৃত্যু ৩২ হি.) ৮৪৮

২। হযরত আমর ইবনুল আস (রা.) (মৃত্যু ৬৩ হি.) ৭০০

৩। হযরত আলী মোরতাজা (রা.) (মৃত্যু ৪০ হি.) ৫৮৬

৪। হযরত ওমর ফারুক (রা.) (মৃত্যু ২৩ হি.) ৫৩৯

মুক্কিলিন

১। উম্মুল মোমেনীন হযরত সালমা (রা.) (মৃত্যু ৫৯ হি.) ৩৭৮

২। হযরত আবু মুছা আস আরী (রা.) (মৃত্যু ৫৪ হি.) ৩৬০

৩। হযরত বারা ইবনে আজেব (রা.) (মৃত্যু ৭২ হি.) ৩০৫

৪। হযরত আবুজর গিফারি (রা.) (মৃত্যু ৩২ হি.) ২৮১

৫। হযরত সা'দ ইবনে আবি ওককাছ (রা.) (মৃত্যু ৫৫ হি.) ২১৫

৬। হযরত ছাহল আনছারী (রা.) (জুন্দব ইবন কায়েছ রা.) (মৃত্যু ৯১ হি.) ১৮৮

৭। হযরত ওবায়দা ইবনে সামেত আনছারী (রা.) (মৃত্যু ৩৪ হি.) ১৮১

৮। হযরত আবু দারদা (রা.) (মৃত্যু ৩২ হি.) ১৭৯

৯। হযরত উবাই ইবনে কাব (রা.) (মৃত্যু ২১ হি.) ১৬৪

১০। হযরত আবু কাতাদা আনছারী (রা.) (মৃত্যু ৬৪ হি.) ১৭০

১১। হযরত বোরাইদা ইবনে হাছিব (রা.)(মৃত্যু ৬৩ হি.) ১৬৪

১২। হযরত মায়াজ ইবনে জাবাল (রা.) (মৃত্যু ১৮ হি.) ১৭৫

১৩। হযরত আবু আইয়ুব আনছারী (রা.) (মৃত্যু ৫২ হি.) ১৫০

১৪। হযরত ওসমান গনি (রা.) (মৃত্যু ৩৫ হি.) ১৪৬

১৫। হযরত জামুরাহ ইবনে ছামুরাহ (রা.) (মৃত্যু ৭৪ হি.) ১৪৬

১৬। হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) (মৃত্যু ১৩ হি.) ১৪২

১৭। হযরত মুগীরা ইবনে শোবাহ (রা.) (মৃত্যু ৫০ হি.) ১৩৬

১৮। হযরত আবু বাকরাহ (রা.) (মৃত্যু ৫২ হি.) ১৩০

১৯। হযরত ইমরান ইবনে হোসাইন (রা.) (মৃত্যু ৫২ হি.) ১৩০ (রা.)

২০। হযরত মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান (রা.) (মৃত্যু ৬০ হি.) ১৩০

২১। হযরত ওসামা ইবনে যায়েদ (রা.) (মৃত্যু ৫৪ হি.) ১২৮

২২। হযরত সাওবান (রা.) (মৃত্যু ৫৪ হি.) ১২৭

২৩। হযরত নোমান ইবনে বশির (রা.) (মৃত্যু ৬৫ হি.) ১২৪

২৪। হযরত ছামুরা ইবনে জুন্দুব (রা.) (মৃত্যু ৫৮ হি.) ১২৩

২৫। হযরত আবু মাসুদ আনছারী (রা.) (মৃত্যু ৪০ হি.) ১০২ হি.

২৬। হযরত জারীর ইবেন আবদুল্লাহ বাজালী (রা.) (মৃত্যু ৫১ হি.) ১০০

২৭। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রা.) (মৃত্যু ৮৭ হি.) ৯৫

২৮। হযরত জায়েদ ইবনে ছাবেত আনছারী (রা.) (মৃত্যু ৪৮ হি.) ৯২

২৯। হযরত যায়েদ ইবনে সাহাল তালহা আনছারী (রা.) (মৃত্যু ৩৪ হি.) ৯০

৩০। হযরত যায়েদ ইবেন আরকাম আনছারী (রা.) (মৃত্যু ৬৮ হি.) ৯০

৩১। হযরত যায়েদ ইবনে খালেদ (রা.) (মৃত্যু ৭৮ হি.) ৮১

৩২। হযরত কাব ইবনে মালেক (রা.) (মৃত্যু ৫০ হি.) ৮০

৩৩। হযরত রাফে ইবেন খাদীজ (রা.) (মৃত্যু ৭৪ হি.) ৭৮

৩৪। হযরত ছালামা ইবনে আকওয়াহ (রা.) (মৃত্যু ৭৪ হি.) ৭৭

৩৫। হযরত আবু রাফেয় (রা.) (মৃত্যু ৩৫ হি.) ৬৮

৩৬। হযরত আদী ইবনে হাতিমতায়ী (রা.) (মৃত্যু ৬৮ হি.) ৬৬

৩৭। উম্মুল মুমেনীন হযরত হাফছা (রা.) (মৃত্যু ৪৫ হি.) ৬০

৩৮। হযরত উম্মে হাবিবাহ উম্মুল মুমেনীন (রা.) (মৃত্যু ৪৪ হি.) ৬৫

৩৯। হযরত ছালামান ফারসী (রা.) (মৃত্যু ৩৪ হি.) ৬৪

৪০। হযরত আম্মার ইবনে ইয়াছির (রা.) (মৃত্যু ৩৭ হি.) ৬২

৪১। হযরত জোবায়ের ইবনে মোতেম (রা.) (মৃত্যু ৫৮ হি.) ৬০

৪২। হযরত শাদ্দাদ ইবনে আউছ (রা.) (মৃত্যু ৬০ হি.) ৬০

৪৩। হযরত আছমা বিনতে আবু বাকার (রা.) (মৃত্যু ৭৪ হি.) ৫৬

৪৪। হযরত ওয়াছেলা ইবনে আছকা (রা.) (মৃত্যু ৮৫ হি.) ৫৬

৪৫। হযরত ওকবাহ ইবনে আমের (রা.) (মৃত্যু ৬০ হি.) ৫৫

৪৬। হযরত আমর ইবনে ওতবাহ (রা.)(মৃত্যু ৩৭ হি.) ৪৮

৪৭। হযরত কাব ইবনে আমর (রা.) (মৃত্যু ৫৫ হি.) ৪৭

৪৮। হযরত ফোজালা ইবনে ওবায়েদ আসলামী (রা.) (মৃত্যু ৫৮ হি.) ৪৬

৪৯। হযরত মাইমুনা উম্মুল মোমেনীন (রা.) (মৃত্যু ৫১ হি.) ৪৬

৫০। হযরত উম্মে হানী (রা.) (মৃত্যু ৫০ হি.) ৪৬

৫১। হযরত আবু জোহাইফা (রা.) (মৃত্যু ৭৪ হি.) ৪৫

৫২। হযরত বেলাল (রা.) (মৃত্যু ১৮ হি.) ৪৪

৫৩। হযরত আবদুলাহ ইবনে মুগাফাফাল (রা.) (মৃত্যু ৫৭ হি.) ৪৩

৫৪। হযরত মিকদাদ ইবনে আসওয়াদ (রা.) (মৃত্যু ৩৩ হি.) ৪৩

৫৫। হযরত উম্মে আতীয়াহ আনছারী (রা.) (মৃত্যু ...... হি.) ৪১

৫৬। হযরত হাকীম ইবনে হিজাম (রা.)(মৃত্যু ৫৪ হি.) ৪০

৫৭। হযরত ছালমা ইবনে হানিফ (রা.) (মৃত্যু .... হি.) ৪০

রাসুল (সা.) এর সাহাবীদের সংখ্যা

হযরত মোহাম্মদ (সা.) এর ইন্তেকালের পূর্বে সমগ্র আরবের অধিবাসীরা ইসলাম গ্রহণ করে। এ সময়ে ইসলাম গ্রহণকারী সবারই পক্ষে রাসুল (সা.) এর সাথে সাক্ষাত করা বা তাঁর সান্নিধ্যে আসা সম্ভবপর ছিল না। বহু ক্ষেত্রে শুধু গোত্রের নেতৃবৃন্দ বা প্রতিনিধি দলই তাঁর সাথে সাক্ষাত করেন। পরে তাঁরা তাদের গোত্রের নিকট ইসলামের বাণী প্রচার করেন। এরূপ আরবে যারা রাসুল (সা.) কে দেখেছেন এবং যারা হাদীস বর্ণনা করেছেন তাদের সংখ্যাও সমান নয়। কারণ যারা রাসুল (সা.) এর সাথে সাক্ষাত করেছিলেন তাঁদের সবার পক্ষে হাদীস বর্ণনা করার সমান সুযোগ ছিলনা। ইমাম আবু জুরআ রাজীর মতে যারা সরাসরি বা অন্য সাহাবীর মারফত হাদীস বর্ণনা করেছেন শুধু তাঁদের সংখ্যাই ছিল একলক্ষ চৌদ্দ হাজার এর মত।

হযরত (সা.) এর ওফাতের সময় সাহাবীদের সংখ্যা ছিল ৬০ হাজার যা ইমাম শাফী (রা.) বর্ণনা করেছেন- তাঁরা শুধু মক্কা ও মদীনায় বসবাসকারী সাহাবী। তাঁর বর্ণনানুযায়ী তখন মক্কায় ৩০ হাজার ও মদীনায় ৩০ হাজার সাহাবী ছিলেন তাদের অধিকাংশই পল্লীবাসী ছিলেন বিধায় তাদের নাম জানা যায় নাই। যে সব সাহাবীদের নাম "আসমাউর রেজালে" বর্ণিত হয়েছে

তাদের সংখ্যা ৯৪ হাজারের বেশী নয়। ইবনে আবদুল বার তার " আল ইসতিয়াব" নামক কেতাবে ৭০০০ সাহাবীর ইবনুল আসীর জাজরী তার উসুদুল গাবা নামক কিতাবে ৭৫৫৪ জন সাহাবীর এবং ইমাম জাহাবী তার তাজরীদ নামক গ্রন্থে ১২৮১ জন সাহাবীয়াহ (মহিলা সাহাবী) সহ মোট ৮৮০৮ জনের জীবনী আলোচনা করেছেন।

যুগে যুগে ইসলাম বিরোধী শক্তি হাদীস সম্বন্ধে নানারূপ বিরূপ উক্তি করেছেন। বিশেষ করে তারা হযরত আবু হোরাইরা (রা.) এবং হযরত ইবনে আব্বাসের প্রতি তাঁদের বর্ণনাকৃত হাদীস এর আধিক্যের দরুন সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। তাদের বক্তব্য হলো হযরত আবু হোরায়রার (রা.) স্বল্প সময়ের নবীর সহচর্য্য এবং হযরত ইবনে আব্বাসের (রা.) অল্প বয়স হেতু এত অধিক হাদীস আয়ত্ব করা, বর্ণনা করা ও তার মর্মার্থ বুঝা সহজ কার্য ছিলনা। তাই তাদের নিজস্ব বর্ণনাকৃত হাদীস বর্ণনা সম্ভব ছিলনা। বিরুদ্ধবাদীদের সমালোচনার উত্তর আমরা উক্ত দুজন সাহাবীদের জীবনী আলোচনা দিয়েই শুরু করছি।

হযরত আবু হোরায়রা (রা.)

হযরত আবু হোরায়রা (রা.) সপ্তম হিজরীতে ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি ইয়েমেনের দৌচছী গোত্রের লোক ছিলেন। ত্রিশোর্ধ বয়সের সময় তিনি তার গোত্রের লোকদের সঙ্গে মদীনায় আসেন। খাইবার যুদ্ধ চলার দরুন রাসুল (সা.) তখন খাইবার অবস্থান করছিলেন। খাইবার যুদ্ধ সপ্তম হিজরীর মহরম মাসে সংঘটিত হয়। সপ্তম হিজরী থেকে রাসুল (সা.) এর ওফাত পর্যন্ত (একাদশ হিজরীর প্রথম ভাগ রবিউল আওয়্যাল মাস) ৪ বৎসর কাল তিনি রাসুলের সহচর্যে ছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পর তিনি ক্ষণিকের জন্য ও রাসুল (সা.) এর সান্নিধ্য ত্যাগ করেননি। সর্বপ্রকার ভোগ বিলাসীতা ত্যাগ করে রাসুলের (সা.) নিকট জ্ঞান আহরন করাকেই তাঁর জীবনের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেন। এমন কি জীবন ধারণের জন্য অন্ন বস্ত্রের যোগানের জন্য সময় নষ্ট না করে রাসুল (সা.) এর সার্বক্ষণিক সান্নিধ্যে ছিলেন। রাসুল (সা.) এর নিকট থেকে তিনি খাওয়া পরার জন্য যা পেতেন তাতেই তিনি সন্তুষ্ট থাকতেন এবং সর্বক্ষণ মদীনায় মসজিদে নববীর বারান্দায় দিন যাপন করতেন। এতদ্বতীত তিনি অত্যন্ত নিঃসংকোচ মানুষ ছিলেন। কোনো কিছু জানার জন্য রাসুল (সা.) কে প্রশ্ন করতে দ্বিধা বোধ করতেন না। একবার তিনি হুজুরের নিকট জিজ্ঞাসা করলেন কেয়ামতের দিন কোন ভাগ্যবান

আপনার শাফায়াত লাভে ধন্য হবেন এ প্রশ্ন শুনে রাসুল (সা.) বললেন আবু হোরায়রা, আমি তোমার জ্ঞান আহরনের আগ্রহ লক্ষ্য করে পূর্বেই ধারণা করেছিলাম এ সম্পর্কে তুমিই সর্বপ্রথম জিজ্ঞাসা করবে। (ইছাবাহ- বোখারী)

হযরত আবু হোরায়রাহ (রা.) এর স্মরণ শক্তি ছিল অত্যন্ত প্রখর। স্বয়ং রাসুল (সা.) তাঁর স্মরণ শক্তির জন্য দোয়া করেছিলেন। হযরত যায়েদ ইবনে ছাবেত (রা.) বলেন একবার আমি আমার এক সংগী এবং আবু হোরায়রাহ মসজিদে বসে দোয়া করছিলাম এমন সময় রাসুল (সা.) তথায় উপস্থিত হলেন। তাঁর উপস্থিতিতে আমরা চুপ হয়ে গেলাম! তখন তিনি বললেন তোমরা তোমাদের কাজ করতে থাক। আমরা পুনরায় দোয়া শুরু করলাম আর হুজুর (সা.) আমাদের সাথে আমীন আমীন বলছিলেন। আমাদের দুজনের দোয়া শেষ হবার পর আবু হোরায়রাহ তাঁর দোয়ায় বললেন খোদা আমার সংগীদ্বয় তোমার নিকট যা চেয়েছে আমিও তোমার নিকট তা চাই। অধিকন্তু আমি তোমার নিকট আরো চাই যে তুমি আমাকে এলেম দান কর যা আমি সহজে ভুলে না যাই। তখন আমরা বললাম হুজুর আমাদেরকেও যেন আল্লাহ তায়ালা এরূপ এলেম দান করেন। হুজুর (সা.) বললেন এ ব্যাপারে আবু হোরায়রাহ তোমাদের আগেই দরখাস্ত করে ফেলেছে। (নাছায়ী ইছাবা ৪/২০০)

মারওয়ানের সেক্রেটারী আবু জুরাইজাহ বলেনঃ হযরত আবু হোরায়রাহ এর স্মরণ শক্তি পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে একবার মারওয়ান আমাকে আড়ালে রেখে আবু হোরায়রাকে কিছু হাদীস বর্ণনা করতে বললেন এবং আমি তা গোপনে লিখে নিলাম। একবছর পর মারওয়ান তাকে সে সকল হাদীস পুনরায় বর্ণনা করতে বললেন তিনি তা আবার বর্ণনা করেন কিন্তু কোথায় ও একটি শব্দও কম বেশী করেননি। (ইছাবাহ ৪/২০৩)

তাঁর হাদীস বর্ণনায় সতর্কতা

হযরত আবু হোরাইরা (রা.) হাদীস বর্ণনায় কতটুকু সতর্কতা অবলম্বন করতেন তা নীচে বর্ণিত ঘটনাগুলো থেকে অনুধাবন করা যায়। একবার শফীয়হ ইজবেহী নামক একব্যক্তি মদীনায় আবু হোরাইরাহকে একটি হাদীস শুনাতে অনুরোধ করেন। উত্তরে হযরত আবু হোরাইরাহ (রা.) বললেনঃ শুনবে। অত:পর তিনি বেহুস হয়ে পড়েন। এভাবে তিনি তিন বার বেহুস হলেন এবং তিন বার হুসে আসলেন, চতুর্থ বার এত বেহুস হলেন যে মাটিতে উপুড় হয়ে পড়ে গেলেন। শাফিয়াহ বলেন আমি তাঁকে উঠাইলাম,

হুস ফিরে আসল। তারপর অনেকক্ষণ চুপ থেকে আমাকে একটা হাদীস শুনালেন (তিরমিজি)। তাবেয়ী কোলাইব বলেন, আমি হযরত আবু হোরাইরাহকে একথা বলে হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি- 'রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্বক আমার নামে মিথ্যা হাদীস রচনা করে সে যেন তার স্থান দোজখে তৈরী করে নেয়।' (ইছাবাহ ৪/২০৬ পৃষ্ঠা)

আবু হোরাইরার প্রতি সাহাবাদের আস্থাঃ হাদীস বর্ণনায় অপর সাহাবীগণ কখনো আবু হোরাইরার প্রতি অনাস্থা প্রকাশ করেননি। তিনি ভুল হাদীস পরিবেশন করেছেন বলেও মন্তব্য করেননি। মোস্তাদরাক গ্রন্থে বর্ণিত আছে, আবু আমের তাবেয়ী বলেন, একদিন হযরত তালহার নিকট ছিলাম এমন সময় এক ব্যক্তি উপস্থিত হলেন এবং বললেন আবু মোহাম্মদ (হযরত তালহা) আমি বুঝতে পারছিনা রাসুলুল্লাহকে (সা.) এই ইয়েমেনী (আবু হোরায়রাহ) বেশী জানে না আপনি? হযরত তালহা উত্তর দিলেন আবু হোরায়রাহ (রা.) রাসুল (সা.) এর নিকট এমন সব হাদীস শুনেছেন যা আমরা শুনার সুযোগ পাইনি। কারণ আমাদের বিষয় সম্পত্তি ছিল, স্ত্রী-পুত্র ছিল আমরা কেবল সকাল সন্ধ্যায় হুজুরের খেদমতে হাজির হতাম অন্য সময়ে এ সবের তত্ত্বাবধানে ব্যস্ত থাকতাম। আবু হোরায়রাহ ছিল সর্বস্ব ত্যাগী মিস্‌কিন। তার না ছিল বিষয় সম্পত্তি না ছিল স্ত্রী পুত্র। তিনি নিজেকে সম্পূর্ণ রাসুলের নিকট সোপর্দ করে দিয়েছিলেন। রাসুল (সা.) যেখানে যেতেন তিনিও সেখানে যেতেন। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে হযরত আবু হোরাইরাহ এমন সব কথা জানেন যা আমরা জানিনা। তিনি রাসুল (সা.) এর নিকট এমন সব হাদীস শুনেছেন যা আমরা শুনিনি। অত:পর হযরত তালহা (রা.) ইহাও পরিস্কারভাবে বললেন, আমাদের মাঝে কেউ আবু হোরায়রার প্রতি অভিযোগ করেন নি, যে তিনি রাসুলুল্লাহ (সা.) এর নামে হাদীস বলেছেন যা রাসুল (সা.) বলেন নি।

তাবেয়ী আবু সালেহ বলেন, হযরত আবু হোরায়রাহ কর্তৃক ফজরের সুন্নাতের পর কিছুক্ষণ বিশ্রামের হাদীসটি বর্ণনা করার খবর শুনে হযরত আবদুলাহ ইবনে ওমর (রা.) বলেন, হযরত আবু হোরাইরা বড় বেশী হাদীস বর্ণনা করেন। তখন উপস্থিত কেউ তাঁকে প্রশ্ন করেন, তাহলে কি আপনি মনে করেন আবু হোরায়রা না জেনে হাদীস বলেন? উত্তরে তিনি বলেন অবশ্য তা নয়। তবে তিনি সাহসী আর আমরা তা নই। একথা শুনে হযরত আবু হোরাইরা বললেন, আমি যদি হেফজ করে থাকি আর তাঁরা ভুলে যান এতে

আমার অপরাধ কোথায়। হযরত আবু হোরাইরা থেকে বর্ণিত আছে "আমার একটা হাদীস বর্ণনার খবর হযরত ওমর (রা.) এর নিকট পৌছলে তিনি আমাকে ডেকে এনে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি অমুক সাহাবীর ঘরে আমাদের সাথে ছিলে? আমি হ্যাঁ বলে উত্তর দিলাম এবং বললাম রাসুল (সা.) তখন বলেছিলেনঃ যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে আমার নামে মিথ্যা রচনা করবে সে যেন তার স্থান দোজখে তৈরী করে। তা শুনে হযরত ওমর (রা.) বললেন, যাও এখন হাদীস বর্ণনা করতে পার। (ইছাবাহ)

হযরত উবাই ইবনে কাব বলেনঃ হযরত আবু হোরাইরা (রা.) রাসুল (সা.) এর নিকট কিছু জিজ্ঞাসা করার ব্যাপারে দু:সাহসী ছিলেন। তিনি হুজুর (সা.) এর নিকট এমন সব কথা জিজ্ঞাসা করতেন যা অন্য কেউ সাধারণত জিজ্ঞাসা করতেন না। (ইছাবাহ)

আবু হোরাইরা (রা.) এর বক্তব্যঃ মারওয়ান যখন মদীনার শাসনকর্তা ছিলেন তখন তিনি কোন এক ব্যাপারে হযরত আবু হোরায়রার (রা.) প্রতি বিরূপ হয়ে বললেন, লোকে বলে "আবু হোরায়রা অধিক হাদীস বর্ণনা করেন, অথচ তিনি রাসুলুল্লাহ (সা.) এর ওফাতের অল্প কিছু দিন পূর্বেই মদীনায় এসেছেন। একথা শুনে হযরত আবু হোরাইরা বলেন, খাইবার যুদ্ধের সময় ৭ম হিজরীতে (প্রথম দিকে) আমি মদিনায় এসেছি তখন আমার বয়স ত্রিশোর্ধ। তখন থেকেই আমি প্রায়শঃ তাঁর সাথে সাথে তার বিবিদের ঘর পর্যন্ত গিয়েছি। তাঁর সাথে সব জিহাদে অংশগ্রহণ করেছি এবং হজ্জ ও উমরাহ সমাপন করেছি। এক কথায় তাঁর খেদমতে আমার সার্বক্ষণিক উপস্থিতি ছিল। এসব কারণে আমি অন্যদের তুলনায় তাঁর হাদীস অধিক অবগত আছি। খোদার কসম তারা তাঁর খেদমতে আমার উপস্থিতির স্বীকৃতি দিয়েছেন। এমন কি তাদের কেহ কেহ আমার নিকট রাসুলের হাদীস জিজ্ঞাসা করেছেন। এদের মধ্যে হযরত ওমর (রা.) হযরত তালহা (রা.) হযরত যুবায়েরের মত ব্যক্তিত্বও রয়েছেন। বোখারী শরিফে বর্ণিত আছে, একবার হযরত আবু হোরাইরা বলেন, আপনাদের ধারণা আমি অধিক হাদীস বর্ণনা করে থাকি। বাস্তব সত্য এই যে আমার মুহাজির ভাইগণ তাদের কাজ কারবার উপলক্ষে অনেক সময় বাজারে এবং আনসার ভাইগণ নিজেদের ক্ষেত খামারে ব্যস্ত থাকতেন, আর আমি তখন ঝঞ্ঝাটহীন দরিদ্র ব্যক্তি ছিলাম। সব সময়ে হুজুরের খেদমতে উপস্থিত থাকতাম। ফলে যে সকল বিষয়ে তারা জানার সুযোগ পাননি আমি তা পেয়েছি।

তাঁর রাসুল (সা.) এর সান্নিধ্যে উপস্থিতি, দরবেশ জীবন যাপন, জ্ঞান আহরণের একনিষ্ঠতা ও একাগ্রতা তদুপরি তার প্রখর স্মরণশক্তি তাকে অধিক সংখ্যক হাদীস বর্ণনায় সাহায্য করেছিল। তাই আমরা দেখতে পাই তার বর্ণনাকৃত ৫৩৬৪টি হাদীস। তিনি ছিলেন সাহাবীদের মধ্যে সর্বাধিক হাদীস বর্ণনাকারী। তার পক্ষেই একাজ সম্ভবপর ছিল। রাসুলুল্লাহর (সা.) ইন্তেকালের পর ২য় খলীফা হযরত ওমরের (রা.) শাসনামলে তিনি বাহরাইনের গভর্নর নিযুক্ত হন। পরবর্তীকালে হযরত মুয়াবিয়ার শাসনামলে তিনি মদীনার গভর্নরের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি হিজরীর ৫৯ সালে (৬৭৮খৃ.) মদীনায় পরলোক গমন করেন। তার নিকট প্রায় ৮শত শিক্ষার্থী হাদীস শিক্ষা গ্রহণ করেন।

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)

তিনি ইবনে আব্বাস (রা.) নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তিনি রাসুল (সা.) এর চাচা হযরত আব্বাসের সন্তান। এ সূত্রে তিনি রাসুল (সা.) এর চাচাতো ভাই। তিনি ৮ম হিজরীতে তার পিতা হযরত আব্বাসের সাথে মদীনায় গমন করেন। এবং মক্কা বিজয়ের অল্পদিন পূর্বে তার পিতার সাথে ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি মাত্র তিন বছর কাল রাসুল (সা.) এর সান্নিধ্য লাভ করেন। রাসুল (সা.) এর ওফাতের সময় তার বয়স ছিল ১৩ বছর। তিনি স্বয়ং রাসুলুল্লাহ (সা.) এর নিকট থেকে খুব কম হাদীস শিখতে পেরেছিলেন। তিনি অন্যান্য সাহাবীদের নিকট হতে হাদীস শিক্ষা নেন এবং জীবনকে কোরআন ও হাদীস শিক্ষার জন্য উৎসর্গ করেন। কোরআন ও হাদীসের প্রত্যুৎপন্নমতিতার জন্য তাকে এ দুটি বিষয়ে মহাপন্ডিত ব্যক্তি হিসেবে গণ্য করা হয়।

হযরত ইবনে আব্বাসের জ্ঞান আহরণের আগ্রহ প্রবল ছিল। এ উদ্দেশ্যে তিনি সদা সর্বদা রাসুলের (সা.) সংগে থাকতেন। রাসুল (সা.) তাকে খুব স্নেহ করতেন। তার মাঝে প্রতিভার লক্ষণ দেখে তাকে সঙ্গে রাখতেন। হযরত ইবনে আব্বাস প্রায় তাঁর খালা উম্মুল মোমেনীন হযরত মায়মুনার গৃহেই থাকতেন যাতে করে রাসুল (সা.) এর সান্নিধ্য থেকে জ্ঞান আহরণ তার জন্য সহজ হয়। রাসুলুল্লাহর (সা.) ওফাতের পর তিনি প্রধান সাহাবীদের দ্বারে দ্বারে গিয়ে হাদীস সংগ্রহ করেন।

দারামী গ্রন্থে বর্ণিত আছে, তিনি হযরত আবু রাফের নিকট হতে হাদীস জিজ্ঞাসা করে লিখে নিতেন। হযরত আবু রাফে ছিলেন রাসুলুল্লাহর (সা.)

আজাদ করা গোলাম। এ গ্রন্থে আরও বর্ণিত আছে- একবার তিনি তার সমবয়স্ক জনৈক আনছারীকে বললেন, হুজুরের ইন্তেকালের দরুণ তাঁর নিকট থেকে জ্ঞান আহরণ থেকে আমরা বঞ্চিত। চল আমরা তাঁর সাহাবীদের নিকট হতে জ্ঞান আহরণ করি। আনছারী উত্তর দিলেন এত প্রধান সাহাবীদের বর্তমান থাকতে কে তোমার জ্ঞানের প্রতি আকৃষ্ট হবে? ইহা শুনে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) একাই জ্ঞান আহরণে আত্ম নিয়োগ করলেন। পরে যখন দলে দলে লোক তার নিকট আসতে লাগল তখন সেই আনছারী আক্ষেপ করে বললেন, এ যুবকটি আমার অপেক্ষা অধিক বুদ্ধিমানের কাজ করেছে। একবার এক ব্যক্তি হযরত আবদুলাহ ইবনে ওমর (রা.) কে একটি আয়াত সম্বন্ধে প্রশ্ন করলেন- তিনি তাঁকে হযরত আবদুলাহ ইবনে আব্বাসের (রা.) নিকট জিজ্ঞাসা করার জন্য বললেন। প্রশ্নকারী ফিরে এসে ইবনে আব্বাসের উত্তর তার নিকট জানালে হযরত আবদুলাহ ইবনে ওমর (রা.) উক্তি করলেন আমি এ যাবত ইবনে আব্বাসের কোরআন সম্বন্ধে ব্যাখ্যা দেওয়া দুঃসাহসিকতাই মনে করতাম। কিন্তু এখন বুঝলাম সত্যিই ইবনে আব্বাসকে জ্ঞান দান করা হয়েছে।

স্মরণ শক্তি ও ধী শক্তি

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এর স্মরণ শক্তি অত্যন্ত প্রখর ছিল। তিনি একবার কোনো কথা শুনলেই তা স্মরণ রাখতে পারতেন। কথিত আছে তিনি ওমর ইবনে রাবিয়ার একটি দীর্ঘ কবিতা একবার মাত্র শুনে মুখস্ত করে ফেলেছিলেন। তাঁর ধী শক্তিও ছিল অসাধারণ। অতি সামান্য মনোযোগে তিনি জটিল সমস্যার সমাধান দিতে পারতেন যার বহু দৃষ্টান্ত আমরা হাদীস ও সীরাতের কিতাবে পাই। মোট কথা স্মরণ শক্তি, ধী শক্তি ও আগ্রহ গুনে তিনি স্বল্প সময়ে কোরআন হাদীস ও আরবী সাহিত্যে অগাধ পান্ডিত্য লাভ করেন। এজন্য তিনি প্রবীন সাহাবীদেরও সম্মান লাভে সমর্থ হন। হযরত ওমর (রা.) ও তাকে প্রবীন সাহাবীদের সারিতে বসাতেন। তাই একবার জনৈক সাহাবী আপত্তি তোলেন হযরত ওমর (রা.) তখন উপস্থিত সবার নিকট একটা প্রশ্ন উথাপন করেন। কেউ তার কোনো সন্তোষজনক উত্তর দিতে সমর্থ হলোনা। অবশেষে হযরত ওমর (রা.) হযরত আবদুলাহ ইবনে আব্বাসকে উত্তর দিতে বললেন। তিনি সে প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দিলেন এবং সবাই হযরত ওমর (রা.) কর্তৃক তাকে সম্মান প্রদর্শনের কারণ উপলব্ধি করতে সমর্থ হন। এক কথায় অল্প বয়সেই তিনি বিদ্যাসাগরে পরিণত হন।

তাই তাকে জ্ঞানাচার্য উপাধিতে আখ্যায়িত করা হয়। তাঁর পরিশ্রম, অসাধারণ ধী শক্তি, স্মরণ শক্তি এবং জ্ঞানার্জনের উদগ্র আগ্রহ তাকে হাদীস ও কোরআন সম্বন্ধে দিয়েছিল অগাধ পান্ডিত্য। এজন্য পাশ্চাত্য সমালোচকদের তার এত অল্প বয়সে রাসুলের (সা.) কথা ও কার্যের উপলব্ধি করার সামর্থ সম্পর্কে প্রশ্ন ও তার হাদীস বর্ণনার সমালোচনা বাস্তবের প্রেক্ষিতে আদৌ সঠিক নয়।

কয়েকজন হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবী

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.): তিনি ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর (রা.) এর পুত্র। তিনি তাঁর পিতার সাথে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং মদীনায় হিজরত করেন। রাসুলুল্লাহর (সা.) জীবদ্দশায় তিনি বেশ কয়েকটি জেহাদে অংশগ্রহণ করেন। হযরত ওসমান (রা.) এর নিহত হওয়ার পর মুসলমান সমাজে সৃষ্ট অর্ন্তদ্বন্দ্ব ও আত্মকলহে তিনি ছিলেন নিরপেক্ষ। তিনি ছিলেন ধর্মপরায়ন নির্লোভ প্রকৃতির মানুষ। সারাজীবন দরবেশী জীবন যাপন করেন। ৮৭ বছর বয়সে ৭০ হিজরীতে তাঁর ইন্তেকাল হয়। তিনি ঝামেলাহীন জীবন, দীর্ঘ দিন রাসুলে খোদার (সা.) সহচর্য তাঁকে এক অপূর্ব সুযোগ দিয়েছিল। রাসুলে করিমের (সা.) হাদীসের প্রচারণা ও প্রশিক্ষণে তিনি সর্বমোট ১৬৩০টি হাদীস বর্ণনা করেন।

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.): মাত্র ১০ বছর বয়সে তাঁর মাতা তাঁকে রাসুল (সা.) এর খেদমত করার জন্য উৎসর্গ করেন। তিনি রাসুল (সা.) এর খুব প্রিয় পাত্র ও অনুগত খেদমতগার ছিলেন এবং রাসুলের (সা.) ওফাতের পূর্ব পর্যন্ত তাঁর খেদমত করেন। হযরত আবু বকর (রা.) তাকে বাহরাইনের গভর্নর নিযুক্ত করেন। জীবনের শেষ প্রান্তে তিনি বসরায় বসবাস শুরু করেন। ৯৩ হিজরীতে (৭১১ খৃ.) তিনি তথায় ইন্তেকাল করেন। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ২২৩৬টি।

হযরত আয়েশা (রা.): তিনি ছিলেন রাসুল (সা.) এর প্রিয় বেগম এবং হযরত আবু বকর (রা.) এর কন্যা। তিনি সাড়ে ৮ বছর রাসুলের (সা.) সাহচর্য পান। তিনি রাসুল (সা.) এর সহধর্মিনীদের মধ্যে সবচেয়ে কমবয়সী মেধাবী ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পান্না ছিলেন। হাদীস ও ফেকাহ শাস্ত্রে তাঁর প্রখর মেধার কথা সর্বজন বিদিত। তিনি ৬৫ বছর বয়সে ৫৭ হিজরীতে পরলোক গমন করেন। তাঁর বর্ণনাকৃত হাদীসের সংখ্যা ১২১০টি।

হযরত ছাদ ইবনে মালিক আল খুদরী (রা.): তিনি আসহাবে ছোফফার একজন ছিলেন। তিনি আনছার ছিলেন এবং রাসুলের ওফাত পর্যন্ত তাঁর খেদমতে ছিলেন। সর্বক্ষণ কোরআন ও হাদীস অধ্যয়নে তিনি ব্যস্ত থাকতেন। হিজরী ৭৪ সালে তিনি মৃত্যু বরণ করেন। তিনি সর্বমোট ১১৭০টি হাদীস বর্ণনা করেন।

হযরত আবু জর আল গিফারী (রা.): তিনি নিলোর্ভ অতি সদাশয় মানুষ হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁর প্রকৃত নাম জুনদুব ইবনে জুনাদা। তিনি ২৮১টি হাদীস বর্ণনা করেন। বোখারী ও মুসলিম শরীফে তাঁর ৩১টি হাদীস লিপিবদ্ধ আছে। তিনি ৩২ হিজরীতে (৬৫২ খৃ.) ইন্তেকাল করেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আল্ আছ: তিনি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমরের (রা.) ন্যায় হযরত ওসমান (রা.) এর নিহত হওয়ার পর গৃহযুদ্ধকালীন সময় সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ছিলেন। তিনি রাসুল (সা.)এর হাদীস লিখে নিতেন এবং এক হাজার হাদীস আল সাদিক্বাহ নামক গ্রন্থে সংগ্রহ করেন। তিনি ৬৩ হিজরী/৬৮৩ খৃ. বা ৭৩ হিজরী/৬৯২ খৃ. ওফাত পান বলে মনে করা হয়। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ৭০০টি।

হযরত উম্মে সালমা: রাসুল (সা.)এর বিবিদের মধ্যে তিনি একজন। তিনি খুবই ধার্মিক ও জ্ঞান আহরণে আগ্রহী ছিলেন। তাঁর নিকট হযরত আয়েশা, ইবনে আব্বাস ও জয়নাব (রা.)হাদীস শিক্ষা লাভ করেন বলে কথিত আছে। তিনি ৩৭৮টি হাদীস বর্ণনা করেন।

হযরত জাবীর ইবনে আবদুলাহ: তিনি প্রথম যুগে ইসলাম গ্রহণকারী আনছারদের মধ্যে একজন। তিনি রাসুল (সা.) এর সাথে জেহাদে অংশ নিয়েছিলেন। তিনি হিজরী ৭৪/৬৯৩ খৃ. ৯৩ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ১৫৪০টি।

হাদীস প্রশিক্ষণ

প্রথম যুগে সাহাবীগণ এবং প্রবীন তাবেয়ীনগণ রাসুলুল্লাহ (সা.) এর হাদীস শিক্ষার ব্যাপারে চারটি উপায় অবলম্বন করেন। প্রশিক্ষণ লাভ ও হেফজ করণ, উহার লিখন, শিক্ষাদান ও তদনুযায়ী আমল করণ। এ যুগে এবং ইতিপূর্বে হাদীসের লিপিবদ্ধ করণ প্রচলিত ছিল। কিন্তু হাদীস সংকলন তখনো আরম্ভ হয়নি।

হাদীস লিপিবদ্ধ করণ

হাদীস লিপিবদ্ধ করনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় উহা তিন স্তর অতিক্রম করেছে। কিতাবত বা লিখন, তাদবীন বা সংকলন ও তাসনীফ বা সম্পাদন।

হাদীসের লিখন রাসুলুল্লাহ (সা.) এর যুগ থেকে শুরু হয়। একাদশ হিজরীর প্রথম দিকে ইয়েমেন ও বাহরাইন থেকে সিরিয়া পর্যন্ত দশ লাখ বর্গমাইল এলাকা ইসলামের পতাকাতলে আসে। এ বিরাট রাষ্ট্রের শাসন উপলক্ষে এক বিস্তীর্ন এলাকার সরকারী প্রতিনিধিগণকে শাসনকার্য পরিচালনার নীতিমালাও নির্দেশ রাসুল (সা.) লিখিতভাবে প্রেরণ করেন। তদুপরি পাশ্ববর্তী রাজরাজড়াদের সহিতও তিনি বহু পত্র বিনিময় করেন এবং বিভিন্ন গোত্রের সাথে বিভিন্ন চুক্তিও সম্পাদন করেন। তার প্রথম দৃষ্টান্ত আমরা দেখতে পাই মদীনা চুক্তির মাধ্যমে যাহা মুহাজির আনসার তথাকার ইহুদী এবং অন্যান্য আরবদের সাথে বায়ান্ন দফা সম্বলিত একটি শাসনতন্ত্র। এই শাসনতন্ত্র ছিল নিয়মিতভাবে লিখিত। সম্ভবত: ইহাই পৃথিবীর প্রথম লিখিত শাসনতন্ত্র যাহা এভাবে বর্ণিত হয়েছে।

অর্থাৎ- "ইহা নবী রাসুল মোহাম্মদ (সা.) এর তরফ থেকে একটি দলিল যা কোরেশদের মোমেন মুসলমান এবং মদীনাবাসী এবং যারা তাদের অনুসরণ কওে সংযুক্ত হবে তাদের মধ্যে সম্পাদিত হল।" এ ছাড়া এ নাগরিক রাষ্ট্রের সীমানা চিহ্নিত করা হয়েছিল এবং মদীনায় অবস্থিত মুসলমানদের লিখিত পরিসংখ্যানও গ্রহণ করেছিলেন। হযরত হুজাইফা (রা.) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) আমাদের প্রতি নির্দেশ দিয়েছিলেন এ যাবত যে সব লোক মুসলমান হয়েছে তাদের একটি ফিরিস্তি আমাকে দাও। আমরা ১৫০০ লোকের একটি ফিরিস্তি তাঁর নিকট দাখিল করি।" হোদায়বিয়ার সন্ধি যা কোরেশদের সাথে লিখিতভাবে সম্পাদিত হয়েছিল তা ইতিহাস প্রসিদ্ধ ঘটনা। এ ছাড়া রাসুল (সা.) নিম্নলিখিত চুক্তিগুলো বিভিন্ন গোত্রের সাথে সম্পাদন করেন-

১। দ্বিতীয় হিজরীতে বনু জামরার সাথে চুক্তি।

২। খন্দকের যুদ্ধের সময় বনু ফাজাহ ও গাতফান গোত্রের সাথে চুক্তি।

৩। নাজরানের খৃষ্টানদের সাথে চুক্তি।

৪। বনু সাক্কিফের সাথে চুক্তি।

৫। হাজরবাসীদের সাথে চুক্তি।

উপরোল্লিখিত চুক্তি ছাড়াও আরো বহু চুক্তি, আমালনামা, ভূমিদান পত্র লিখিতভাবে দেওয়া হয়েছিল। মিসরের শাসনকর্তা মাকাওয়াকাসের নিকট লিখিত পত্রখানি ১৮৯৫ খৃঃ মিসরের এক মোতাওয়াল্লীর নিকট পাওয়া যায়। যা রাসুলুল্লাহ (সা.) কর্তৃক লিখিত আসল পত্র বলে বিশেষজ্ঞগণ মত প্রকাশ করেন। ডা. হামিদুল্লাহ আল ওছায়েকুছছিয়াছিয়াহ পুস্তকে এর প্রতিলিপি প্রকাশ করেছেন। কাইজারের নিকট লিখিত রাসুলুলল্লাহ (সা.) এর পত্রখানি সম্প্রতি (১৯৬২ সালের নভেম্বর মাসে) মিঃ হেনরী লুজের ব্যক্তিগত পাঠাগারে পাওয়া গেছে। ইহা ১৫ ইঞ্চি লম্বা ও ৮ ইঞ্চি চওড়া কোমল চামড়ার উপর লিখা রাসুলের সিল মোহর সন্নিবেশিত। এ চিঠিখানি মধ্য ভাগে দ্বিখন্ডিত অবস্থায় পাওয়া যায় যা ক্বেছরা কর্তৃক দিখন্ডিত হয়েছিল। বোখারীতে বর্ণিত আছে মক্কা বিজয়ের দিন দন্ডবিধি ও মানবাধিকার সম্বন্ধে রাসুলুল্লাহ (সা.) এক দীর্ঘ খুতবা দেন। খুতবা শুনে ইয়েমেনবাসী আবু শা' (রা.) নামীয় সাহাবী বলেন, হুজুর! ইহা আমাকে লিখে দিন। তখন হুজুর (সা.) অপর সাহাবীদের বলেন তোমরা উহা আবু শাহকে লিখে দাও। মোট কথা রাসুলুল্লাহ (সা.) এর জামানায় সরকারীভাবে যেমন দাওয়াত নামা, হেদায়েতনামা, নির্দেশ পত্র, চুক্তি পত্র ইত্যাদি লিখা হয়েছিল তার সংখ্যা নিতান্তই কম না। ডাঃ হামিদুল্লাহ তার পুস্তকে এ জাতীয় ১৪১টি চুক্তি পত্রের বিবরণ দিয়েছেন। এ সবগুলোই রাসুলুল্লাহ (সা.) এর হাদীসের অন্তর্ভূক্ত।

রাসুলুল্লাহ (সা.) এর যুগে বহু সাহাবাদের তার অনুমতিক্রমে হাদীস লিখে নেওয়ার বহু প্রমাণ রয়েছে। হুজুর (সা.) এর ওফাতের পর সাহাবী ও তাবেয়ীনগণ হাদীস মুখস্ত করার সাথে সাথে তা লিপিবদ্ধ করতেন। দারামীতে বর্ণিত আছে হযরত আব্দুলাহ বিন আমর (রা.) রাসুলুল্লাহ (সা.) এর নিকট হাদীস লিখার অনুমতি চেয়ে বলেন, হুজুর আমি আপনার হাদীস বর্ণনা ও প্রচার করার ইচ্ছা রাখি, অতএব আমি আমার হেফজকরণের সহিত হাতের লিখার সাহায্য নিতে চাই। অনুমতি দিয়ে রাসুলুল্লাহ (সা.) বললেন, যদি আমার হাদীস হয় তাহলে হেফজকরণের সহিত হাতের লিখার সাহায্য নিতে পার। (দারামী পৃঃ১১৬/১ম খন্ড)

হাদীস লিখনে নিষেধাজ্ঞা সম্বন্ধে বক্তব্য

ইতোপূর্বে বর্ণিত আলোচনা থেকে নিঃসন্দেহে বুঝা যায় রাসুলুল্লাহ (সা.) সাহাবীদেরকে হাদীস লিখে রাখতে অনুমতি দিয়েছিলেন। কিন্তু মুছনাদে আহমেদ ও মুসলিম গ্রন্থে এমন দুটি হাদীস নিবদ্ধ করা হয়েছে যাতে হাদীস

লিখনের উপর রাসুলুল্লাহ (সা.) নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন। বর্ণিত আছে "আমার নিকট কোরআন ব্যতীত আর কিছু লিখবেনা যে ব্যক্তি আমা হতে কোরআন ব্যতীত অন্য কিছু লিখে থাকবে তা মুছে ফেল।" মুছনাদে আহমাদে আবু ছায়ীদ আল খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত আছে- "আমরা রাসুলুল্লাহ (সা.) এর খেদমতে যা শুন্‌তাম তাই লিখে নিতাম। এ অবস্থায় একদিন হুজুর (সা.) জিজ্ঞাসা করেন তোমরা কি লিখছ? আমরা বললাম- যা আপনার নিকট শুনছি তাই লিখে নিচ্ছি।' ইহা শুনে রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, আল্লাহর কিতাবের সাথে আবার কিতাব। আল্লাহর কিতাব অবিকৃত রাখ। অতঃপর আমরা যা লিখেছিলাম তা একত্রিত করে জ্বালিয়ে দিলাম। তারপর আমরা জিজ্ঞাসা করলাম হুজুর আমরা কি আপনার হাদীস বর্ণনা করতে পারি? এতে আপত্তি নেই তবে মনে রেখ যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে আমার নামে মিথ্যা কথা বলে তার স্থান জাহান্নামে তৈরী করে নিও। মোহাদ্দেসগণ উভয় প্রকার বর্ণনার এভাবে মীমাংসা করে দিয়েছেন। যেমনঃ

(ক) কোরআন ও হাদীস মিশ্রিত হয়ে যেন বিভ্রান্তির সৃষ্টি না করে সেজন্য যখন কোরআন নাজিল হচ্ছিল এবং নিয়মিতভাবে লিখিত হচ্ছিল তখন হাদীসের লিখন নিষেধ করা হয়েছিল অন্য সময়ের জন্য অনুমতি ছিল।

(খ) রাসুলুল্লাহ (সা.) তাঁর হাদীসকে কোরআনের সাথে একসাথে লিখতে নিষেধ করেছিলেন।

(গ) নিষেধ প্রথমে করা হয়েছিল পরে তা রহিত করে অনুমতি দেওয়া হয়।

(ঘ) লিখার নিষেধাজ্ঞা শুধু সে সকল সাহাবীদের জন্য ছিল যাদের লিখার উপর নির্ভর করে হেফজ ত্যাগের আশংকা ছিল। যাদের পক্ষে আশংকা ছিল না তাদের জন্য অনুমতি ছিল। ইমাম বোখারী প্রমুখ বিশেষজ্ঞদের মতে আবু সাঈদ আল খুদরী বর্ণিত হাদীসটি তার নিজেরই উক্তি। মোটেও রাসুল (সা.) এর হাদীস নয় (ফতহুল বারী পৃঃ১৬৮/১ম খন্ড) ইমাম ইবনুছ ছালাহ বলেন, লিখার অনুমতি সম্ভবত সে সকলের জন্য ছিল যাদের পক্ষে ভুলে যাওয়ার আশংকা ছিল এবং নিষেধাজ্ঞা তাদের উপর ছিল যাদের স্মরণ শক্তির উপর নির্ভর করা যায়। যাতে করে তারা যেন লিখার উপর নির্ভর করে স্মরণ শক্তি হারিয়ে না ফেলে বা রাসুলুল্ল-াহ (সা.) হাদীস লিখার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ সে সময়ে করেছিলেন যখন কোরআনের সহীফার সাথে সংমিশ্রনের আশংকা ছিল

(মুকাদ্দামা)। এছাড়া হতে পারে রাসুলুল্লাহ (সা.) নিয়মিতভাবে হাদীস লিখা নিষেধ করেছিলেন, কারণ তিনি তাঁর পয়গম্বরী দুরদৃষ্টিতে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন; যদি তাঁর হাদীস সমূহ কোরআনের ন্যায় সমানভাবে এবং সমান গুরুত্ব সহকারে লিখা হয় পরবর্তীকালে তাঁর অনুসারীগণ তাঁর হাদীসকে কোরআনের মর্যাদা দান করবে। রাসুলুল্লাহ (সা.) এর মন্তব্য আকিতাবুন মাআ কিতাবিল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহর কোরআনের সাথে আবার অন্য কোরআন এ থেকেও তা বুঝা যায়। মাওলানা মোনাজের আহসান গীলানী তার তাদ্‌বীনে হাদীস নামক গ্রন্থে উপরোক্ত কারণের উপর অধিক গুরুত্ব দেন।

দ্বিতীয় যুগ

এ যুগ তাবেয়ীন, তবে তাবেয়ীনদের যুগ। হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে তৃতীয় শতাব্দির প্রথম পাদ পর্যন্ত সময়কে দ্বিতীয় যুগ ধরা হয়। এ যুগে হাদীসের হেফজকরণ এর সাথে লিখন (কিতাবাত) সংকলন (তাদবীন) ও সম্পাদনার (তাসনীক) কাজ ব্যাপকভাবে অব্যাহত থাকে। প্রথম যুগে আমরা শুধু দেখতে পাই হেফজকরণ ও লিখন। হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজীজের আদেশক্রমে সর্বপ্রথম হাদীস সংকলনের কাজ ইবনে শেহাব জোহরী আরম্ভ করেন।

মুসনাদে ইবনে আহমদ হাম্বেলী এ যুগে সংকলিত হয়, সংগৃহীত হয় ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান, আইন, ভবিষ্যৎবাণী ইত্যাদি। এ গ্রন্থে ছহীহ বলে বিবেচনাযোগ্য সব হাদীস একত্রিত এজন্য করা হয়েছিল তা যেন সমকালীন মানুষের আলোচনার ভিত্তি হতে পারে। মনোনীত হাদীসগুলো কোনো বিশেষ মতবাদের সমর্থনের জন্য লিপিবদ্ধ হয়নি। সব হাদীসগুলো বিশুদ্ধও ছিল না। মোছনাদ পদ্ধতিতে এ কিতাবের গ্রন্থনা পাঠকের জন্য এ হাদীস গ্রন্থ অধ্যায়ন বেশ কষ্টসাধ্য। কারণ হাদীসগুলোতে প্রথম বর্ণনাকারী সাহাবীদের নামানুসারে বিন্যাস্ত করা হয়। হযরত আবু বকর, ওমর, ওসমান, আলী (রা.) ও প্রবীন সাহাবীদের মোছনাদ এতে অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং তা আনসার, মক্কাবাসী, কুফা, বসরা ও সিরিয়াবাসীদের মোছনাদের সাথে শেষ করা হয়। হাদীস ও সনদ গ্রহণের ব্যাপারে ইবনে হাম্বলের নীতি কঠোর ছিলনা তাই তাঁর মোছনাদে এমন সব হাদীস স্থান পায় যা পরবর্তীকালের বহু মোহাদ্দেস তা জাল বা বাতিল বলে ঘোষণা করেন এবং তার বহুরাবী নির্ভরযোগ্য নয় বলে ঘোষিত হয়।

এ যুগের কয়েকজন মনিষী

ইমাম মালেক (৯৩-১৭৯ হি. ৭৯৫ খৃ.): আবু আবদুল্লাহ ইবনে আসাদ ইছবিহী মাদানী মদীনায় জন্ম গ্রহণ করেন এবং মদীনায় সমস্ত জীবন অতিবাহিত করেন।

একবার মাত্র তিনি মক্কায় হজ্ব করতে যান। তিনি একজন তাবে তাবেয়ীন, তাবেয়ীনের ছাত্র। তিনি হযরত নাফে মুহম্মদ বিন মুনকাদর, ইমাম জুহরী ও অন্যান্য তাবেয়ীন তাবে তাবেয়ীনের নিকট হাদীস শিক্ষা নেন। প্রসিদ্ধ হাদীস গ্রন্থ মোয়াত্তা তাঁর রচিত। তিনি ছিলেন অসাধারণ মনীষা সম্পন্ন ব্যক্তি। কথিত আছে রাসুলুল্লাহ (সা.) এর কবর জিয়ারত উপলক্ষে খলিফা হারুনুর রশিদ কিছু দিন মদীনায় অবস্থান করেন। তখন তিনি ইমাম মালেককে অনুরোধ করেন যেন তিনি তাঁর ছেলে দুজনকে তাঁর ঘরে এসে শিক্ষা দান করেন। তার উত্তরে ইমাম সাহেব বলেন আল্লাহ এলেমকে সম্মানিত করেছেন আপনি সেটাকে অপমানিত করবার চেষ্টা করবেন না। অতঃপর খলিফার দুই পুত্র আমিন ও মামুনকে তার বাড়ি গিয়ে শিক্ষা নিতে হয়। ইমাম মালেক ১৭৯ হি. মদীনায় জান্নাতবাসী হন এবং জান্নাতুল বাকীতে সমাধিস্থ হন।

ইমাম শাফেয়ী (১৫০-২০৪ হি. ৭৬৭-৮২০ খৃ.): ইমাম আবু আবদুলাহ মোহাম্মদ ইবনে ইদ্রিস শাফেয়ী ১৫০ হিজরীতে দক্ষিণ ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যাকায় জন্মগ্রহণ করেন। কেউ আবার তাঁর জন্ম মক্কায় মীনায় বলে বর্ণনা করেছেন। বাল্যকাল তিনি মক্কায় অতিবাহিত করেন। তিনি অসাধারণ মেধাবী ছিলেন। মাত্র সাত বছর বয়সে তিনি কোরআন শরীফ হেফজ করেন। তিনি মক্কায় মুফতীয়ে আজমের নিকট ফেকাহ শাস্ত্র অধ্যায়ন করেন। জ্ঞানের অন্বেষনে তিনি বহু দুরবর্তী এলাকা ভ্রমণ করেন। মদীনায় তিনি ইমাম মালেকের নিকট শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং পরবর্তীকালে বাগদাদে ও মিসরে যান। মিসরেই তিনি শেষ জীবন অতিবাহিত করেন। তাঁর কবর মিসরে অবস্থিত। ফেকাহ শাস্ত্রে তাঁর যুগে কেহই তাঁর সমকক্ষ ছিলনা। ইমাম শাফেয়ী ১১৪টি গ্রন্থ রচনা করেন তন্মধ্যে "কিতাবুল উম্ম" সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। মুছনাদ তার স্বতন্ত্র হাদীসের কিতাব।

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল: ইমাম আবু আবদুলাহ ইবনে হাম্বল বাগদাদে ১৬৪ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাথমিক শিক্ষা লাভের পর তিনি হাদীসের

অন্বেষনে কুফা, বসরা, মক্কা, মদীনা, সিরিয়া ইরাক ও তবরীজ সফর করেন। ইমাম শাফেয়ীর বাগদাদ অবস্থানকালে তিনি তাঁর খেদমতে সর্বদা উপস্থিত থাকতেন। বোখারী মুসলিম ও আবু দাউদ প্রমুখ ইমামগণ তাঁর থেকে হাদীস রেওয়ায়াত করেন। মোতাজিলাদের কতক ভ্রান্ত মতবাদ অস্বীকার করায় আব্বাসীয় খলীফা মোতাসিম বিলাহ্ কর্তৃক কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন এবং নির্যাতিত হন। তাঁর মুছনাদে ৩০০০০ এর অধিক হাদীস স্থান পায়। মুছনাদ সমুহের মধ্যে তাঁর কিতাবই সর্ববৃহৎ ও সর্বাপেক্ষা বিশ্বাসযোগ্য। তিনি হাম্বলী ফিকাহর প্রতিষ্ঠাতা বাগদাদে ২৪১ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

তৃতীয় যুগ

তৃতীয় শতাব্দির দ্বিতীয় পাদ থেকে পঞ্চম শতাব্দির শেষ পর্যন্ত ইহা প্রায় তিন শতাব্দির যুগ। এ যুগকে হাদীসের স্বর্ণযুগ বলা হয়। এ যুগে বহু সংখ্যক হাফেজে হাদীস, হুজ্জত ও হাকেমুল হাদীসের আবির্ভাব হয়।

হাফেজে হাদীসঃ সনদের সম্যক অবস্থানসহ যার একলক্ষ হাদীসের সনদ মুখস্থ আছে তাকে হাফেজে হাদীস বলা হয়। যার ৩ লক্ষ হাদীস (সনদ) মুখস্থ তাকে হুজ্জত এবং তাঁর সময় পর্যন্ত প্রচলিত সব হাদীসের অবস্থা যাদের জানা ছিল তাদেরকে হাকেমুল হাদীস বলা হয়। বহু সংখ্যক হাদীসের গ্রন্থ এ যুগেই রচিত হয়। ছিহাহ ছিত্তাহ বোখারী মোসলেম, তিরমিজি, নাসাঈ, আবু দাউদ, ইবনে মাজা ছয়টি বিশুদ্ধ হাদীস গ্রন্থ এ যুগেই সম্পাদিত হয়। ছহিহ ও গায়েরে ছহিহ (শুদ্ধ ও অশুদ্ধ) হাদীসের এ যুগেই চুড়ান্ত যাচাই বাছাই করা হয়। হাদীস, সাহাবা ও তাবেয়ীগনের আছার পৃথকীকরণ করা হয়। সমস্ত হাদীস বর্ণনাকারীদের নিকট হতে সংগৃহীত হয় এবং গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ হয়। অত:পর এমন কোন হাদীস রয়েছে বলে মনে হয় না যা কোন হাদীস গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয়নি।

এ যুগের কয়েকজন প্রসিদ্ধ মোহাদ্দেছ ও তাঁদের গ্রন্থাবলী

ইমাম বোখারী (১৯৪-২৪৫ হি. ৮১০-৮৭০ খৃ.)

ইমাম আবু আবদুল্লাহ মোহাম্মদ ইবনে ইসমাইল বোখারী উজবেকিস্তানের বোখারা নগরে জন্মগ্রহণ করেন। ইমাম বোখারী অসাধারণ মেধা সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ১৬ বছর বয়সে আবদুলাহ্ ইবনে মোবারকের ও ইমাম তকী ইবনে জাররাহ্র হাদীসের কিতাব সমুহ মুখস্ত করেন। ১৮ বছর বয়েসে তিনি কিতাব লিখতে আরম্ভ করেন। জামে উছ ছহিহ ব্যতীত তিনি আরো বহু

কিতাব লিখেন। তাঁর বর্ণনামতে হাদীস শিক্ষার জন্য আমি বিভিন্ন দেশ ভ্রমন করেছি। দুবার মিসর ও সিরিয়ায় এবং চারবার বসরায় গিয়েছি। একাধারে ছয় বছর আমি হেজাজ (মক্কা ও মদীনায়) অবস্থান করেছি এবং বহুবার বাগদাদে সফর করেছি। আমি এক হাজার আশিজন শায়েখের নিকট হাদীস শিক্ষা নিয়েছি। এভাবে ছয় লক্ষ হাদীস সংগ্রহ করে উহা থেকে জামে উসসহীতে অতি অল্প সংখ্যক হাদীস স্থান দিয়েছি এবং বহু ছহী হাদীসকেও বাদ দিয়েছি।

ইমাম বোখারী ধনবান ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও সাধারণভাবে জীবন যাপন করতেন। তাঁর সম্পদ তিনি শিক্ষার্থী ও দরীদ্রদের জন্য ব্যয় করতেন। কথিত আছে যে, তিনি ৪০ বছর যাবত রুটির সাথে কোন তরকারী ব্যবহার করেননি। কোন কোন সময় তিনি মাত্র ২/৩টি বাদাম খেয়ে দিনযাপন করতেন। একবার বোখারার শাসক তার নিকট অনুরোধ করলেন, "আপনি আপনার জামেউসসহীহ ও তারিখে কবীর আমাকে পড়িয়ে শোনান" উত্তরে ইমাম বোখারী জানালেন "আমি এলেমকে বেইজ্জত করতে পারিনা। যার প্রয়োজন সে আমার এখানে এসে শুনে যেতে পারে।" অন্যদের মতে শাসনকর্তা তার ছেলেদের পড়াবার জন্য সময় চেয়েছেন যখন অন্য কেউ থাকতে পারবে না। শাসনকর্তার অনুরোধ প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় তিনি ইমাম বোখারীর উপর অসন্তুষ্ট হয়ে তাকে বোখারা ত্যাগের নির্দেশ দেন। তিনি বোখারা ত্যাগ করে সমর খন্দের খরজং নামক স্থানে চলে যান এবং তথায় ইন্তেকাল করেন।

বোখারী শরীফের পূর্ন নাম আল জামেউস ছহীহুল মোছনাদ মিন আহাদিসে রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম ওয়া আয়্যামিহী ওয়া ওকাইহী- সংক্ষেপে "ছহীহ বোখারী" নামে পরিচিত। কথিত আছে একদিন তাঁর ওস্তাদ ইমাম ইছহাক ইবনে রাওয়াইহ আক্ষেপ করে বলেন "আহাঃ! কেউ যদি ছহীহ হাদীস গুলো একত্র করে দিত। অতএব তিনি এ গ্রন্থ রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। মক্কায় মসজিদে হারামে এসে এর মুসাবিধা করেন এবং মসজিদে নববীতে বসে ইহার চুড়ান্ত রূপ দেন। প্রতিটি হাদীস লিপিবদ্ধ করার পূর্বে প্রথমে ইস্তেখারা এবং গোছল করে দুরাকাত নফল নামাজ পড়তেন।

ইমাম বোখারীর জামে উছ ছহীহ এর বৈশিষ্ট: এ রচনায় তাঁর ১৬ বছর সময় অতিবাহিত হয়। তিনি ছয় লক্ষ হাদীস থেকে ৭৩৯৭টি হাদীস গ্রহণ

করেন। পুনরাবৃত্তি বাদ হাদীসের মোট সংখ্যা দাঁড়ায় ৪ হাজার। তিনি ষোল বছর হাদীসের যাচাই বাছাইতে ব্যয় করেন। এ গ্রন্থটা ৯৭ খন্ডে ৩৪৫০ অধ্যায়ে লিখিত হয়। প্রত্যেক অধ্যায়ের প্রারম্ভে মূল বক্তব্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ শিরোনাম দেন যা সে অধ্যায়ে বর্ণিত হাদীসের বক্তব্য সম্বন্ধে ইঙ্গিত করে। মুছান্নাফ পদ্ধতিতে সংকলিত এ গ্রন্থ বিষয় ভিত্তিক বিন্যাস্ত করা হয়। তিনি প্রতি অধ্যায়ের প্রারম্ভে এবং হাদীস বর্ণনার শেষে নিজের মন্তব্য যুক্ত করেন। কখনো তাঁর মন্তব্য হাদীসে ব্যবহৃত শব্দের ব্যাখ্যা হিসেবে বর্ণিত হয়। তিনি কখনো বিভিন্ন ইসনাদ বর্ণনা করেন যাতে শব্দের কিছুটা তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। কখনো তিনি এক ধরণের বর্ণনাকারীর বাড়তি বর্ণনার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি দুর্বল হাদীসের উপরও মন্তব্য রাখেন।

ইমাম মুসলিম (রা.)২০৬হি./২৬

ইমাম মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ ইবনে মুসলিম কোশাইরী নিশাপুরী (রা.)প্রাচীন খোরাসানের নিশাপুরে জন্ম গ্রহণ করেন এবং সেখানেই ইন্তকাল করেন। প্রাথমিক শিক্ষা শেষে তিনি হাদীসের তালাসে বিভিন্ন শহর ভ্রমন করেন। ইমাম বোখারী যখন নিশাপুরে যান তখন তিনি তাঁর নিকটও শিক্ষা গ্রহণ করেন। লক্ষাধিক হাদীস থেকে বাছাই করে তিনি মাত্র ৪০০০ হাদীস (পুনরাবৃত্তি ছাড়া) তাঁর গ্রন্থ ছহীহ মুসলিমে সন্নিবেশিত করেন। এ গ্রন্থে হাদীস বিন্যাস সত্যই অপূর্ব। তিনি প্রত্যেক বিষয়ের সমস্ত হাদীসের খুটিনাটি যাচাই বাছাই করে হাদীসের পারস্পরিক স্থান নির্ধারণ করেন। বিশুদ্ধতায় বোখারী শরীফ প্রথম এবং হাদীসের বিন্যাসে মুসলিম শরীফ প্রথম।

ছহীহ মুসলিম গ্রন্থের বৈশিষ্ট: এ গ্রন্থে ৭ হাজার হাদীস ৩ লক্ষ হাদীস থেকে বাছাই করে সংযোজন করা হয়। ৫২ খন্ডে এ গ্রন্থ রচিত হয়। ইমাম বোখারীর মত তিনিও কিছু কিছু হাদীসের সাথে স্বতন্ত্র মন্তব্য যোগ করেন। প্রত্যেক অধ্যায়ের সূচনায় তিনি পরিচিতিমূলক অধ্যায় যোগ করেন যাতে তিনি তাঁর গৃহীত মানদন্ডের মূলনীতি বর্ণনা করেন। মোছান্নাফ (বিষয় ভিত্তিক) পদ্ধতিতে লিখিত এ গ্রন্থে কোরআনের তফসীর অসম্পূর্ণ ও অসংগঠিতভাবে লিখার দরুন তাকে জামে হিসানে গণ্য করা হয়না যা বোখারীর জন্য প্রযোজ্য।

আবু দাউদ (২০২-২৭৫হি./৮০৭-৮৮৮খৃ.)

ইমাম আবু দাউদ ইবনে আশআছ সিজিস্থানী পূর্ব ইরানের সিস্তানে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি হাদীস শিক্ষার্থে খোরাসান ইরাক সিরিয়া ও মিশর সফর করেন। বাগদাদে বসেই তিনি তার "ছুনানে আবু দাউদ" রচনা করেন। তিনি তাঁর সংগৃহীত ৫ লক্ষ হাদীস থেকে মাত্র সাড়ে চার হাজার হাদীস এ গ্রন্থে স্থান দেন। এতে ছহীহ হাদীস এবং তৎনিম্ন পর্যায়ের হাদীসও রয়েছে। কোনো হাদীসের সনদের দুর্বলতা থাকলে তিনি তাও ব্যক্ত করেন।

কিতাবুস সুনানের বৈশিষ্ট্যঃ এ গ্রন্থে শুধু আহকাম সম্বন্ধীয় হাদীস স্থান পেয়েছে। এর আলোচ্য বিষয় শুধু আইন সম্বন্ধীয়। তিনি ইসনাদের উপর মন্তব্য রাখেন যাতে বিভিন্ন বর্ণনার ধরণ উল্লেখপূর্বক তার নিকট কোন "ইস্‌নাদ" বিশেষভাবে বিশ্বস্ততা ব্যক্ত করেন। তিনিও বার বার হাদীসের মূল বক্তব্যের উপর মন্তব্য লিখেন যা কখনো বিশ্লেষণমূলক। যখন সনদে কোনো বর্ণনাকারীর শুধু কুনিয়াহ বা নিস্‌বাহ্ বর্ণনার দরুন তাকে চিহ্নিত করা দুরূহ হয় তখন তিনি তার মন্তব্যে বর্ণনাকারীর পুরো নাম বর্ণনা করেন। কখনোও তিনি কোনো হাদীসে বিশেষ কোনো এলাকার মানুষের জন্য প্রযোজ্য বলেও মন্তব্য করেন। তাঁর গ্রন্থে দুর্বল ও বাতিল হাদীসও স্থান পায়- তিনি তারও উল্লেখ করেন।

ইমাম তিরমিজি (২০৯-১৭৯হি.)

ইমাম আবু ঈসা তিরমিজি উত্তর ইরানের তিরমিজ নামক স্থানে জন্ম গ্রহণ করেন। হাদীসের অন্বেষনে তিনি বিভিন্ন দেশ সফর করেন। ইমাম বোখারীর নিকট হাদীস শিক্ষা নেন। তাঁর কিতাব আল জামে ছেহাহ্ সিত্তাহর অন্যতম গ্রন্থ। এ গ্রন্থে তিনি সনদের জরহ ও তাদিল বা দোষ গুন বিচার সম্বন্ধে যে পদ্ধতি অবলম্বন করেন অন্য কেউ তা করেননি। তিনি হাদীস ফিকাহ্ দুটিতে সমান পারদর্শী ছিলেন। তার গ্রন্থ জামেয়ে তিরমিজি ব্যাপকতায় বোখারীর, বিন্যাসে মুসলিমের এবং আহকাম বর্ণনায় আবু দাউদের সমপর্যায়ের। এ ছাড়াও নিম্ন বর্ণিত বৈশিষ্ট সমূহ রয়েছে।

ক। এই গ্রন্থে পুনরাবৃত্তি (তাকবার) প্রায়ই নেই। এর বর্ণনা সরল সংক্ষেপ এবং প্রাঞ্জল।

খ। এতে আবশ্যক মত ফকীহদের মাজহাবের প্রতিও ইঙ্গিত করা হয়েছে এবং কিরূপে হাদীস হতে ফিকাহ গৃহীত হয় তার নিয়মও বলা হয়েছে।

গ। এতে হাদীস সমূহের স্তর ও প্রকার ভেদসহ কোন্‌টি কোন রকমের হাদীস তা বলা হয়েছে।

ঘ। এতে রাবীদের নাম, লকব, কুনিয়াত প্রভৃতি দ্বারা তাদের সুস্পষ্ট পরিচয় দেওয়া হয়েছে।

জামেয় তিরমিজির বৈশিষ্ট্যঃ ইমাম তিরমিজি হাদীস শাস্ত্রের জন্য কিছু পরিভাষা প্রণয়ন করেন। হাদীসের পরিভাষা সৃষ্টি তাঁরই কৃতিত্ব। তিনি তাঁর গ্রন্থে বর্ণিত প্রত্যেক হাদীসের উপর মন্তব্য রাখেন। তাঁর নিজের পরিভাষা ব্যবহার করে হাদীসের বিশ্বস্ততার পরিমাপ বর্ণনা করেন। কখনো হাদীসের সাথে শুধু পরিভাষা যোগ করেন যেমন হাদীসটি ছহিহ বা হাসান ইত্যাদি। তিনি ইসনাদের উপর ও সমালোচনামূলক বক্তব্য রাখেন। তাঁর গ্রন্থে ইসনাদের দূর্বলতার উপরও এক অধ্যায় সংযুক্ত করেন যাতে বর্ণনাকারীদেরকে কিভাবে যাচাই করা হবে তা আলোচনা করেন। কিছু রাবীর বিশ্বস্ততার উপর বিভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেন। এ গ্রন্থে মোট ৩৮১২টি হাদীস সন্নিবেশিত হয়েছে।

ইমাম নাসাই (২১৫-৩০৩হি. -৯১৫ খৃঃ)

ইমাম আবদুর রহমান আহমেদ ইবনে শোআইব নাসাই খোরাসানের প্রসিদ্ধ শহর নাসায় জন্মগ্রহণ করেন। শেষ জীবনে বেশীরভাগ সময় তিনি মিসরে অতিবাহিত করেন। শেষ জীবনে তিনি দামেশ্‌কে যান। তিনি বহুদেশ পরিভ্রমণ করেন। ইমাম আবু দাউদ তাঁর একজন শিক্ষক। প্রথমে তিনি ছুনানে কবির নামে হাদীসের বিরাট গ্রন্থ রচনা করেন। অতএব, উহাকে সংক্ষেপ করে আল-মোজ্‌তাবা নাম দেন, যা ছুনানে নাসাই নামে প্রসিদ্ধ। একবার দামেস্কে মোয়াবিয়া পন্থী লোকেরা তাঁকে হযরত মোয়াবিয়ার ফজিলত সম্পর্কে কিছু লিখছেন কিনা জিজ্ঞাসা করলে তিনি না বলে জবাব দেন। তারা তার উত্তরে রুষ্ঠ হয়ে তাঁকে বেদম প্রহার করেন ফলে তিনি গুরুতরভাবে রোগগ্রস্থ হন। তিনি বসরায় (কাহারো মতে মক্কায়) নীত হন এবং ইহধাম ত্যাগ করেন। তাঁর গ্রন্থ ছুনানে নেছায়ীতে ৪৪৮২ টি হাদীস সন্নিবেশিত হয়েছে।

ইমাম ইবনে মাজাহ (২০২-২৭৩ হি. ৮২৪ - ৮৮৬খৃঃ)

আবদুলাহ ইবনে ইয়াজিদ ইবনে মাজাহ কাজবীনি, ইরাক আজম উত্তর পশ্চিম ইরানের কাজবীন নামকস্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হাদীস শিক্ষার জন্য বিভিন্ন এলাকা সফর করেন। তিনি ইমাম লায়েছ ইবনে সাদ হতে শিক্ষা নেন। তাঁর প্রণীত হাদীস গ্রন্থটি হলো ছুনানে ইবনে মাজাহ। এ গ্রন্থে

মোট ৪৩৩৮টি হাদীস রয়েছে। মোতাকাদ্দেমীন বা পূর্ব সুরীগণ এ গ্রন্থকে ছিহাহ সীত্তাহ বা ছয়টি বিশুদ্ধ হাদীস গ্রন্থে শামীল করেননি। আবুল ফজল ইবনে তাহের মাক্‌ছেদ সর্বপ্রথম ইহাকে সিহাহসিত্তায় অন্তর্ভুক্ত করেন। ইহার ৩০টি হাদীস সম্পর্কে ইমাম জাহবী দুর্বল বা জয়ীফ বলে মন্তব্য করেন। ইমাম ইবনে জাওজার মতে এই গ্রন্থে ১৩টি মত্তজু বা অশুদ্ধ হাদীস রয়েছে। উপরোক্ত হাদীস গ্রন্থগুলি ছিয়াহ ছিত্তাহ নামে পরিচিত।

শিয়া মুসলমানদের কয়েকটি হাদীস গ্রন্থ

আল কুলিনী: তাঁর নাম আবু জাফর মোহাম্মদ ইবনে ইয়াকুব আল কুলিনী। তিনি ৩২৮/৯৩৯ খৃঃ বাগদাদে পরলোক গমন করেন। তাঁর গ্রন্থের নাম কিতাবুল উছুল মিনাল কাফী সংক্ষেপে 'আল কাফী' নামে প্রসিদ্ধ। এ গ্রন্থ শিয়াদের নিকট সুন্নীদের বোখারী গ্রন্থের সমপর্যায়ের। এতে ১৬০০০টি হাদীস লিপিবদ্ধ আছে। এ কেতাব ৩ খন্ডে বিভক্ত। প্রথম খন্ডে মূলনীতি বা উসুল বর্ণিত হয়েছে। অপর দু খন্ডে ফারু বা বিস্তারিত আলোচনা ও সম্মিলিত ইসলামী আইনের বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ হয়েছে।

আল তুসী: মোহাম্মদ ইবনে আল হাসান আলতুসী ৪৬০ হি./১০৬৭ খৃ. ইন্তেকাল করেন। তিনি একজন প্রসিদ্ধ ধর্মীয় পন্ডিত ছিলেন। তার হাদীস গ্রন্থের নাম কিতাব 'আল তাহজীব আল আহকাম' তিন খন্ডে লিখিত। প্রথম দু'খন্ডে উসুল সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়। তৃতীয় খন্ডে ফারু বা বিস্তারিত আইন আহকাম আলোচিত হয়। ৯২৫ অধ্যায়ে বিভক্ত এ গ্রন্থে ৫৫১১টি হাদীস বর্ণিত হয়। অপর গ্রন্থ কিতাব আল আবছার ফিমা আখতালাফা ফিহে মিনাল আখবার সংক্ষেপে আল ইসতেবছার, তাহজীব গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ।

আল কুম্মী: মোহম্মদ ইবনে আলা ইবনে আল হোসাইন বাবুইয়্যাহ আল কুম্মী হি. ৩৮১/৯৯১খৃ. মৃত্যুবরণ করেন। শিয়া মতাবলম্বী ৪ জন মোহাদ্দেছদের তিনি একজন। তাঁর প্রণীত কিতাবের নাম কিতাবুন মানলা ইয়াহজুরুল ফিকাহ। এ কিতাবে ফারু নিয়ে আলোচনা করা হয়। শিয়া মতাবলম্বী প্রায় সবগুলো আকিদা এ গ্রন্থের ভিত্তিতে রচিত।

আল কাসী: মোহাম্মদ ইবনে মোরতাজা মোল্লা মহসীন আল কাসী নামে পরিচিত। ১০৯০ খৃ. তিনি মৃত্যুবরণ করেন। উপরি উল্লিখিত ৩টি গ্রন্থকে একত্রে ৩ খন্ডে সম্পাদনা করেন এবং তার নাম কিতাব 'আলওয়াক্‌ত'রাখেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

হাদীস বর্ণনা, সম্পাদন ও সমালোচনা

রাসুলুল্লাহ (সা.) এর হাদীসের জ্ঞান আহরনের জন্য বিদ্যুৎসাহী ব্যক্তিগণ দূর দূরান্তে সফর করেছেন পন্ডিতদের নিকট হতে হাদীস শিক্ষার জন্য। সে সময় শিক্ষকগণ শিক্ষার্থীদের নিকট মুখস্ত হাদীস বর্ণনা করতেন। তখন এমনও প্রচলন ছিল যে, একজন ছাত্র ওস্তাদের সম্মুখে হাদীস পাঠ করতেন অন্য ছাত্র তা শুনতেন। ওস্তাদ প্রয়োজনবোধে পঠিত হাদীসের সংশোধন ও ব্যাখ্যা দিতেন। এভাবে যারা কোনো শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে হাদীস শিক্ষা গ্রহণ করেন তারা পরবর্তীকালে অন্যদের নিকট তা প্রচার করতেন। প্রচলিত বর্ণনা পদ্ধতি এ রকম ছিল (ক) আমাকে বলেছে বা জানিয়েছে (খ) এর সম্মুখে ইত্যাদি ইত্যাদি। ইতোমধ্যে হাদীস সংকলন ও সম্পাদনা আরম্ভ হওয়ায় মৌখিক বর্ণনা একেবারে বন্ধ হয়ে গেল। তখন হাদীসগুলো শুধু লিখে নেওয়া আরম্ভ হয় এবং ওস্তাদের নিকট তার প্রচারের অনুমতি নিয়ে শুধু হাদীসখানা বা অমুক আমাকে বলেছেন বলে প্রচার করা শুরু হয়।

হাদীস সংগ্রহ: ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, ইসলামের প্রাথমিক যুগে হাদীস সংগ্রহ ছিল একটা ব্যক্তিগত উদ্যোগ। এ ব্যাপারে উৎসাহী ব্যক্তিগণ তাদের ব্যক্তিগত উদ্যোগে হাদীস শিক্ষা ও সংগ্রহে ব্রতী হন। পরবর্তীকালে খলিফা হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজিজ (২য় ওমর) এর শাসনকালে তিনি সরকারীভাবে হাদীস সংগ্রহের উদ্যোগ নেন। তিনি তৎকালীন মদীনার প্রসিদ্ধ মোহাদ্দেস আবু বকর ইবনে মোহাম্মদ ইবনে হাজমকে (মৃত্যু ৭১৯) যতদুর সম্ভব হাদীস লিখে নিতে নির্দেশ দেন। বিশেষ করে হযরত আমরাহ বিনতে আবদুর রহমান বর্ণিত সব হাদীস যেন সংগ্রহ করেন। কারণ হযরত আম্‌রাহ বিনতে আবদুর রহমান উম্মুল মোমেনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) বর্ণিত রাসুলের (সা.) হাদীসের সর্বশ্রেষ্ঠ বর্ণনাকারী ছিলেন আর হযরত আবু বকর (রা.) ছিলেন তাঁর আত্মীয় এবং মদীনায় নিযুক্ত কাজী ও বিচারক। ইহা ব্যতিত খলিফা ওমর ইবনে আবদুল আজিজ তাঁর সাম্রাজ্যের বিভিন্ন এলাকার মোহাদ্দেসগণকে হাদীস সংগ্রহের জন্য নির্দেশ পাঠান। বিশেষ করে হযরত ছাদ ইবনে ইব্রাহীম ও হযরত ইবনে শিহাব আলজহরীকে গ্রন্থাকারে হাদীস সংগ্রহের অনুরোধ করেন যাতে করে তাঁর সাম্রাজ্যের সর্বত্র তা প্রচার করা

সম্ভব হয়। খলিফার আদেশ অনুযায়ী বহুসংখ্যক মোহাদ্দেস এ কাজে মনোনিবেশ করেন তাদের মধ্যে নিম্নে বর্ণিত মোহাদ্দেসগণ প্রসিদ্ধ ছিলেন:-

ক। আবদুল মালেক ইবনে আবদুল আজিজ আল জুরায়ইজ (মৃত্যু-১৫০হি.) মক্কায়

খ। মোহাম্মদ ইবনে আবদুল ইমাদ মদীনায় (মৃত ১৫৯হি.)

গ। ছুফিয়ান আল ছাওরী কুফাতে (মৃত্যু ১৬০হি.)

ঘ। সাম্মাদ ইবনে সালমাহ বছরায় (মৃত্যু ১৬৫হি.)

পরবর্তী যুগে বহু হাদীসগ্রন্থ রচিত হয়। তার মধ্যে সিহাহ ছিত্তাহ অন্যতম। এ গ্রন্থগুলো সুন্নী মুসলমানদের নিকট সবচেয়ে বিশ্বস্ত বলে পরিচিতি।

ক। সহীহ আল বোখারী খ। সহীহ মুসলিম

গ। জামে তিরমিজি ঘ। সুনানে আবু দাউদ

ঙ। সুনানে আল নাসায়ী চ। সুনানে ইবনে মাজাহ/মোয়াত্তায়ে মালেক

শিয়া মুসলমানদের তিনটি প্রসিদ্ধ হাদীসগ্রন্থ:

১। আল কাফী ফি ইলমে আলদিন গ্রন্থকার আল কুলীনি (মৃত্যু ৩২৮হি.)

২। কিতাবুন মানলা ইয়াহজরুল ফিকহ গ্রন্থকার আল বাবুইয়াহ আল কুম্মী (৩৮১হি.)

৩। তাহজীব আল আহকাম গ্রন্থকার- আলতুসী (মৃত্যু ৪৬০হি.)

হাদীস গ্রন্থে আলোচিত বিষয়াবলী

নিম্নে বর্ণিত বিষয়াবলী হাদীস গ্রন্থ সমূহে সন্নিবেশিত ও আলোচিত হয়েছে যথা- আকাঈদ, ছিয়ার, তাফসীরে কোরআন, আদাব, আহকাম, বেফাক ও মানাকেব, আকায়েদ বা বিশ্বাস সম্বন্ধীয় আলোচনা। আহকাম বা আইন সম্বন্ধীয় আলোচনা বা ফিকাহ শাস্ত্রের বিষয়াদি আলোচনা। আদাব বা খাওয়া, পানীয়, ভ্রমণ ইত্যাদি সম্বন্ধীয় শিষ্ঠাচার। মারেফাত ও আধ্যাত্মিক বিষয়। তাফসীর বা কোরানের ব্যাখ্যা। তারিখ ও সীয়ার- ইতিহাস, জীবনী সম্বন্ধে আলোচনা। ফিতনা বা ইসলামের প্রাথমিক যুগের সমস্যা আত্মকলহ সম্বন্ধে আলোচনা। ব্যক্তি বা স্থান সম্পর্কে আলোচনা।

যে কোন গ্রন্থে উপরে বর্ণিত একটি মাত্র বিষয় স্থান পেয়েছে সে গ্রন্থকে রাসায়েল নামে আখ্যায়িত করা হয়। যে সব গ্রন্থে সব কয়টি বিষয় স্থান পেয়েছে তাদেরকে 'জামেয়' বলা হয়। বোখারী ও তিরমিজি দুইটি জামেয়

নামে খ্যাত। যেহেতু মুসলিম গ্রন্থে কোরানের খন্ড সমূহের ব্যাপারে হাদীস সংযোজিত হয়নি। সেজন্য ইহাকে জামেয় বলা হয় না। যে হাদীস গ্রন্থ বিষয় অনুযায়ী সংকলিত হয়েছে অথবা যাতে তফসীর ও ইতিহাস ছাড়া সব কয়টি বিষয় সংযোজিত হয়েছে বিশেষভাবে যাতে তাহারাত, নামাজ, রোজা, প্রভৃতি আহকামের হাদীস বর্ণিত হয়েছে তাকে ছুনান বলা হয়। যথা- ছুনানে আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, দারেমী প্রভৃতি। এছাড়া আরো কিছু সংখ্যক হাদীস গ্রন্থ আছে যা আরবাইন নামে প্রসিদ্ধ। আলনাগরীর আরবাইন মিছবাহু সুন্নাহ এ ধরণের গ্রন্থ। এসব গ্রন্থে এক বা ততোধিক বিষয়ের উপর চলিশটি হাদীস সংকলিত হয়েছে। ইমাম বাগবীর মিছবাহু সুন্নাহ গ্রন্থটা ওয়ালা আলদীন দ্বারা আরো সংযোজিত হয়ে পরবর্তিতে মিসকাতুল মাসবিহ নামে খ্যাতি লাভ করে।

সংগৃহীত হাদীসের বিন্যাসকরণ পদ্ধতি

হাদীস বর্ণনা সংগ্রহ ও তার সমালোচনা

১. হাদীস শাস্ত্রের উত্তরোত্তর ব্যপ্তি ও উন্নতির সাথে সাথে তার সমালোচনা ও আলোচনা পদ্ধতিরও ব্যাপক উন্নতি ঘটে। স্বাভাবিকভাবে হাদীস সংগ্রহকারক মোহাদ্দেসগণ তাদের সংগৃহীত হাদীস এর বর্ণনাকারীদের বিশ্বস্ততা, তাদের বর্ণনার সম্ভাব্যতা ও বর্ণিত বিষয়ের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে জানার জন্য ব্যাপক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। কোরআন মজিদে এ ব্যাপারে এরূপ নির্দেশ দিয়েছে, "যারা বিশ্বাসী তাদের নিকট যদি কোন অবিশ্বাসী এসে কিছু বলে, তার যথোপযুক্ত যাচাই করবে।" রাসুলুল্লাহ (সা.) নিজে বহু বর্ণনার সমালোচনা করেছেন। রাসুলে খোদা (সা.) এর ইন্তেকালের পর যখন তাঁর হাদীস ব্যাপকভাবে বর্ণিত হচ্ছিল তখন সাহাবীগণ বহু হাদীসের আলোচনা সমালোচনা করেন এবং প্রয়োজন মত তা প্রত্যাখ্যান করেন। মকীন ইবনে ছিনাম বর্ণিত হাদীস সম্পর্কে হযরত আলী (রা.) বলেন, "তিনি একজন অশিক্ষিত, অমার্জিত বেদুইনের হাদীস গ্রহণ করতে পারেন না।"

২. রাসুলুল্লাহ (সা.) এর হাদীস সংগ্রহকারীদের হাদীসের যথাযথ যাচাই এর জন্য হাদীস বর্ণনাকারীদের এবং তাদের বর্ণিত হাদীসের যাচাই বাছাই এর জন্য ব্যাপক ব্যবস্থা নেওয়া হয়। কারণ হাদীস সংকলনের সময় মোহাদ্দেসগণ হাদীস বর্ণনায় ব্যাপক জালিয়াতি লক্ষ্য করেন। বিখ্যাত মোহাদ্দেছ আল জুহরী তার হাদীস লিপিবদ্ধ করণের কারণ হিসেবে

বলেছেন যে, পূর্বাঞ্চলীয় লোকদের দ্বারা ব্যাপক হাদীস বর্ণিত হওয়ায় তিনি এসব হাদীসের বিশ্বস্ততা সম্বন্ধেই সন্দিহান ছিলেন বিধায় তিনি হাদীস লিপিবদ্ধ করা শুরু করেন।

হযরত ওসমান (রা.) এর শাসনামল থেকে হাদীসের জালিয়াতি শুরু হয়। তখনকার দ্বিধাবিভক্ত মুসলিম সমাজ তাদের নিজ নিজ পক্ষের কার্যকলাপের যুক্তিকতা প্রমাণের জন্য হাদীস জাল শুরু করে ও তা সঠিক হাদীস হিসেবে প্রচারিত করেন। পরবর্তীকালে বিভিন্ন রাজনৈতিক মতাবলম্বী দল তাদের মতামতের স্বপক্ষে হাদীস সৃষ্টি করে বর্ণনা করেন। রাসুলুল্লাহ (সা.) এর ওফাতের পরবর্তীকালে বিভিন্ন গোত্রের মাঝে সংঘর্ষ ও সংঘাত শুরু হয় এছাড়া আনসার ও মোহাজের দ্বন্দ্ব, ইরাক, সিরিয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা, উমাইয়া আব্বাসীয় সংঘাত হাদীস জালিয়াতিতে ইন্ধন যোগায়। তারা প্রত্যেকে রাসুল (সা.) এর নামে বানোয়াট হাদীস বর্ণনা করে নিজেদের অবস্থান সুদৃঢ় করতে সচেষ্ট হন। এসব প্রতিক্রিয়াশীল চক্র তাদের নিজ নিজ নতুন মতবাদের স্বপক্ষে জাল হাদীস উপস্থাপিত করেন। এমনকি ধার্মিক ব্যক্তিবর্গও এ ব্যাপারে পিছপা ছিলেন না, যদিও তাদের উদ্দেশ্য ছিল মানুষকে সৎকাজে উদ্বুদ্ধ করা। তৎকালীন মুসলমানদের ধর্মের ব্যাপারে গাফিলতি তাদেরকে সক্রিয় করে তোলে। তাই আমরা দেখি ইয়াহইয়া ইবনে মায়াদ (মৃত্যু ১৪৩হি.) বলেছেন, "যারা ধার্মিক হিসেবে খ্যাত তাদের মাঝে আমি অসত্য হাদীস বর্ণনা বেশী দেখেছি।"

বর্ণনাকারীর সমালোচনায় অন্যান্য কারণগুলো নিম্নরূপ

কিছু সংখ্যক হাদীস বর্ণনাকারী তাদের বর্ণনায় অসতর্ক ছিলেন। কিছু সংখ্যক হাদীস বর্ণনাকারী তাদের বার্ধক্যের কারণে সঠিক বর্ণনায় অপারগ ছিলেন। অন্যান্যরা তাদের লিখিত হাদীস হারিয়ে ফেলে মুখস্ত বর্ণনায় ব্রতী হন যদিও তাদের স্মরণশক্তি আগের মত তীক্ষ্ণ ছিল না। হাদীস বর্ণনায় কিছু সংখ্যক মানুষের জালিয়াতি তখনকার মোহাদ্দেসগণকে প্রত্যেকটি হাদীসের যাচাই বাছাই ও সমালোচনায় উদ্বুদ্ধ করে। এর জন্য দুটি ইলমের শাখা হাদীস শাস্ত্রের সাথে সংযোজিত হয়।

(ক) ইলম রিওয়ায়াত আল হাদীস বা হাদীস বর্ণনা শাস্ত্র।

(খ) ইলম আল জারহ ওয়া আল তাদীল বা হাদীস সমালোচনা শাস্ত্র।

এছাড়া বানোয়াট হাদীস প্রতিরোধের জন্য মুসলিম শাসক ও মোহাদ্দেসগণ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। (১) জালকারীকে শাস্তি প্রদান (২)

বর্ণনাকারী বা রাবীর নিকট তার বক্তব্যের স্বপক্ষে সাক্ষ্য তলব (৩) বর্ণনাকারী থেকে হলফ গ্রহণ (৪) হাদীসের বাধ্যতামূলক সনদ বর্ণনা (৫) সনদ পরীক্ষা।

শাস্তি দানঃ হাদীসের জালিয়াতি প্রতিরোধের প্রাথমিক ব্যবস্থা হিসেবে জালিয়াতের প্রাণদন্ডের ব্যবস্থা রাসুল (সা.) স্বয়ং প্রবর্তন করেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে জানা যায় একবার এক ব্যক্তি রাসুলের জীবদ্দশায় তাঁর নাম করে একটি মিথ্যা কথা বলেছিল। একথা যখন রাসুল (সা.) শুনতে পান তখন রাসুলে পাক (সা.) তাকে হত্যা করে আগুনে পোড়ানোর আদেশ দেন। হযরত আলী (রা.) এর নির্দেশে আবদুল্লাহ ইবনে ছাবা ও তার অনুচরদেরকে পুড়িয়ে মারা হয়। ইমাম জাহরী বলেন, "আমি মনে করি হযরত আলী (রা.) তাহাকে (আবদুলাহ ইবনে ছাবাকে) আগুনে পুড়িয়ে মারেন।" খোলাফায়ে রাশেদানের যুগের পরেও অন্যান্য মুসলিম শাসকগণ জালিয়াতদের মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত করেছেন। বনি উমাইয়াদের শাসনকালে খলিফা আব্দুল মালেক ইবনে মারওয়ান হারেছ কাজ্জাবকে এবং খলিফা হিশাম ইবনে আবদুল মালেক গায়লান দামেশকীকে এ জাতীয় অপরাধে প্রাণদন্ড দেন। আব্বাসীয় খলিফা আল মানছুর মিথ্যা হাদীস বর্ণনাকারী মোহাম্মদ ইবনে ছায়েদ মাছলুবকে ফাঁসী দেন। এভাবে মিথ্যা হাদীস রচনাকারী বয়ান ইবনে হরাকে বনি উমাইয়াদের গভর্নর খালেদ ইবনে আবদুল্লাহ কাছরী এবং বছরার আব্বাসীয় গভর্নর মোহাম্মদ ইবনে ছোলাইমান কুখ্যাত হাদীস জালকারী আবদুল করিম ইবনে আবিস আওজাকে মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত করেন।

সাক্ষ্য তলবঃ হযরত আবু বকর (রা.) কর্তৃক হাদীসের বিশুদ্ধতা যাচাই এর জন্য বর্ণনাকারীর নিকট সাক্ষ্য তলব নিয়ম প্রচলন করেন। নানীর পক্ষে নাতির মিরাছ লাভ সংক্রান্ত হাদীসের জন্য তিনি হযরত মুগীরাহ ইবনে শোবার নিকট সাক্ষ্য তলব করেন। হযরত ওমর ফারুকও তাই করেছেন। ছালাম সম্পর্কীয় হাদীসের জন্য তিনি হযরত আবু মুছা আশআরীকে প্রমাণ উপস্থিত করতে বলেছেন।

হলফ গ্রহণঃ হযরত আলী মোরতাজা কর্তৃক প্রমাণ অভাবে বর্ণনাকারীর নিকট হলফ গ্রহণ করার ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। পরবর্তী যুগে ইহার প্রচলন আর চালু ছিল না, কারণ মিথ্যা হাদীস বর্ণনাকারীর পক্ষে মিথ্যা হলফ করা খুব একটা কঠিন ব্যাপার নয়।

সনদ বর্ণনাঃ হযরত আলী (রা.) কর্তৃক যেমন হাদীস বর্ণনাকারীর নিকট থেকে হলফ গ্রহণ প্রথা প্রবর্তন করেন তেমনি তিনি সনদ ব্যতিরেকে হাদীস বর্ণনা করতেও নিষেধ করেছেন। শরহে মাওয়াহিবে বর্ণিত আছে হযরত আলী (রা.) হাদীস শিক্ষার্থীদেরকে সনদ ব্যতিত হাদীস না লিখতে নির্দেশ দেন। পরবর্তীকালে মোহাদ্দেসগণ সনদ ব্যতিত হাদীস গ্রহণ থেকে বিরত থাকেন। ফলে বলা ও লিখা উভয় ক্ষেত্রেই সনদ বর্ণনা হাদীসের এক জরুরী অংগ হয়ে পড়ে। হাদীসের সনদ বর্ণনা বহুলাংশে জালিয়াতির পথ রুদ্ধ করে। তাই মোহাদ্দেসগণ গুরুত্ব সহকারে সনদ বর্ণনার ব্যবস্থা করেন।

সনদ পরীক্ষাঃ সনদ প্রবর্তন দ্বারা বেপরোয়া হাদীস জালিয়াতির পথ অনেকটা বন্ধ হয়ে যায় কিন্তু তা সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়নি। তাই মুসলিম মনীষীগণ সনদের জারাহ ও তাদীল বা রাবীদের দোষগুণ বিচারের ব্যবস্থা করেন। তারা সনদের প্রতিটি ব্যক্তি বা রাবীর পূর্ণ জীবনী অর্থাৎ তিনি কবে কোথায় কোন বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। কবে কোথায় কত বয়সে মারা যান। তার নাম লকব কুনিয়াত কি ছিল এবং তিনি কোনটির (কুনিয়াত) সাথে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি কার নিকট হাদীস শিখেছেন এবং কাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন তার চারিত্রিক গুনাবলী ধীশক্তি ইত্যাদি আলোচনা করেন। হাদীস বর্ণনাকারীদের জীবনের ক্ষুদ্রতম দিক তাদের অনুসন্ধান থেকে রেহাই পায়নি। এর ফলশ্রুতিতে প্রতিটি বানোয়াট ও আসল হাদীস চিহ্নিত হয় এবং জালিয়াতির নতুন প্রচেষ্টাও বন্ধ হয়ে যায়। কারণ তাতে দুস্কৃতিকারীদের হাতে নাতে ধরা পড়া ও চরমভাবে লাঞ্ছিত হওয়ার সম্ভাবনা বর্তমান।

হাদীস সমালোচনার ভিত্তি

প্রতিটি বর্ণিত পূর্ণাঙ্গ হাদীসকে দু'অংশে ভাগ করা হয়। প্রথম ভাগ সনদ নামে পরিচিত। এ অংশে হাদীস বর্ণনাকারীদের সর্ব প্রথম থেকে সর্বশেষ স্তর পর্যন্ত প্রত্যেকের নাম উল্লেখ করা হয়। দ্বিতীয় অংশ মতন বা মূল বক্তব্য। প্রাথমিক যুগের মোহাদ্দেসগণ হাদীসের বিশ্বাসযোগ্যতা যাচাইয়ের জন্য ইস্‌নাদের উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করে। সঠিক ইসনাদ হাদীসের মূল্যায়নের জন্য একটি বিশেষ হাতিয়ার এতে কোন সন্দেহ নাই। কারণ ইসনাদে রাবী পরম্পর সর্বপ্রথম বর্ণনাকারী থেকে সর্বশেষ বর্ণনাকারী পর্যন্ত প্রত্যেকের নাম উল্লেখ করা হয়। ইসনাদ রাবী পরম্পরায় বর্ণিত সব বর্ণনাকারীদের সততা, বিশ্বস্ততা, নির্ভরশীলতা ও তাদের সমকালীনতা জানার ব্যাপারে পরবর্তীকালের হাদীস সমালোচকদের দিয়েছে অপূর্ব

সুযোগ। তাঁরা রাবী বা বর্ণনাকারীদের দোষ গুণ বিচারের ব্যবস্থা করেন এবং এ উদ্দেশ্যে "আসমাউর রেজাল" নামে জীবনবৃত্তান্ত মূলক ইলমের এক নতুন শাখা সংযোজন করেন। প্রতিটি হাদীস বর্ণনাকারী কবে কোথায় কোন বংশে জন্মগ্রহণ করেন এবং কবে কোথায় কত বয়সে ইন্তেকাল করেন তার নাম লকব কি ছিল বা কোনটির সহিত তিনি প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁর শিক্ষক ও ছাত্র কারা ছিল ও তার বিশ্বস্ততা ধীশক্তি কেমন ছিল ইত্যাদি আলোচনা করেন। এছাড়া সে যুগে প্রকাশনা শিল্পের কোন অস্তিত্ব না থাকায় যে কোনো লেখকের গ্রন্থের একটি মাত্র পান্ডুলিপিতে পরবর্তীকালে রদবদল, পরিবর্তন বা সংযোজন দুঃসাধ্য ছিল না যা বর্তমানে সাধ্যাতীত। তাই সনদ বর্ণনার উপর গুরুত্বারোপ এবং বর্ণনাকারীদের পুংখানুপুংখ যাচাই হাদীসের জালিয়াতি অনেকাংশে হ্রাস করেছে। তারা হাদীসের বক্তব্যের ব্যাপারেও বিশেষ সতকর্তা অবলম্বন করেন। মোহাদ্দেছগণ হাদীসের মূল্যায়ন ও যাচাইয়ের জন্য বেশ কিছু মূলনীতির উদ্ভাবন করেন। যা উছুলে হাদীস আসমাউর রেজাল ও অন্যান্য গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে।

যেহেতু হাদীস দুটি স্বতন্ত্র অংশে বিভক্ত ইছনাদ ও মতন, তাই তাদের সমালোচনা সাহিত্যের মূলনীতি দু'ভাগে বিভক্ত:

সনদ সম্বন্ধীয় সমালোচনা: প্রত্যেক হাদীসের রাবী পরম্পরায় সর্বপ্রথম বর্ণনাকারী থেকে সর্বশেষ রাবী প্রত্যেকের পরিচয়, চারিত্রিক গুনাবলী ও মেধা সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞান লাভ দ্বারা হাদীসের বিশ্বস্ততা নিরূপন সম্ভব। সচরাচর ঘটিত কোন ঘটনা যা বেশ কিছু মানুষের অবলোকনের সুযোগ ছিল তার প্রাথমিক বর্ণনাকারী বেশ কিছু ব্যক্তি হতে হবে। বর্ণিত মূলনীতির সাথে সামঞ্জস্য না থাকায় হযরত আবু হোরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীস- "রাসুল (সা.)তার প্রতিটি নামাজে বিসমিল্লাহ উচ্চারণ করতেন" গ্রহণ করা হয়নি কারণ এটি অন্য কোন সাহাবা বর্ণনা করেননি। এমনিভাবে শুধু হযরত আবু বকর (রা.) কর্তৃক বর্ণিত কথিত হাদীস "মুসলমানগণ আযানের সময় রাসুল (সা.) এর নাম উচ্চারিত হলে তাদের বৃদ্ধাঙ্গুলীতে চুমু খেতেন" গৃহীত হয়নি।

বক্তব্য সম্বন্ধিয় সমালোচনা: সঠিক সনদ বিশ্বাসযোগ্যতার দলিল নয়। সঠিক সনদধারী হাদীসের মূল বক্তব্য নকল হতে পারে। তাই মোহাদ্দেসগণ হাদীসের বিষয়বস্তু যাচাই করেছেন যাকে দেরায়াত গত পরীক্ষা বলা হয়। দেরায়াতগত সমালোচনার সূচনা স্বয়ং সাহাবীদের যুগে আরম্ভ হয়। একবার

হযরত আবু হোরায়রা (রা.) বলেছেন, রাসুল (সা.) বলেছেন, আগুনে পাক করা জিনিস খেলে অজু নষ্ট হয়। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) শুনে বললেন, তাহলে গরম পানি পান করলেও অজু নষ্ট হবার কথা অথচ তা তো কেউ বলে না। আপনি হুজুরের কথা বুঝেননি অথবা সঠিকভাবে স্মরণ রাখতে পারেননি। হযরত ছাবিত (রা.) বর্ণিত মেরাজ সম্পর্কীয় হাদীসটিও দ্রষ্টব্য- তিনি বলেছেন হুজুর (সা.) বলেছেন আমি বোরাককে বায়তুল মাকদাছের কড়ার সাথে বেঁধেছিলাম। তখন হযরত হোজায়ফা মন্তব্য করলেন কেন? বোরাক পালাবার ভয়ে? তা হতে পারেনা সে রাতে আল্লাহ্ সমস্ত জিনিসকে হযরতের হুকুমের অধীনে করে দিয়েছিলেন। অতএব আপনি হুজুরের কথা ঠিকভাবে বুঝেননি অথবা স্মরণ রাখতে পারেননি। এ ধরণের আরো অনেক ঘটনা উল্লেখ আছে। এভাবে হাদীসের উভয় অংশ সনদ ও মতন যাচাই বাছাই এর মাপকাঠিতে উত্তীর্ণ হলে কেবল তখনই হাদীস গ্রহণযোগ্য হত। নিম্নে কয়েকটি অগ্রহনীয় হাদীসের দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল-

বোখারীতে বর্ণিত আছে আদম আলাইহিস সালামের উচ্চতা ৬০ গজ। প্রাচীনকালের মানুষের আবিস্কৃত আবাসস্থল পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে তখনকার অধিবাসীগণ এত বেশী উচ্চতার অধিকারী নন। তাই হাদীসটি গ্রহনীয় নয়। "যদি হযরত (সা.) এর পুত্র ইব্রাহীম জীবিত থাকতেন তবে তিনিও একজন পয়গম্বর হতেন।" কথিত হাদীসটিও বাতিল। ইমাম নববী এ হাদীসের বিরূপ সমালোচনা করেছেন এবং বানোয়াট হাদীস বলে গণ্য করেছেন কারণ হাদীসটি কোরআনে বর্ণিত রাসুল (সা.) শেষ নবী হওয়ার আয়াতের (৩৩.৪০) বিরোধী। আবু দাউদ বর্ণিত কাজবীনের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কীয় হাদীসটিও নকল হাদীস হিসেবে গণ্য করা হয়। "যে ব্যক্তি ভালবাসে, পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাকে এবং মৃত্যুবরণ করে সে শহীদ।" কথিত হাদীসটিও নকল হাদীস হিসেবে গণ্য করা হয়। ইবনে আল কাইয়্যেম বলেন যদি এ হাদীসের সনদ সুর্য্যের মত উজ্জ্বলও হয় তবুও হাদীসটি ভুল। হাদীসে বর্ণিত দাজ্জাল, মেহেদী ও খাজাহ খিজির সম্বন্ধিয় হাদীসগুলো নকল বলে পরিগণিত।

হাদীসের শ্রেণী বিভাগ

মোহাদ্দেসগণ হাদীসকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন:

(১) হাদীসে নববী বা রাসুলের হাদীস।

(২) হাদীসে এলাহী বা হাদীসে কুদসী বা আল্লাহ্ প্রদত্ত হাদীস যা রাসুল (সা.) ইলহাম বা স্বপ্নের মাধ্যমে ডাইরেক্টলী আল্লাহ্ হতে পেয়েছেন এবং নিজ ভাষায় বর্ণনা করেছেন। হাদীসে কুদসীর মূলবক্তব্য আল্লাহর নিকট হতে প্রাপ্ত কিন্তু এর ভাষা রাসুল (সা.) কর্তৃক প্রদত্ত। ইহা আল কোরআন হতে পৃথক। হাদীসে কুদসী নামাজে পড়া হয়না এবং অপবিত্র অবস্থায় ইহা স্পর্শ করা যায়। হাদীস সমূহের যাচাই বাছাই এর জন্য নিম্নলিখিত পরিভাষাগুলি মোহাদ্দেসগণ ব্যবহার করেন।

মারফু: যে হাদীসের সনদ রাসূলুল্লাহ (সা.) পর্যন্ত ব্যক্ত হয়েছে অর্থাৎ যা স্বয়ং রাসুলুল্লাহর হাদীস বলে সাব্যস্ত হয়েছে।

মাওকুফ: যে হাদীসের সনদ কোনো সাহাবী পর্যন্ত পৌঁছেছে অর্থাৎ যে হাদীসটি স্বয়ং সাহাবীর বর্ণিত হাদীস বলে সাব্যস্ত তা হাদীসে মাওকুফ বলে আখ্যায়িত। তার অপর নাম আছার।

মাকতু: যে হাদীসের সনদ কোনো তাবেয়ী পর্যন্ত সমাপ্ত যা স্বয়ং তাবেয়ীর হাদীস বলে সাব্যস্ত। অনেকে হাদীসে মাওকুফও মাকতুকে আছার বলে আখ্যায়িত করেছেন।

মোত্তাছিল: যে হাদীসের সনদের মধ্যে কোনো স্তরে কোনে রাবী বাদ পড়েনি অর্থাৎ সকল স্তরের সকল রাবীর নামই যথাস্থানে উল্লিখিত হয়েছে।

মোনকাতিই: যে হাদীসের সনদের কোনো এক স্তরে রাবীর নাম উল্লেখ হয়নি। এ হাদীস দু'প্রকার মোরছাল ও মোয়াল্লাক।

মোরছাল: যে হাদীসের সনদে সাহাবীর নাম উল্লিখিত হয়নি বরং স্বয়ং তাবেয়ী রাসুলুল্লাহ (সা.) এর নাম করে হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইমাম আবু হানিফা ও মালেকের মতে এ হাদীস গ্রহণযোগ্য।

মোয়াল্লাক: যে হাদীসের সনদে সাহাবার এক বা একাধিক নাম বাদ পড়েছে এ হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়।

ছহীহ: যে মোত্তাছিল হাদীসের সনদের প্রত্যেক রাবীর পূর্ণ বিশ্বস্ততা সন্দেহাতীত এবং তার স্মৃতিশক্তি দূর্বলতা মুক্ত।

হাসান: যে হাদীসের রাবীর স্মরণ শক্তির দুর্বলতা পরিলক্ষিত হয়েছে।

জয়ীফ: যে হাদীসের কোনো রাবী হাসান হাদীসের রাবীর গুন সম্পন্ন নয়।

গরীব: যে সহীহ হাদীস কোনো এক স্তরে এক বর্ণনাকারী রেওয়ায়াত করেছেন।

আজিজ: যে সহীহ হাদীস প্রত্যেক যুগে অন্ততঃ দু'জন রাবী বর্ণনা করেছেন।

মাশহুরঃ যে সহীহ্ হাদীস প্রত্যেক যুগে বা স্তরে অন্ততঃ তিন জন রাবী দ্বারা বর্ণিত হয়েছে। গরীব, আজিজ ও মাশহুর প্রত্যেকটি পৃথক স্তরে পৃথকভাবে খবরে ওয়াহেদ নামে পরিচিত।

মোতাওয়াতেরঃ যে সহীহ্ হাদীস প্রত্যেক স্তরে বিপুল সংখ্যক রাবী দ্বারা বর্ণিত হয়েছে। প্রত্যেক যুগে বর্ণনাকারীদের সংখ্যা এত অধিক ছিল যাদের পক্ষে একত্রিত হয়ে মিথ্যা কথা রচনা করা বা বলা সাধারণত সম্ভব নয়। মাতাওয়াতের হাদীস দ্বারা এলমুল ইয়াকিন অর্থাৎ দৃঢ় প্রত্যয় লাভ হয় এবং ইহা সব সন্দেহের উর্ধ্বে। কোরআন মজিদ মোতওয়াতের সূত্রে বর্ণিত। একটা হাদীস প্রধানত দু'ভাবে মোতাওয়াতের হতে পারে-

মোতাওয়াতের লফজীঃ যে হাদীসের শব্দ ও বাক্য একইভাবে সকল যুগে বহুলোকে বর্ণনা করেছেন।

মোতাওয়াতের মা'নবীঃ যে হাদীসের শব্দ ও বাক্য বিভিন্ন হলেও মূল ভাবার্থ বা বক্তব্য এক যা সকল যুগে বহুলোক বর্ণনা করেছেন যেমন- দোয়া করতে হাত উঠানো। রাসুলে করিম (সা.) কোন কোন দোয়ায় কি কি রূপে হাত উঠিয়েছেন যা একরূপ না হলেও তিনি যে দোয়ায় হাত উঠিয়েছেন এ মূল অর্থটি সকলেই বর্ণনা করেছেন। এছাড়া আমল বা কাজ দ্বারাও একটি হাদীস মোতাওয়াতের হতে পারে। যে হাদীসকে প্রত্যেক যুগে বহু লোক কার্যকরী করে এসেছে সে হাদীসকে মোতাওয়াতের আমল বলা যেতে পারে। এ দৃষ্টিতে বিচার করলে ইসলামী আহকাম বা ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সব হাদীস মোতাওয়াতের। কেননা সাহাবী ও তাবেয়ীনদের যুগ থেকে এ হাদীসগুলো সর্বদা কার্যকর। সংখ্যাগত প্রশ্নটি শুধু সাহাবী ও তাবেয়ীনদের যুগেই বিচার্য। হাদীস লিপিবদ্ধ হওয়ার দরুণ পরবর্তী যুগের বর্ণনাকারীদের সংখ্যা আর বিচার্য বিষয় হিসেবে গণ্য নয়।

খবরে মোতাওয়াতের সনদ শাস্ত্রের আলোচনা বহির্ভূত কারণ সনদ শাস্ত্রে হাদীসের শুদ্ধ অশুদ্ধ হওয়ার ব্যাপারটি আলোচনা করা হয়। মোতাওয়াতের হাদীসে বিশ্বস্ত সূত্রে সন্দেহাতীতভাবে বর্ণিত হওয়ার দরুণ বর্ণনাকারীদের সম্পর্কে আলোচনা সমালোচনার প্রয়োজন হয় না। খবরে মোতাওয়াতের এর জন্য নির্দিষ্ট কোন সনদ থাকার প্রয়োজন নেই। আর থাকলেও তার বর্ণনাকারীদের পর্যালোচনা করা হয় না।

খবরে ওয়াহিদ

গরীব, আজিজ, মাশহুর জাতীয় হাদীস প্রত্যেকটি পৃথক পৃথকভাবে খবরে আহাদ বলে পরিচিত তা ইতিপূর্বেই বলেছি। এক কথায়, যে সকল হাদীসের বর্ণনাকারীদের সংখ্যা ও সনদ মোতাওয়াতের পর্যায়ে পড়েনা সেগুলোকে হাদীসে আহাদ বলে। খবরে ওয়াহিদের জন্য নির্দিষ্ট সনদ থাকা জরুরী, যাতে তার রাবীদের অবস্থা ও বর্ণনার বিষয়বস্তু সম্পর্কে যাচাই বাছাই করা যায়। কারণ সব খবরে ওয়াহিদ সহীহ্ নয় বরং অনেক দুর্বল ও পরিত্যাজ্য হাদীস এতে আছে। তাই মোহাদ্দেসগণ খবরে ওয়াহেদ গ্রহণের ব্যাপারে বেশ কিছু পূর্ব শর্ত ও বিধি নিষেধ আরোপ করেছেন। তাঁরা এ প্রসংগে বিশেষভাবে বর্ণনাকারীর ৪টি গুণের উল্লেখ করেছেন। হাদীস গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য এ ৪টি গুণ তার মধ্যে থাকা আবশ্যক তা হচ্ছে আকল, যবত, আদালত ও ইসলাম।

আকল: অর্থাৎ বর্ণনাকারীর মধ্যে অবশ্যই ভাল মন্দ পার্থক্য করার জ্ঞান থাকতে হবে।

যবত: অর্থাৎ রাবীর মধ্যে এমন প্রতিভা এবং স্মরণশক্তি থাকতে হবে যার সাহায্যে সে লিখিত ও শ্রুত বিষয়কে যথাযথ সূক্ষ্ম অনুধাবনে সক্ষম হয় যা তাকে বিস্মৃতি থেকে রক্ষা করতে পারে এবং যে কোনো সময় হুবহু বর্ণনা করতে পারে।

আদালত: অর্থাৎ এখানে শিরক, বেদআত ও ফিসক প্রভৃতি কবিরা গুনাহ ও পুনঃ পুনঃ সগীরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা, অসহনীয় ও অভদ্রজনোচিত আচরণ থেকে দূরে থাকা, যদিও তা মোবাহ যেমন- রাস্তাঘাটে পেশাব করা ইত্যাদি।

ইসলাম: অর্থাৎ বর্ণনাকারীর মুসলমান হওয়া। তবে রাবীর মুসলিম হওয়ার শর্তটা হাদীসটি অন্যের কাছে বর্ণনা করার সময়েই শুধু বিবেচ্য অপরের নিকট হতে শ্রবণের কালে নয়। এজন্য বদরের যুদ্ধের বন্দি বিনিময়ের সময় শ্রুত আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়ের এর রেওয়ায়াত, "তিনি নবী (সা.) কে সালাতিল মাগরিবে সুরায়ে তুর পড়তে শুনেছেন" বোখারীতে স্থান পেয়েছে অথচ তিনি তখন ইসলাম গ্রহণ করেননি। তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন মক্কা বিজয়ের পর।

খবরে ওয়াহেদ এর অবস্থান

ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে খবরে মোতাওয়াতির দ্বারা ইলমে ইয়াকিন বা দৃঢ় বিশ্বাস লাভ করা যায়। এবার আমরা খবরে ওয়াহেদ দ্বারা কোন পর্যায়ের জ্ঞান অর্জন করা যায় তা নিয়ে আলোচনা করব। ইসলামী শরিয়তে সর্বসম্মতভাবে নির্ভরযোগ্য সূত্রে প্রাপ্ত খবরে ওয়াহেদ এক অতি গুরুত্বপূর্ণ

আইনের উৎস। কিয়াস, ইজতেহাদ প্রভৃতির উপর এর প্রাধান্য সব প্রসিদ্ধ ইমামদের নিকট স্বীকৃত। আল্লামা ইবনে হাজম জাহেরী বলেন, "নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির সূত্র পরম্পরায় বর্ণিত খবরে ওয়াহেদ দ্বারা অকাট্য ও নিশ্চিত জ্ঞান লাভ করা যায়। জমহুর মোহাদ্দেসীনদের নিকট এ মত গ্রহণযোগ্য নয়। তাঁদের মতে খবরে ওয়াহেদ দ্বারা কিছুতেই সন্দেহ সংশয় মুক্ত জ্ঞান অর্জিত হতে পারেনা তা বিশ্বস্ত লোকদের সূত্র পরম্পরায় বর্ণিত হলেও। কেননা মানুষ হবার কারণে বিশ্বস্ত লোকদেরও ভুল ভ্রান্তির সম্ভাবনা রয়েছে। তাই তা দ্বারা ধারণা পর্যায়ের জ্ঞানই লাভ করা যায়। ধারণা পর্যায়ের জ্ঞান লাভের অর্থ এ নয় যে তা সবই সন্দেহজনক, তার সঠিক হওয়া সম্বন্ধে কোন নিশ্চয়তা নেই বরং তার অর্থ হচ্ছে খবরে ওয়াহেদ দ্বারা যে জ্ঞান লাভ হয় তা মোতাওয়াতের পর্যায়ের নয়। একে গালেবুর রায় বলা হয়। বিশ্বস্ত একজনের কথায় যে বিশ্বাস করা যায় এবং তদানুযায়ী আমল করা যায়; কোরআন হাদীসের তার অসংখ্য নজীর পাওয়া যায়। স্বয়ং রাসুলুল্লাহ (সা.) বিভিন্ন বাদশাহদের নিকট ইসলামের দাওয়াতের চিঠি শুধু একজন বাহকের মারফত পাঠিয়েছেন। সাহাবীগণও একজনের দ্বারা সংবিদিত বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে তদনুযায়ী আমল করেছেন। বর্ণিত আছে একদা হযরত আনাস (রা.) হযরত আবু তালহা (রা.) ও উবাই ইবনে কাব (রা.) মদ্যপান করছিলেন এমতাবস্থায় রাসুলে করিমের (সা.) এর পক্ষ থেকে জনৈক ঘোষক জানিয়ে দিলেন যে, "মদ হারাম হয়ে গেছে" অমনি তাঁরা মদের পাত্রগুলি ভাংতে শুরু করেন। তাঁরা শুধু একজনের খবরের উপর বিশ্বাস করে তা কার্যকরী করেন।

জারহ্ তা'দীল সম্পর্কীয় গ্রন্থ

রাবী পরম্পরায় প্রতিটি যুগের হাদীস বর্ণনাকারীদের নাম সনদ শাস্ত্রে দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেকটি হাদীসের সনদের যাচাই বা পর্যালোচনার জন্য মুসলিম মনিষীগণ তাদের হাদীসের বর্ণনাকারীদের জীবন বৃত্তান্ত নিয়ে আলোচনা করেন। তাই লক্ষ লক্ষ হাদীস বর্ণনাকারীর জীবন চরিত আলোচনার জন্য "আসমাউর রেজাল" নামক এক নতুন জীবন বৃত্তান্ত মূলক শাস্ত্র জন্ম নেয়। এ বিষয়ে বহু গ্রন্থ রচিত হয় যাতে হাদীস বর্ণনাকারীদের জীবনী পর্যালোচিত হয়। ইবনে ছাদ রচিত তাবকাতে কবির (মৃত ২৩০/৮৪৪) গ্রন্থে ৪০০০ এর অধিক রাবীদের জীবনী পাওয়া যায়। ইমাম বোখারীর "কিতাব আত তারীখ নামীয় গ্রন্থে ৪২০০ ব্যক্তির জীবন বৃত্তান্ত লিখিত হয়। আল বাগদাদী প্রণীত তারীখে বাগদাদ গ্রন্থে ৭৮৩১ জনের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হয়। ইবনে হাজার রচিত তাহজীব আল তাহজীব এবং মিজান আল ইতকান গ্রন্থে ১২৪১৫ জন এবং ১৪৩৪৫ জন বর্ণনাকারীর জীবনী লিখিত হয়।

আসমাউর রিজাল সম্পর্কীয় গ্রন্থ দু'ভাগে ভাগ করা যায়। সাধারণ গ্রন্থ যাতে সাহাবী, অসাহাবী, ছেকাহ জয়ীফ সকল শ্রেণীর রাবীর সকল দিক আলোচিত হয়েছে। বিশেষ গ্রন্থ যাতে শুধু একশ্রেণীর রাবীর কথা সাহাবী, ছেকাহ জয়ীফ বা জালকারীদের জীবনী আলোচনা করা হয়। অথবা রাবীদের জীবনের কোনো বিশেষ দিক সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে। যথা রাবীদের শুধু জন্ম/মৃত্যুর তারিখ কোনো কোনো কিতাবে বিশেষ অনুসন্ধান করা হয়েছে। আবার কোনো কোনো কিতাবে তাদের নাম লকব ও কুনিয়াতের বিশেষ অনুসন্ধান করা হয়। কোন কোন কিতাবে কেবল কোনো বিশেষ গ্রন্থে উল্লিখিত রাবীদের জীবনী পর্যালোচনা করা হয়।

কয়েকজন মহিলা মোহাদ্দীসীন

হাদীস শাস্ত্রের প্রাথমিক যুগ থেকে মুসলিম মহিলাগণ হাদীস প্রশিক্ষণ, অধ্যয়নে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। হাদীস সংগ্রহ, বর্ণনা, সংকলন ও সম্পাদনায় তাদের সুস্পষ্ট অংশ গ্রহণ ইতিহাস খ্যাত। রাসুল (সা.) এর যুগে এবং তাঁর ইন্তেকালের পরে বেশ কিছু মহিলা ছাহাবীকে হাদীস বর্ণনা করতে দেখা যায়। বিশেষ করে রাসুল (সা.) এর বিবিগণ হাদীস বর্ণনায় সবার অগ্রগামী ছিলেন। হাদীস শাস্ত্রে উম্মাহাতুল মোমেনীন হযরত আয়েশা, উম্মে সালমা (রা.) এর খ্যাতি কারো অজানা নয়। হযরত আয়েশা (রা.) বিপুল সংখ্যক হাদীস বর্ণনা করেন। তদুপুরি হাদীসের ব্যাখ্যাদাতা হিসেবেও প্রসিদ্ধ ছিলেন। মদিনার মসজিদে খোতবা দানকালে একজন মোহাদ্দেছা মহিলা সাহাবী দাঁড়িয়ে দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর (রা.) এর ভুল সংশোধন করে দেন। তাবেয়ীনদের যুগে বেশ কয়েক জন মহিলা হাদীস বর্ণনাকারী প্রসিদ্ধি লাভ করেন। হাফছাহ বিনতে ইবনে শিরীন, উম্মে দারদা ও আমরাহ বিনতে আবুদর রহমান সে যুগের প্রসিদ্ধ হাদীস বর্ণনাকারিনী। উম্মে দারদা মোহাদ্দেস হওয়া ছাড়াও একজন উপযুক্ত বিচারক ছিলেন। হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণিত হাদীসের উপর হযরত আমরাহ বিনতে আবদুর রহমানের অগাধ জ্ঞান ছিল। মদিনার বিচারপতি আবু বকর ইবনে মোহাম্মদ ইবনে হাজম তাঁর ছাত্র ছিলেন। তাই খলিফা ওমর ইবনে আবদুল আজিজ তাকে হযরত আমরাহ বর্ণিত সব হাদীস লিপিবদ্ধ করে নিতে হুকুম দেন। এরপর মহিলা মোহাদ্দেছাহ আবীদা আল মাদানীয়াহ, আবদাহ বিনতে বিলর, উম্মে ওমর আল সাকিফিয়াহ, নাফিছা বিনতে হামান ইবনে যিয়াদ আবিদাহ বিনতে আবদাল রহমান প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তিনি তাঁর ছাত্রদের জন্য হাদীসের উপর বক্তৃতা দিতেন। বহু হাদীস সংকলনকারী তাঁদের মহিলা শিক্ষকদের নিকট শিক্ষা নেন এবং বহু হাদীসের সনদে বেশ কিছু মহিলা রাবীদের নাম বর্ণিত হয়েছে।

হিজরী চতুর্থ শতাব্দীতে বিখ্যাত মোহাদ্দেছা ফাতেমা বিনতে আবদুর রহমানের নাম উল্লেখযোগ্য। ফাতিমা বিখ্যাত সুনান রচয়িতা আবু দাউদের পৌত্রী। হিজরী পঞ্চম শতাব্দীতে বেশ কয়েকজন মহিলা হাদীস বর্ণনাকারিনী হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তাদের মধ্যে আবা আলকাছেম আল কোশায়রীর স্ত্রী ফাতিমা একজন। তিনি হাদীস শাস্ত্র ছাড়া হস্তলিখনেও পারদর্শী ছিলেন। করিমা আল মাওয়াজিয়াহ বিনতে আহমদ তাঁর যুগে ছহীহ বোখারীর উপর বিশিষ্ট পন্ডিত হিসেবে পরিগণিত ছিলেন। উম্মে আল খায়ের ফাতিমা বিনতে আলী ছহীহ মোসলেম আর জয়নাব মোছনাদে আহমদ ইবনে হাম্বল পড়াতেন। এসব মহিলা মোহাদ্দেছাদের হাদীস শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ শুধুমাত্র তাদের ব্যক্তিগত পর্যায়ে ছিলনা। তারা তৎকালীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র ও শিক্ষক হিসেবে তাঁদের পুরুষ সাথীদের সাথে অংশ নেন।

হাদীসের পরিসংখ্যান

সর্বমোট কতটি হাদীস ও আছার বর্ণিত হয়েছে তা সঠিকভাবে বলা সম্ভবপর নয়। হাসান ইবনে আহমদ সমরখন্দির "বাহরুল আছানাদ" নামক গ্রন্থে এক লক্ষ হাদীস লিপিবদ্ধ হয়েছে বলে শুনা যায়। এ সংখ্যা হাদীসের পুনরাবৃত্তি বা তাকরার ছাড়া কিনা তা জানা যায়নি। তাই মোট হাদীসের সংখ্যা ছাহাবা ও তাবেয়ীনদের আছার সহ এক লক্ষের অধিক নয় বলে মনে হয় এর মধ্যে ছহীহ হাদীসের সংখ্যা আরও অনেক কম। হাকেম আবি আবদুল্লাহ নিশাপুরীর মতে প্রথম শ্রেণীর ছহীহ হাদীসের সংখ্যা ১০ হাজারেরও কম। ছিয়াহ ছিত্তায় মোট পৌনে ছয় হাজার হাদীস রয়েছে তার মধ্যে ২৩২৬টি হাদীস বোখারী ও মুসলিম গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। তাই তাদেরকে মোত্তাফেক আলাইহে বলা হয়। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে হাদীসের ইমামগণের লক্ষ লক্ষ হাদীস জানা থাকার ব্যাপারে যে উল্লেখ আছে তার অর্থ কি? তার অর্থ হচ্ছে অধিকাংশ হাদীস বিভিন্ন সনদ দ্বারা বর্ণিত হয়েছে এবং মোহাদ্দেসগণ যে হাদীসের যতটি সনদ তাকে তত হাদীস বলে গণ্য করেন। যেমন- নিয়ত সংক্রান্ত হাদীসটির (ইন্নামাল আ-মাল বিন্নিয়াত) সাত শতের মত সনদ আছে তাই মোহাদ্দেসগণের মতে সাতশত হাদীস বলে গণ্য করা হয়। অবশ্য প্রথম যুগে সনদের সংখ্যা অধিক ছিলনা। পরবর্তীকালে সময়ের দীর্ঘসুত্রিতার দরুণ সনদের সংখ্যাও বেড়ে যায়। একজন ওস্তাদের একাধিক প্রসিদ্ধ শিষ্যের একটি সনদ একাধিক শাখা সনদে বিভক্ত হয়ে সনদের সংখ্যা বৃদ্ধি করেছে। এ কারণে আমরা তাবেয়ীন ও তবেতাবেয়ীনদের মধ্যে লক্ষ লক্ষ হাদীসের হাফেজ ও রাবী দেখতে পাইনা তা শুধু পরবর্তীকালেই দেখা যায়।

সত্যের কষ্ঠিপাথরে হাদীসে রাসূল

তৃতীয় অধ্যায়

সহীহ্ হাদীস পরীক্ষা

রাসুলে খোদা (সা.) এর ইন্তিকালের পর ও তৎপরবর্তীকালে মুসলিম সমাজে আইন, রাজনীতি ও ধর্মতত্ত্বভিত্তিক বিভিন্ন দল ও সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়। প্রত্যেক দল ও গোষ্ঠি নিজ নিজ সম্প্রদায়ের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা ও তাদের মতবাদের যথার্থতা প্রমানের জন্য জাল বা মিথ্যা হাদীস বর্ণনা করতে আরম্ভ করে ফলে সহীহ্ হাদীস ও জাল হাদীস একই সাথে সমাজে প্রচলিত হয়। বনি উমাইয়া শাসনামলে এবং বিশেষ করে আব্বাসীয় শাসনের গোড়ার দিকে হাদীসের জালিয়াতি অতি সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। এ ব্যাপারে সমাজের পুন্যবান নেককার, সুফী, দরবেশ ব্যক্তিগণও অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। ইমাম মুসলিম তার সহীহ্ মুসলিমের মুকাদ্দমায় মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়া ইবনে মাইদুল কাত্তান থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত হাদীসটি বর্ণনা করেন। তিনি বলেন "আমরা নেককার ব্যক্তিদের অন্য বস্তুর ব্যাপারে এতটা মিথ্যাবলতে দেখিনি যতটা মিথ্যা বলতে দেখেছি হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে। তাই জাল হাদীস পরীক্ষাও প্রতিরোধ করার জন্য বিভিন্ন পন্থা অবলম্বনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এজন্য মোহাদ্দেসগণ সহীহ্ হাদীস থেকে জাল হাদীসকে পৃথকীকরণের জন্য কঠোর পদ্ধতি অনুসরণ করেন। এ পৃথকীকরণের ব্যাপারে তারা দুটি পদ্ধতি প্রয়োগ করেন–

(ক) রেওয়ায়েত (খ) দিরায়াত। হাদীসের সত্যতা পরীক্ষায় রেওয়ায়েত পদ্ধতিতে নিম্নলিখিত নীতি সমূহ অবলম্বন করা হত।

ক. রেওয়ায়েতঃ প্রত্যেক বর্ণনাকারী হতে রাসুলুল্লাহ (সা.) পর্যন্ত একটি নিখুঁত যোগসূত্র রয়েছে কিনা তা সন্ধান করে দেখা হত, বর্ণনাকারীদের নাম উপনাম বংশ পরিচয় ও পেশা সযত্নে পর্যালোচনা করা হত। প্রত্যেক বর্ণনাকারীর সত্যবাদীতা, ধর্মানুরক্তি ও সততা সম্পর্কে নিশ্চিত হবার জন্য তার চরিত্রের ব্যাপক পর্যালোচনা করা হত। বর্ণনাকারী সম্পূর্ণ সৎ স্বভাব বিশিষ্ট হলেও তার স্মৃতিশক্তি যদি প্রখর না হত তবে তার বর্ণনা অগ্রাহ্য করা হত। কোনো হাদীস বর্ণনায় যদি বর্ণনাকারীর একটি মাত্র মিথ্যা অনুশীলনের প্রমাণ পাওয়া যেত অথবা তার বর্ণনার সত্যতা সম্পর্কে সামান্যতম সন্দেহ প্রকাশ পেত তাহলেও উক্ত বর্ণনাকারীর সমগ্র বর্ণনাই গ্রহণযোগ্য হতনা।

বর্ণনাকারী কোনো অপরাধে অভিযুক্ত হলে অথবা হাদীস বর্ণনায় অবহেলার পরিচয় দিলে তার বর্ণনা অনুমোদন করা হতনা। কোন বর্ণনাকারী নিজস্ব কল্পনা হতে হাদীস বর্ণনা করলে অথবা তার কোনো ধর্মীয় মতবাদ থাকলে তার বর্ণনা গৃহীত হতনা। কোন বর্ণনাকারী চটুল প্রকৃতির আমুদে কিংবা অহংকারী হলে এবং বর্ণনায় বারবার ভুল করলে তার বর্ণনা অগ্রাহ্য করা হতো। বর্ণনাকারীকে অবশ্যই বলতে হতো যে তিনি রাসুল (সা.) এর হাদীস বর্ণনার সময় স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন এবং রাসুলের (সা.) মুখে সেই হাদীস উচ্চারিত হতে শুনেছেন অথবা তাঁকে রাসুলে করীম (সা.) পর্যন্ত হাদীসের সংযোগ রক্ষার জন্য বর্ণনাকারীদের পরিচিতির ধারাবাহিক তালিকা পেশ করতে হতো। ঐতিহাসিক সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণিত না হলে সে বিবরণ অগ্রাহ্য হতো। প্রত্যেক বর্ণনাকারী অন্য যে বর্ণনাকারীর নিকট হতে হাদীসটি প্রাপ্ত হয়েছেন, তার সাথে সাক্ষাত করেছেন তা অবশ্যই প্রমাণ করতে হত। ঐতিহাসিক ভিত্তিতে প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত না হলে বর্ণনা অগ্রাহ্য করা হত। হাদীসের বর্ণনাকারী হাদীস শ্রবণের সময় উপযুক্ত বয়ঃপ্রাপ্ত ছিলেন বলে প্রমাণ দিতে হত। হাদীসের বিষয়বস্তু ও সনদের কোন ব্যতিক্রম বা পরিবর্তন না ঘটে সে দিকে বিশেষ যত্ন নেওয়া হত।

কোন প্রকার পরিবর্তন, পরিমার্জন, সংযোজন বিয়োজন স্বযত্নে পরিহার করা হত। জ্ঞানী, আইনজ্ঞ ব্যক্তির বর্ণনাকে সর্বাপেক্ষা অধিক গুরুত্ব দেওয়া হত। প্রত্যেক বর্ণনাকারীর শিক্ষাগতযোগ্যতা পরীক্ষা করা হত এবং দেখা হত যে বর্ণনাকারী কোন বিষয়ে শ্রবণ করে ও বুঝে যথাযথভাবে অন্যের নিকট বর্ণনা করতে সক্ষম কিনা। আসমাউর রিজাল নামে জীবনালেখ্য সম্বলিত অভিধান সংকলিত করা হয়েছিল যাতে বর্ণনাকারীদের কার্যকলাপ ও চরিত্রের পুংখানুপুংখ বর্ণনা থাকত। এগুলি সহীহ হাদীস সংগ্রহে ও সংকলনে অনেক সাহায্য করেছিল। এছাড়াও দেওয়ানী আদালতে যার সাক্ষ্য গৃহীত হতে পারে হাদীস বর্ণনাকারীকে এরূপ যোগ্যতার অধিকারী হতে হত।

খ. দিরায়াত বা যৌক্তিকতা: এ পদ্ধতিতে হাদীসের বিষয়বস্তুর যৌক্তিকতা প্রমাণ করা হত। দিরায়াতের নীতিসমূহ নিম্নে বর্ণিত হল। হাদীসের বিষয়বস্তু সত্য হতে হবে এবং বর্ণনাকারী অবশ্য ঘনিষ্ঠভাবে বলতে হবে রাসুল বিষয়টি করেছেন বা বলেছেন। কোন বর্ণনা স্বীকৃত ঐতিহাসিক বক্তব্যের বিরোধী হলে তা পরিত্যাজ্য। বিশেষ কোনো শ্রেণীর বিশেষত: শিয়া বা খারেজীদের নিজস্ব মতবাদের সমর্থনের অথবা তাদের প্রতিদ্বন্দ্বিদের বিরুদ্ধে কোন হাদীস

বর্ণিত হলে তা গ্রহণ করা হত না। কোন হাদীস যুক্তি অথবা সাধারণ বুদ্ধি অথবা ইসলামের সুস্পষ্ট শিক্ষার বিরোধী হলে তা প্রত্যাখ্যান করা হত। কোন হাদীস বর্ণনার সময় পরিস্থিতি সম্পর্কে জালিয়াতির প্রমাণ পাওয়া গেলে সে হাদীস অগ্রাহ্য হত। কোন হাদীস সকলের জানা বা আচরিত হওয়া উচিত হওয়া সত্ত্বেও শুধু একজন বর্ণনাকারী দ্বারা বর্ণিত হলে তা অগ্রাহ্য হত এবং গ্রহনীয় হতনা। কোন হাদীস সামান্য পাপের জন্য কঠিন শাস্তির অথবা সামান্য নেক কাজের জন্য বিরাট পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি থাকলে সে হাদীস বর্জিত হত। কোন হাদীস সার্বজনীনভাবে স্বীকৃত রাসুলের (সা.) বাণীর বিরোধী হলে বর্জিত হত। কোরআনের বর্ণনার সাথে সামঞ্জস্যহীন বা তাঁর পরিপন্থি কোন হাদীস গ্রহণযোগ্য হত না।

হাদীসে রাসূলের প্রয়োজন

রাসূলে খোদা বিদায় হজ্জের ভাষণে বলেছেন, "দু'টি জিনিস তোমাদের মাঝে রেখে যাচ্ছি।"

যতক্ষণ তোমরা এ দুটি জিনিস দৃঢ়ভাবে ধারণ করবে কখনো তোমরা পথভ্রষ্ঠ হবে না। এ দুটি জিনিস হল আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নত।"

কোরআন মুসলিম জনতাকে নবীর (সা.) কার্যাবলী ও উপদেশ অনুসরণ করতে নির্দেশ দিয়েছে।

"তোমরা আল্লাহ এবং রাসূলের আনুগত্য কর।" অন্যত্র কোরআনে বর্ণিত হয়েছে, "বল যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাস তাহলে আমাকে অনুসরণ কর। তবে আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন।"

এভাবে বহু আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মুসলমানদেরকে রাসূলের পদাঙ্ক অনুসরণ ও অনুকরণ এবং তাঁর আদেশ নিষেধ মোতাবেক চলার জন্য আহ্বান করেছেন।

ইতিপূর্বে বলা হয়েছে কোরআন মজিদ মুসলিম জীবন ব্যবস্থার প্রধান উৎস। ইসলামের সাথে সম্পর্কিত সকল আইন বিধির ব্যাপারে কোরআনের কর্তৃত্ব সর্বজন স্বীকৃত ও চূড়ান্ত। কোরআনে শুধু মানব জীবনের প্রয়োজনীয় আইনী বিধানের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেখা যায়। মৌলিক নীতি হিসেবে এ বিধানগুলির বর্ণনা কোরআনে দেওয়া হয়েছে। মুসলিম জাতির জীবন যাত্রার প্রয়োজনীয় অত্যাবশ্যকীয় নিয়মাবলীর বিস্তারিত আলোচনা কোরআনে নেই। তাই এসব বিধি বিধানের বাস্তব প্রয়োগের জন্য রাসূলের কার্যাবলী ও আদেশ উপদেশের

উপর নির্ভরশীল। মহানবী তাঁর জীবদ্দশায় বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে এ সকল বিধি বিধানের বাস্তবরূপ দিয়ে গেছেন। রাসূলে খোদার এসব বাস্তব কার্যাবলী, আদেশ নিষেধগুলিই কোরআনে বর্ণিত মূলনীতিগুলির ব্যাখ্যা। যেমন, ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় চারটি গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় বিষয় কোরআনে আলোচিত হয়েছে যা আল্লাহ কর্তৃক মুসলমানদের জন্য অবশ্য পালনীয় হিসেবে নির্ধারিত করে দিয়েছেন। এগুলি হচ্ছে সালাত, সাওম, হাজ্জ ও যাকাত। কোরআনে শুধু বলা হয়েছে নামাজ কায়েম কর ও যাকাত দাও। নামাজ কায়েম ও যাকাত আদায়ের জন্য কোরআনে বহু স্থানে বলা হয়েছে কিন্তু নির্দিষ্টভাবে কিরূপে পালিত হবে তা কিন্তু বলা হয়নি। এ সম্বন্ধে বিস্তারিত বর্ণনা পাওয়া যায় রাসূলের কার্যাবলীতে যা হাদীস হিসেবে প্রসিদ্ধ। তাঁর হাদীসে নামাজ ও যাকাত সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা পাওয়া যায় যা তিনি তাঁর সহচরদেরকে হাতে কলমে শিক্ষা দিয়ে গিয়েছেন। একইভাবে সাওম ও হজ্জ সম্পর্কেও ইহা প্রযোজ্য। শুধু মৌলিক নীতি কোরআনে বর্ণিত হয়েছে যার বিস্তারিত প্রায়োগিক ব্যাখ্যা নেই, যা পাওয়া যায় একমাত্র হাদীসে রাসূলে। রাসূল (সা.) তাঁর হাদীস মারফত কোরআনে বর্ণিত বিধি বিধানের ব্যাখ্যা দিয়ে গেছেন এবং তা বাস্তব জীবনে প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। সুতরাং দেখা যায় যে, হাদীস হচ্ছে কোরআনের ভাষ্য ও ব্যাখ্যা। হাদীস ব্যতিত কোরআনের উক্তি ও মূলনীতির বোধগম্য ব্যাখ্যা অসম্ভব। মুসলমানদের ধর্মীয়, সামাজিক, নৈতিক, রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক কার্যকলাপের পালনীয় নির্দেশ রাসূলে খোদার আদেশ নিষেধ ও কার্যক্রমের মাঝে পাওয়া যায়। তাই মুসলিম মনীষিগণ গুরুত্বসহকারে ও নিষ্ঠার সাথে হাদীসে রাসূলের সংগ্রহ তার হেফজকরণ, লিখন, সংকলন ও গ্রন্থায়নে বিশেষ অগ্রণী ভূমিকা রাখেন যা হাদীস হিসেবে প্রসিদ্ধি পায়। আমরা সংশয়হীনভাবে বলতে পারি যে, হাদীস হচ্ছে কোরআনের পরিপূরক, কোরআনে বর্ণিত মূলনীতি সমূহের ব্যাখ্যা। কোরআন প্রদত্ত ইসলামী জীবন বিধান হাদীস ছাড়া অপূর্ণ। তাই বলা হয় কোরআন যেমন মুসলমানদের জীবন ব্যবস্থার প্রথম উৎস তেমনি হাদীসে রাসূল হচ্ছে দ্বিতীয় উৎস।

হাদীস ও কোরআনের পার্থক্য

আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি যে, আল কোরআনের ব্যাখ্যা হচ্ছে মহানবীর হাদীস যা ঐশী প্রেরণার মাধ্যমে রাসূল (সা.) পেয়েছেন। পবিত্র

কোরআনে বর্ণিত আছে, "রাসূল কখনও ইন্দ্রিয়জাত কারণে কথা বলেন না। (তিনি) যা বলেন তা আল্লাহ প্রদত্ত ওহী।" পার্থক্য শুধু এই যে, কোরআন সরাসরি আল্লাহ কর্তৃক জিব্রাইলের মাধ্যমে অক্ষর ও শব্দসহ নাজিল হয়েছে। হাদীস কিন্তু তা নয় এ জন্য কোরআন ও হাদীসের ভাষায় অনেক পার্থক্য দেখা যায়। এখানে হযরত ইমরান ইবনে হোসায়েনের মজলিসে একজন লোক তাঁকে কোরআন ব্যতিত অন্য কিছু বর্ণনা না করতে অনুরোধ করেন। তখন তিনি সে ব্যক্তিকে বললেন, "তুমি কি ভেবে দেখেছ, তোমাকেও তোমার সঙ্গী সাথীদেরকে যদি কোরআনের উপরই নির্ভরশীল করে দেওয়া হয় তাহলে কি তুমি জোহরের চার রাকাত, আছরের চার রাকাত ও মাগরীবের তিন রাকাত নামাজের উল্লেখ কোরআনে পাবে।" কোরআন মজিদে কি তুমি সাতবার বায়তুল্লাহর তাওয়াফ, আরাফাত ময়দানে অবস্থান করা এবং পাথর নিক্ষেপ করার নিয়মাবলী ও বিধান দেখতে পাও? চোরের হাত কাটার নির্দেশ কোরআন দেওয়া হয়েছে কিন্তু চোরের হাত কোন স্থান হতে কাটতে হবে? এখান হতে না ওখান হতে তা কি কোরআনে লিখা আছে।"

অপর এক ব্যক্তি ও হযরত ইমরান ইবনে হোসাইনকে বললেন, "আপনারা আমাদের নিকট এমন সব হাদীস বর্ণনা করেন যার কোন মূল ভিত্তি কোরআনে খুঁজে পাই না। তিনি ক্ষুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, 'তোমরা চল্লিশ দিরহামে এক দিরহাম যাকাত দিতে হবে। এত এত উষ্ট্রে একটি উষ্ট্র দিতে হবে, এত এত বকরীতে একটি বকরী দিতে হবে- যাকাতের নিসাব কি কোরআনে দেখেছ? সে ব্যক্তি না সূচক উত্তর দিল। তখন হযরত ইমরান বললেন, তাহলে যাকাতের এ বিস্তারিত বিধি বিধান, তোমরা কোথা থেকে জানতে পারলে? এ সবই তোমরা আমাদের (সাহাবীদের) থেকে জানতে পেরেছ। আর আমরা তা রাসূলে খোদার নিকট হতে লাভ করেছি।" তাই মোহাদ্দেসগণ এ মূলনীতিতে উপনীত হয়েছেন যে, সমগ্র বিষয়ের মূল বিধান কোরআনে উল্লেখ রয়েছে কিন্তু উহার শাখা প্রশাখা খুঁটি নাটি ও ব্যবহারিক নিয়মনীতি সবই রাসূলের (সা.) হাদীস থেকে গ্রহণ করা হয়েছে।

হাদীসের প্রতি সাহাবা (রা.)দের গুরুত্ব প্রদান

হাদীসের গুরুত্ব অনুভব করে সাহাবাগণ রাসূলে খোদার জীবদ্দশায় একে অপর থেকে তাঁর প্রতি দিনের কার্য্য বিবরণী জানতে সচেষ্ট থাকতেন। তাঁর ইনতেকালের পর হাদীসের গুরুত্ব আরও বেড়ে যায়। কারণ তখন ইসলামী

রাষ্ট্র দ্রুত বিস্তৃতি লাভ করছিল। দলে দলে বিজিত এলাকার মানুষেরা ইসলাম গ্রহণ করে। এসব নবদিক্ষিত মুসলমানদের রাসূল সম্বন্ধে জানার ব্যাকুলতা ও ইসলামী বিধি বিধান সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হওয়ার উদগ্র বাসনা তাদেরকে রাসূলে খোদার সহচরদের নিকট হতে হাদীস জানার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করে। এছাড়া নিত্য নতুন সমস্যার উদ্ভব ও তার সমাধানের জন্য মুসলিম সমাজে হাদীসকে পথ প্রদর্শক হিসেবে গ্রহণ করা হয়। সাহাবাগণ রাসূলের ইন্তেকালের পর গুরুত্ব অনুভব করে তার প্রচার ও প্রসারের জন্য ব্যাপক ব্যবস্থা নেন। তাঁরা মুসলিম জাহানের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়েন এবং প্রত্যেক সাহাবীকে কেন্দ্র করে হাদীস শিক্ষার কেন্দ্র গড়ে উঠে। এসব শিক্ষা কেন্দ্রের মধ্যে মক্কা, মদিনা, কুফা ও বসরা বিশেষ প্রসিদ্ধি পায়।

মক্কা কেন্দ্রঃ মক্কা শিক্ষা কেন্দ্রের পরিচালনায় ছিলেন ইবনে আব্বাস, আবদুল্লাহ ইবনে জোবায়ের এবং তাঁদের শিষ্যগণ। ইবনে আব্বাস বহু সংখ্যক হাদীস সংগ্রহ ও সংকলন করেন।

মদিনা কেন্দ্রঃ মদীনা ছিল হাদীসের প্রধান কেন্দ্রস্থল। হযরত আয়েশা সিদ্দিকা, আবদুল্লা ইবনে ওমর, আবু হোরায়রা, আনাস ইবনে মালিক এবং তাঁদের শিষ্যগণ এ কেন্দ্রের মধ্যমনি ছিলেন।

কুফা কেন্দ্রঃ হযরত ওমর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কুফা শহর ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতির অন্যতম কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয় এবং হাদীস শিক্ষার অন্যতম বিদ্যাপীঠ হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

কুফা কেন্দ্রের নেত্রীস্থানীয় হাদীস প্রশিক্ষক হলেন হযরত আলী, ইবনে মাসউদ, আনাস ইবনে মালিক, আমর ইবনে শাবী ও আবু মূসা আল আশারী রাজিআল্লা হু আনহুম। ইবনে মাসউদ ৯৪৮টি হাদীসের সংকলক এবং ইবনে শাবী কয়েকশত সাহাবী থেকে হাদীস সংগ্রহ করেছেন। ইমাম আবু হানিফা ইবনে শাবীর সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ শিষ্য।

বসরা কেন্দ্রঃ বসরা কেন্দ্রের পরিচালনায় ছিলেন ইমাম হাসান আল বসরী, যুহুরী এবং তাঁদের শিষ্যবর্গ। হাসান আল বাসরী বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সত্তরজন সাহাবায়ে কেরামের সান্নিধ্য লাভ করেন। তিনি ছিলেন একজন প্রখ্যাত হাদীস বেত্তা এবং তাঁর শিষ্য সংখ্যা ছিল সর্বাধিক। যুহুরী হলেন হাদীসের সর্বপ্রথম সংগ্রাহক ও সংকলক। কুফা ও বসরা কেন্দ্র ইরাকী কেন্দ্র নামেও প্রসিদ্ধ।

এ কয়টি কেন্দ্র ছাড়াও মিশরে আমর ইবনে আল আস, সিরিয়ায় আবু সায়ীদ আল খুদরী (রা.) হাদীস প্রশিক্ষণের দায়িত্ব পালন করেন। এমনিভাবে অন্যান্য সাহাবীগণ যিনি যেখানে গিয়েছেন হাদীস শিক্ষা দানকে সমস্ত করণীয় কাজের উপর অগ্রাধিকার দিয়েছেন। "রাসূলের সুন্নাহর গুরুত্ব উপলব্ধি করে সাহাবায়ে কেরাম হাদীসের প্রশিক্ষণদানে ব্রতী হন। এ ব্যাপারে তাদেরকে উৎসাহিত করেছিল রাসূলের নির্দেশ, যা ছহীহ বোখারীতে বর্ণিত আছে। অপর হাদীসে বর্ণিত আছে, মালেক ইবনে হোয়াইরেস বলেন, "নবী করীম আমাদের বলেছেন, তোমরা তোমাদের পরিবার পরিজনদের নিকট ফিরে যাও এবং তাদেরকে শিক্ষা দাও।" হুজ্জাতুল বিদয়ার খোতবায় লক্ষাধিক লোকের সম্মুখে রাসূলে খোদা বলেছেন, "প্রত্যেক উপস্থিত ব্যক্তি যেন, অনুপস্থিত ব্যক্তির নিকট এ উপদেশ ও নির্দেশ পৌছে দেয়।"

উপরে বর্ণিত নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে রাসূলের সহচরগণ হাদীস সংগ্রহ হেফজকরণ, প্রশিক্ষণ ও প্রচারে তৎপর ছিলেন। সুন্নাতে রাসূল সম্বন্ধে অবগত হওয়ার আগ্রহ ও উৎসাহের কারণে তাদের অনেকে নিজেদের জীবন এ কাজে উৎসর্গ করে দিয়েছেন। এসব সাহাবা আছহাবে ছোফফা নামে খ্যাত। যারা নানা কারণে রাসূলের দরবারে সর্বক্ষণ হাজির থাকতে অপারগ ছিলেন তাঁরা সুযোগ পেলেই তাঁর খিদমতে উপস্থিত হতেন বা অন্যের নিকট হতে পরবর্তীকালে তাঁদের অনুপস্থিতিতে কি ঘটেছে তা জেনে নিতে সচেষ্ট ছিলেন। ছহীহ বোখারী বর্ণিত এ হাদীসটি প্রনিধানযোগ্য। "হযরত ওমর ফারুক (রা.) বলেন, আমি আমার এক আনসারী প্রতিবেশী (উতবান ইবনে মালিক) আওয়ালীতে (যা মসজিদে নববী থেকে দুরে ছিল) বাস করতাম। তাই আমরা হুজুরের খেদমতে হাজির হওয়ার জন্য পালা ঠিক করে নিয়েছিলাম। তিনি একদিন রাসূলের খেদমতে হাজির থাকতেন আর আমি অন্যদিন রাসূলের খেদমতে হাজির থাকতাম। যেদিন আমি হাজির থাকতাম সেদিন ওহী এবং অন্যান্য বিষয়ের খবর আমি তাকে দিতাম। অনুরূপ তিনিও তা করতেন।" তাঁরা শুধু যে, রাসূলে খোদার জীবনকালেই তাঁর হাদীস সংগ্রহে ব্যস্ত ছিলেন তাই নয় বরং তাঁর ইন্তেকাল পরবর্তীকালে তাঁদের এ তৎপরতা শতগুণে বৃদ্ধি করেন।

রাসূলের (সা.) ইন্তেকালের পর কোন কোন সাহাবী অপর সাহাবীগণের নিকট হতে হাদীস সংগ্রহ করতে শতশত মাইল সফর করেছেন। সে সময় সফর ছিল কষ্টকর। এখনকার মত সহজ সাধ্য ছিল না। আবু আইয়ুব আনসারীর ন্যায় মর্যাদাবান প্রবীণ সাহাবী ওকবা ইবনে আমেরের নিকট হতে

একটি মাত্র হাদীস জানার জন্য মদীনা থেকে মিসর পর্যন্ত সফর করেছিলেন। হযরত আনাস ও জাবের ইবনে আবদুল্লাহ হযরত ওনায়েদের নিকট হাদীস জিজ্ঞাসার জন্য সিরিয়া গমন করেন। এভাবে আর একজন সাহাবী হযরত ফোজালা ইবনে ওবাইদের নিকট হতে হাদীস জানার জন্য মিসর যান। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস হাদীস সংগ্রহের জন্য দ্বারে দ্বারে খোঁজ নিতেন।

সাহাবীদের হাদীস বর্ণনায় সতর্কতা

এতদসত্ত্বেও সাহাবাগণ ছিলেন হাদীস বর্ণনায় খুব সতর্ক। যার কারণ ছিল রাসূলের সতর্কবাণী। হযরত আনাছ ইবনে মালিক (রা.) বলেন, "নবী করিম এরশাদ করেছেন যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে আমার সম্পর্কে মিথ্যা বলে, সে যেন তার আশ্রয়স্থল জাহান্নামে খুঁজে নেয়।" হযরত আবু হোরায়রা থেকে বর্ণিত আছে, "যে ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্বক আমার সম্পর্কে মিথ্যা কথা বলবে সে যেন জাহান্নামে তার আশ্রয়স্থল বানিয়ে নেয়।" এভাবে হযরত মুগীরা ইবনে শো'বা থেকেও একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। বিভিন্ন সাহাবীর সামান্য শাব্দিক পার্থক্য সহকারে বর্ণিত উল্লিখিত তিনটি হাদীসের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় এক। এ হাদীসগুলি ছহী মুসলিম গ্রন্থে বিবৃত হয়েছে।

বস্তুত, হাদীস বর্ণনা সম্পর্কে রাসূলে খোদার এসব কঠোর সাবধানবাণীর কারণে সাহাবাগণ রাসূল সম্পর্কে কোন কথা বলতে ভয় পেতেন। এজন্য অতি মাত্রায় সতর্কতা ও সাবধানতা অবলম্বন করতেন। এমনকি রাসূল সম্পর্কে অসাবধানতা বশতঃ কোন ভুল কথা বলার আশংকায় অনেক ছাহাবীই হাদীস বর্ণনা থেকে বিরত থেকেছেন। এখানে কয়েকজন সাহাবীর কয়েকটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য।

ক) হযরত যোবায়ের (রা.) কোন হাদীস বর্ণনা করতেন না। একদিন হযরত আবদুল্লাহ (রা.) হাদীস বর্ণনা না করার কারণ জিজ্ঞেস করলেন। উত্তরে তিনি বলেন যদিও রাসূলের সাথে আমার বিশেষ সম্পর্ক ছিল তবুও যেহেতু রাসূলকে বলতে শুনেছি; যে ব্যক্তি আমার সম্বন্ধে মিথ্যা বলবে সে যেন জাহান্নামে তার ঠিকানা বানিয়ে নেয়। তাই ভয়ে হাদীস বর্ণনা করি না।

খ) হযরত শাবী বলেন, আমি এক বছর পর্যন্ত হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমরের সান্নিধ্যে ছিলাম। তিনি এ সময়ের মধ্যে কোন হাদীস বর্ণনা করেন নি। হযরত সায়ের ইবনে ইয়াজিদ বলেন, আমি হযরত তালহা ইবনে আবদুল্লাহ, হযরত সায়াদ ইবনে মিকদাদ ও আবদুর রহমান ইবনে

আওফের নিকট বহুদিন থেকেছি কিন্তু তাঁদেরকে হাদীস বর্ণনা করতে দেখিনি। তবে হযরত তালহা কেবল উহুদ যুদ্ধের দিন সম্পর্কে হাদীস বর্ণনা করতেন।

গ) হযরত সায়ের ইবনে ইয়াজিদ (রা.) বলেন, আমি মদীনা থেকে মক্কা পর্যন্ত হযরত সায়াদ ইবনে মালিকের সাথে একত্রে সফর করেছি। এ দীর্ঘ পথে তাঁর মুখ হতে একটি হাদীসও শুনতে পাইনি।

ঘ) একবার কিছু লোক হযরত জায়েদ ইবনে আরকামকে (রা.) হাদীস বর্ণনা করার জন্য অনুরোধ করেন। উত্তরে তিনি বললেন, "বৃদ্ধ হয়েছি, ভুলে গিয়েছি, হাদীস বর্ণনা করা কঠিন কাজ।" সাবধানতা অবলম্বনের কারণে বহু সংখ্যক রাসূলের ঘনিষ্ঠ সাহাবী খুব কম সংখ্যক হাদীস বর্ণনা করেছেন।

হাদীস লিখন

হাদীস লিখার ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায় হাদীস লিখন তিন স্তরে বিভক্ত। প্রথমত, কিতাবত বা লিখন। সাহাবা ও প্রবীন তাবেয়ীনদের যুগে সামগ্রীকভাবে হাদীস একত্র করা হয়নি। তাঁরা শুধু যে সব হাদীসকে প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ মনে করতেন তা লিখে নিতেন। এরূপ লিখাকে কিতাবত বা লিখন পর্যায় বলা যায়। দ্বিতীয় তাদবীন, অত:পর প্রথম শতাব্দীর শেষ দিকে প্রসিদ্ধ তাবেয়ী ইবনে সেহাব যোহরীই প্রথম রাসূলের (সা.) হাদীস সমূহকে সামগ্রিকভাবে একত্র করার প্রচেষ্টা নেন। আর এরূপ লেখাকে তখন তাদবীন নামে অভিহিত করা হয়। আবদুল আজিজ দারাওয়ার্দির কথা থেকে জানা যায়, তিনি বলেন, ইবনে সেহাবই সর্ব প্রথম হাদীসের তাদবীন করেছেন এবং লিখেছেন। জামেয় ফাতহুলবারীতে উল্লিখিত আছে, "সর্ব প্রথম ইবনে সেহাব যোহরীই প্রথম শতাব্দীর একেবারে শেষের দিকে খলিফা ওমর ইবনে আবদুল আজিজের নির্দেশে হাদীস তাদবীন করেন। অত:পর তা ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করে। এরপর আরম্ভ হয় তাছনীফ যা দ্বারা বহু কল্যাণ সাধিত হয়।" এ সময় হাদীস সমূহকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী বিষয়ভিত্তিক অধ্যায় উপ-অধ্যায় অনুসারে সাজানোর ব্যবস্থা হয়।

তাছনীফ: তাদবীনের পরবর্তী পর্যায় হচ্ছে তাছনিফ যা হাদিসকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিষয়ভিত্তিক সাজানো হয়। এ প্রচেষ্টা হিজরীর দ্বিতীয় শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় আরম্ভ হয়।

রাসূলের (সা.) সময়ের লিখন

রাসূলে খোদার ইন্তেকাল পর্যন্ত একাদশ হিজরীর প্রথম দিকে ইয়ামান, বাহরাইন হতে সিরিয়ার সীমান্ত পর্যন্ত প্রায় দশ লক্ষ বর্গমাইল আরব ভূমির উপর ইসলামের আধিপত্য স্থাপিত হয়। এ বিরাট রাষ্ট্রের শাসন উপলক্ষে রাসূলে করীম (সা.) বহুকার্যক্রম এ সময় লিখিতভাবে সম্পাদন করেন। সরকারী কর্মচারী এবং জনসাধারণের নিকট নানা বিষয় নানাবিধ নিয়ম নির্দেশ প্রেরণ করেন এবং বিভিন্ন চুক্তিও সম্পাদন করেন। এসব তিনি লিখিতভাবে করে ছিলেন। নিম্নে কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হলো-

ক) মদিনার সনদ যা ছিল বায়ান্ন (৫২) দফা সম্বলিত একটি শাসনতন্ত্র। মদিনা ভিত্তিক সম্মিলিত মোহাজের, আনসার, তথাকার ইহুদী এবং অন্যান্য আরব সম্প্রদায়ের জন্য একটি নাগরিক রাষ্ট্র গঠনের জন্য রচনা করেন এই শাসনতন্ত্র। এ রাষ্ট্রের সীমানাও নির্ধারিত করেছিলেন যা পরিশিষ্ট আকারের শাসনতন্ত্রের সাথে স্বতন্ত্রভাবে সংযুক্ত করা হয়েছিল। তাছাড়া তখন তিনি মদিনার লোক গননাও লিখিতভাবে বিবরণদানের জন্য কতিপয় সাহাবীকে নির্দেশ দেন।

খ) ইতিহাস প্রসিদ্ধ হোদায়বিয়ার সন্ধি মক্কাবাসীদের সাথে লিখিতভাবে সম্পাদিত হয়েছিল।

গ) দ্বিতীয় হিজরীতে বনু জামরার সাথে চুক্তি, খন্দকের যুদ্ধকালীন সময় বানু ফাজরাহ ও গাতফান গোত্রের সাথে যে সন্ধি হয় তাও লিখিত ছিল। নাজরানের খৃষ্টানদের সাথে চুক্তি, বনী ছক্বীফদের সাথে চুক্তি, হাজরবাসীদের সাথে চুক্তি, আয়লাবাসীদের নিরাপত্তা পত্র, খোজাআহ গোত্রকে আগান পত্র, রাসূল (সা.) লিখিতভাবে দিয়েছিলেন।

ঘ) রাসূল (সা.) কোন কোন সাহাবীকে সরকারী ভূমি দান করেছেন ভূমিদান পত্রের মাধ্যমে। যেমন- বিলাল ইবনে হারিস মুজালীকে কাবালিয়াহ নামক খনি ভূমি প্রদান এবং হযরত আবু ছালাবা খূশানীর নামে ভূমিদান পত্র যা ওবাই ইবনে কা'ব লিখেছিলেন।

ঙ) তিনি বিভিন্ন রাজা বাদশাহদের ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানিয়ে চিঠি দিয়েছিলেন। এর মধ্যে প্রসিদ্ধ হলেন মিশরের শাসনকর্তা মাকাওকাছ, আবিসিনিয়ার শাসনকর্তা নাজ্জাশী, কাইজার ও ইরানের সম্রাট কিছরা। তাদের নিকট প্রেরিত চিঠিগুলোর বেশ কয়েকটির মূল চিঠি উদ্ধার করা গেছে।

চ) যে সকল ফরমান তিনি রাষ্ট্র নিয়োজিত শাসনকর্তা, সেনাপতি ও সরকারী কর্মচারীদেরকে প্রেরণ করেছিলেন তাও ছিল লিখিত। ইবনূল আবদুল বার বলেন, "রাসূলুল্লাহ (সা.) আমর বিন হাজম প্রমুখ শাসন কর্তাদের নিকট ছয় দফা রাজস্ব উসূলের নিয়ম এবং বিভিন্ন ফরজ ও ছুন্নত সমূহ সম্পর্কে লিখিত নির্দেশনামা দিয়েছিলেন।"

ছ) কোন কোন সাধারণ ব্যাপারেও রাসূল তাঁর অনুগামীদের লিখিত হেদায়েতনামা প্রেরণ করেছেন। তাঁর আদেশ, উপদেশ লিখে নিতে অনুমতি দিয়েছিলেন। বোখারীতে বর্ণিত হয়েছে, মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ দন্ডবিধি ও মানবাধিকার সম্পর্কে এক দীর্ঘ বক্তৃতা দেন। খুতবা শুনে ইয়ামানের আবু শাহ নামক এক সাহাবী রাসূলকে (সা.) বলেন, হুজুর আমাকে লিখে দিন। তখন রাসুল (সা.) অপর সাহাবীদেরকে লিখে দিতে বললেন, "তোমরা আবু শাহকে লিখে দাও।"

সাহাবীদের লিখন

সাহাবীদের এক অংশও রাসূলের অনুমতিক্রমে হাদীস লিখে ছিলেন। হযরত আবদুল্লাহ বিন আমর, হযরত জাবের বিন আবদুল্লাহ, হযরত আলী, হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ, হযরত আনাছ বিন মালিক, হযরত আবদুল্লাহ বিন আবু আওফ, হযরত সাদ বিন ওবায়দাহ, হযরত ছামুরাহ বিন জামদার এদের মধ্যে অন্যতম।

রাসূলে খোদা হাদীস লিখে নেওয়াকে নিরুৎসাহিত করেছেন। এ প্রসঙ্গে হযরত আবু সাঈদ বর্ণিত হাদীসটি প্রনিধানযোগ্য। "একদা কিছু সংখ্যক সাহাবী লিখছিলেন। তাদেরকে রাসূলে খোদা জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কি লিখছ? তারা জানাল যে, আপনার নিকট থেকে যা শুনতে পাই তাই লিখছি। তখন তিনি বললেন, "আল্লাহর কেতাবের সাথে আরেকটি কিতাব লিখা হচ্ছে নাকি?"

এজন্য রাসূলের বিশেষ অনুমতি ছাড়া সাহাবাগণ হাদীস লিখা থেকে বিরত থেকেছেন। কোরআন হাদীস সংমিশ্রিত হয়ে যাওয়া বা তাদের পার্থক্য করা কঠিন হওয়ার আশংকা থেকে রাসূলে খোদা আনুষ্ঠানিকভাবে হাদীস লিখা থেকে বিরত থাকতে বলেছিলেন। বিশেষ ক্ষেত্রে তিনি হাদীস লিখার অনুমতিও দিয়েছিলেন।

সাহাবী পরবর্তীকাল

ইতোপূর্বে আলোচিত হয়েছে যে, রাসূলের ইন্তেকালের পর নও মুসলিমদের রাসূল (সা.) সম্পর্কে জানার আগ্রহ এবং কোরআন ও ইসলামী বিধি বিধানের

ব্যাখ্যায় হাদীসের গুরুত্ব অনুভব করে সাহাবীগণ হাদীস প্রশিক্ষণ ও সংগ্রহের ব্যাপক তৎপরতা শুরু করেন। এজন্য বেশ কয়েকটি হাদীস চর্চার কেন্দ্রের উদ্ভব হয়। খলিফা ওমর ইবনে আবদুল আজিজের আদেশে আনুষ্ঠানিকভাবে হাদীস সংগ্রহ আরম্ভ হয়। তিনি ব্যাপকভাবে হাদীস সংগ্রহ করার জন্য মদিনার শাসনকর্তা আবুবকর ইবনে হাজমকে আদেশ দেন (১১৭হি.) এবং ইসলামী রাষ্ট্রের অন্যান্য প্রধান প্রধান কেন্দ্রের ওলামা ও সরকারী কর্মচারীদের প্রতি রাসূলে খোদার হাদীস সংগ্রহের জন্য ফরমান জারী করেন এবং সর্বপ্রথম হাদীস তাদবীনকারী হলেন।

অত:পর হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দী হতে হাদীসের সংকলন ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করে। এ সময়ে বহু মনিষী হাদীস সংকলনে অপরিসীম শ্রম ও মেধা নিয়োগ করেন। এর ফলশ্রুতিতে আমরা বেশ কিছু প্রসিদ্ধ হাদীসের সংগ্রাহক ও সংকলণ দেখতে পাই। হিজরী তৃতীয় শতাব্দী হচ্ছে হাদীস সংকলনের স্বর্ণ যুগ। এ যুগে হাদীস সংগ্রহ ও সংকলন পূর্ণতা লাভ করে। কয়েকজন প্রসিদ্ধ সংগ্রাহক ও সংকলকের নাম হচ্ছে ইমাম আবু হানিফা, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ইমাম মালিক, ইমাম বোখারী, ইমাম মুসলিম, ইমাম আবু দাউদ, ইমাম তিরমিজী, ইমাম নাছাঈ, ইমাম ইবনে মাজাহ। হিজরী তৃতীয় শতকে হাদীসের চর্চা, প্রচার, সংকলন ও গ্রন্থায়নের কাজে প্রভূত উন্নতি বকাশ, সম্প্রসারণ ও উৎকর্ষ সাধিত হয়। এ সময় হাদীস সংগ্রহকারীগণ হাদীসের সন্ধানে মুসলিম জাহানের প্রত্যেকটি কেন্দ্র ভ্রমন করেন এবং বিক্ষিপ্ত হাদীস সমূহ সংগ্রহ ও সংকলন করে বৃহাদাকার গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। বলা যায়, এ সময় রাসূলের (সা.) এমন কোন হাদীস বা সুন্নাহ ছিল না যা মুসলিম মনিষীদের দৃষ্টি বহির্ভূত ছিল বা সংগৃহীত হয়নি।

এ সময় মুসলিম সমাজে এমন এক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, যে কারণে হাদীস পর্যালোচনা ও সমালোচনা (উলুমূল জারহে ও ওয়াততাদিল) নামে এক স্বতন্ত্র জ্ঞানের শাখা প্রতিষ্ঠা লাভ করে। হযরত উসমান ও হযরত আলীর খেলাফতকালীন সময় হতে মুসলমানদের মাঝে বিভিন্ন বাতিল চিন্তাধারা ও মতবাদের উদ্ভব হয়। পরবর্তীকালে এসব ভ্রান্তগোষ্ঠী, ইসলাম বিরোধী শক্তি তাদের মতবাদের সমর্থনে বেশ কিছু জাল হাদীস সৃষ্টি করে মুসলমানদেরকে বিভ্রান্তিতে ফেলতে চেষ্টা করে। মুসলিম মনিষীগণ এর প্রতিরোধে তাঁদের সমস্ত শক্তি ও মেধাকে কাজে লাগান। এরই ফলশ্রুতি হচ্ছে হাদীস বিজ্ঞান। এ শতকে (তৃতীয়) বাছাই ও ছাটাইর পর সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ হাদীসের সমন্বয়ে

মনিষীগণ উন্নত ধরণের গ্রন্থ প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন করেন। এ বিরাট ও দুরূহ কাজের জন্য যে প্রতিভা ও দক্ষতা অপরিহার্য ছিল তা আল্লাহ তালার অপূর্ব মেহেরবাণীতে ভূষিত কয়েকজন মনিষীর তখন আবির্ভাব হয়। তাঁরা হচ্ছেন ছয়খানি বিশুদ্ধ হাদীস গ্রন্থ প্রণেতা ছয়জন শ্রেষ্ঠ হাদীসবিদ। যাঁরা হলেন- ইমাম বোখারী, ইমাম মুসলিম, ইমাম নাসাঈ, ইমাম তিরমিজি, ইমাম আবু দাউদ ও ইমাম ইবনে মাজাহ।

সাহাবী যুগে হাদীস যাচাই ও পর্যালোচনা

হাদীস বর্ণনায় সাহাবীগণ সকলেই আদেল বা সত্যবাদী ছিলেন কোন সাহাবী কখনো রাসূলুল্লাহর নামে মিথ্যা হাদীস বর্ণনা করেননি। তা সত্ত্বেও সাহাবীগণ নি:সংকোচে একে অপরের সমালোচনা করেছেন। এমনকি স্বয়ং খলিফার সমালোচনা করতেও দ্বিধা করেননি। তারা তাদের সমালোচনায় কোন সাহাবীর বিরুদ্ধে রাসূলে খোদার নামে মিথ্যা হাদীস বর্ণনার অভিযোগ আনেননি। হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, "আমরা (সাহাবীগণ) একে অন্যের প্রতি কোন প্রকার মিথ্যার অভিযোগ করতাম না। হযরত আয়েশা ছিদ্দিকা (রা.) হাদীস বর্ণনার ব্যাপারে হযরত আবু হোরায়রাকে বহু সমালোচনা করেছেন, কিন্তু কখনো বলেননি আবু হোরায়রা রাসূলের নামে মিথ্যা হাদীস বর্ণনা করেছেন। হযরত আবু বকর ও ওমর অনেক সাহাবীর নিকট তাদের বর্ণিত হাদীস সম্বন্ধে সাক্ষ্য তলব করেছেন। কিন্তু কখনও তারা মিথ্যা হাদীস বর্ণনা করেছেন বলে সন্দেহ প্রকাশ করেননি। তাঁদের সন্দেহের মূল কারণ ছিল ভুল বুঝা ও ভুলে যাওয়া। অর্থাৎ বর্ণনাকারী রাসূলল্লাহ থেকে যা শুনেছেন বা তাঁকে করতে দেখেছেন তার সঠিক মর্ম অনুধাবন করতে পেরেছেন কিনা এবং বর্ণনার সময় তা হুবহু স্মরণ রাখতে সক্ষম হয়েছেন কিনা তা প্রমাণ করার জন্য সাক্ষ্য তলব করতেন, মিথ্যা সন্দেহে নয়। হযরত মুগীরা বিন শো'বা (রা.) নানীর পক্ষে নাতির মীরাছ লাভের হাদীস বর্ণনা করলে হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) তাঁর নিকট সাক্ষ্য তলব করেন। হযরত আবু মুসা আশআরী একবার হযরত ওমরের বাড়ীতে গেলেন এবং বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে তিনবার সালাম উচ্চারণ করলেন। অন্দর মহল থেকে প্রবেশের অনুমতি সূচক কোন আভাস না পেয়ে ফিরে গেলেন। হযরত ওমর তাঁকে ডেকে পাঠালেন এবং ফিরে যাওয়ার কারণ জিজ্ঞেস করলেন। উত্তরে হযরত আবু মূসা বললেন, রাসূলুল্লাহ বলেছেন, "তিনবার সালাম জানানোর পরও যদি প্রবেশের অনুমতি

না পাওয়া যায় তাহলে বাড়িতে প্রবেশ না করে ফিরে যাবে।" একথা শুনার পর হযরত ওমর বললেন, আপনি যদি রাসূলুল্লাহর নিকট শুনে ঠিকভাবে স্মরণ রেখে থাকেন তবে তো ভাল নতুবা আমি আপনাকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেব। অতঃপর হযরত আবু মুসা যখন সাহাবী আবু সায়ীদ খুদরীকে সাক্ষী স্বরূপ উপস্থিত করলেন তখন হযরত ওমর তাঁকে শান্তনা দিয়ে বললেন, আবু মুসা! আমি আপনার প্রতি মিথ্যা বলা সন্দেহ করিনি। আমি তা এজন্য করেছি যেন অন্যরা রাসূলুল্লাহর নামে মিথ্যা হাদীস গড়ার সাহস না করে।

খলিফা ওমরের নিকট ফাতেমা বিনতে কায়েস (রা.) যখন একটি হাদীস বর্ণনা করলেন. যা তার মতে কোরআন ও সুন্নাহর বিপরীত। তখন তিনি বললেন, আমি এমন এক মেয়ে লোকের কথায় আল্লাহর কিতাব এবং নবীর সুন্নাহকে বাদ দিতে পারি না যার সম্পর্কে আমার জানা নেই। সে হয়ত রাসূলের কথা সঠিকভাবে স্মরণ রাখতে পারেনি বা ভুলে গেছে। এ বলে তিনি তাঁর হাদীসটি প্রত্যাখ্যান করলেন (জাময়ুল ফাওয়ায়েদ)।

হযরত আয়েশা সিদ্দিকার নিকট যখন বলা হল যে, হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর বলেছেন, "জীবিতদের ক্রন্দনের দরুণ মৃত ব্যক্তির আজাব হয়ে থাকে। তখন তার প্রতিবাদ করে বললেন, আল্লাহ আবু আবদুর রহমানকে মাফ করুন। অবশ্য তিনি মিথ্যা বলছেন না। তবে তিনি ভুলে গেছেন অথবা রাসূলের কথা ঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারেন নি। আসল ব্যাপার হচ্ছে রাসূলুল্লাহ (সা.) একজন সদ্য দাফনকৃত মেয়ে লোকের কবরের নিকট দিয়ে যাবার সময় বলেছিলেন, মেয়ে লোকটি কবরের আজাব ভোগ করছে আর তার পরিবারের লোকজন তাঁর জন্য কাঁদছে।"- বোখারী, মুসলিম

হাদীসের মর্মার্থগত পরীক্ষা

সাহাবীগণ হাদীসের মতন বা বক্তব্যের মর্মার্থগত পরীক্ষা ও পর্যালোচনা সূচনা করেছিলেন। যেমন হযরত ওমর ফাতেমা বিনতে কায়েস কর্তৃক বর্ণিত ইদ্দতকালীন খোরপোষ সম্পর্কীয় হাদীসটি এজন্য প্রত্যাখ্যান করেছেন যেহেতু হাদীসটি কোরআন ও প্রসিদ্ধ হাদীসের খেলাফ। এভাবে হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর কর্তৃক বর্ণিত হাদীস 'মৃত ব্যক্তির জন্য পরিবারস্থ লোকের ক্রন্দনের দরুণ কবরে তার আজাব হয়ে থাকে হযরত আয়েশা কর্তৃক এজন্য প্রত্যাখাত হয়েছে যেহেতু এটি কোরআনের বর্ণিত আয়াত- "একের গোনাহর বোঝা অন্য বহন করে না" এর বক্তব্যের বরখেলাপ। হযরত আবু হোরাইরাহ কর্তৃক বর্ণিত "আগুনে পাক করা জিনিষ খেলে ওজু

নষ্ট হয়ে যায়” হাদীসটি শুনে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বললেন, তাহলে গরমপানি পান করলেও তো ওজু নষ্ট হওয়ার কথা অথচ তা কেহ বলে না। আপনি হয়ত হুজুরের কথা বুঝেন নাই অথবা তা সঠিকভাবে স্মরণ রাখতে পারেননি। সুতরাং এ হাদীস গ্রহণযোগ্য নহে।” এভাবে সাহাবী হযরত ছাবেত যখন মেরাজ সম্পর্কীয় হাদীস এভাবে বর্ণনা করলেন, হুজুর বলেছেন, আমি বোরাককে বায়তুল মাকদাছের কড়ার সাথে বেঁধেছিলাম তখন সাহাবী হযরত হোজায়ফা (র.) বললেন, কেন? তা হতে পারে না, সে রাতে সমস্ত জিনিষকে হুজুরের অনুগত করে দেওয়া হয়েছিল। আপনি হুজুরের কথা বুঝতে পারেননি অথবা স্মরণ রাখতে পারেননি। এ ধরণের সাহাবীদের দেরায়াত গত বা মর্মার্থগত পরীক্ষার মাধ্যমে হাদীস পর্যালোচনার বহু ঘটনা হাদীস গ্রন্থাবলীতে বর্ণিত হয়েছে।

উপরে বর্ণিত ঘটনাবলী থেকে বুঝা যায় রাসূলে খোদার ইন্তেকালের পরবর্তীকালে যখন হাদীসের গুরুত্ব বেড়ে যায় তখন হাদীসের সংগ্রহ, প্রচার ও প্রশিক্ষণে মুসলিম সমাজের ব্যাপক আগ্রহ ও অংশ গ্রহণ পরিলক্ষিত হয়। বিশেষভাবে রাসূলের সহচরগণ হাদীস বর্ণনা ও প্রশিক্ষণে অগ্রণী ভূমিকা নেন। রাসূলের হাদীস অন্য সাহাবীদ্বারা সমর্থিত হওয়া ছাড়া গ্রহণ করেননি। এ ব্যাপারে প্রথমসারির সাহাবীদের বর্ণনাও বাদ পড়েনি। এছাড়া হাদীসের মতনের মর্মার্থ ও তাদের পর্যালোচনা ও সমালোচনা থেকে মুক্ত ছিল না। এ সূত্র ধরে পরবর্তীকালে মোহাদ্দেস ও মনিষীগণ হাদীসের সঠিকতা যাচাইয়ের জন্য বিস্তারিত নিয়মকানুন প্রণয়ন করেন যা পরবর্তী পর্যায়ে আলোচনা হবে।

সাহাবী পরবর্তীকালে জাল হাদীস ও তার প্রতিরোধ ব্যবস্থা

মোতাওয়াতার সূত্রে প্রাপ্ত রাসূলের হাদীস যা হযরত আনাছ ইবনে মালিক, হযরত আবু হোরাইরাহ ও হযরত মুগীরা ইবনে সোবা কর্তৃক বর্ণিত যার প্রতিপাদ্য হচ্ছে, রাসূল সম্পর্কে বা তাঁর নামে তাঁর কথা বলে চালিয়ে দেওয়া অত্যন্ত গর্হিত ও গুনাহর কাজ। নবী করীম (স.) এরূপ কাজ সম্পর্কে কঠোর নিষেধাজ্ঞা উচ্চারণ করেছেন এবং এ ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বনের আহ্বান জানিয়েছেন। যদ্দরুন রাসূলের সহচরগণ হাদীস বর্ণনায় বিশেষ সতর্কতার সাথে অগ্রসর হতেন। তাই দেখা যায় রাসূলের বহু ঘনিষ্ঠ সহচর খুব কম সংখ্যক হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইতোপূর্বে আমরা আলোচনা করেছি সাহাবীদের সবাই হাদীস বর্ণনায় সত্যবাদী। তাই তারা ভুল ও মনগড়া হাদীস কখনো বর্ণনা করেননি। সম্পূর্ণ বুঝার অপারগতা বা স্মরণ শক্তির দুর্বলতার দরুণ হয়ত কখনও কোন হাদীস সঠিকভাবে বর্ণিত হয়নি। যা তাঁদের অনিচ্ছাকৃত ছিল।

হযরত উসমান ও হযরত আলীর (রা.) খিলাফতকালীন সময় থেকে পরবর্তীকালে মুসলিম সমাজে নানাবিধ মতবিরোধ সৃষ্টি হওয়ায় পরস্পর বিরোধী গোষ্ঠি নিজেদের অবস্থানের সমর্থনে রাসূলের নামে মনগড়া হাদীস সৃষ্টি করার প্রয়াস পায়। হিজরী তৃতীয় শতকে এ প্রবণতা মহামারী আকার ধারণ করে। এ প্রবণতা প্রতিহত করে জাল বা মনগড়া হাদীসকে সঠিক হাদীস থেকে পৃথক করার জন্য বিশিষ্ট মোহাদ্দেস ও মনিষীগণ উলুমে আল-জারহে ওয়া তাদীল বা হাদীস সমালোচনা ও পর্যালোচনা শাস্ত্রের উদ্ভাবন করেন। যা হাদীস বিজ্ঞান নামে সাধারণ্যে পরিচিত।

হাদীস জাল করণের কারণ

রাসূলের ওফাত পরবর্তীকালে মুসলিম সমাজ আত্মকলহে লিপ্ত হয়। হযরত উসমানের (রা.) মৃত্যু, হযরত আলীর খিলাফত, হযরত আয়েশা, মোয়াবীয়া কর্তৃক তাঁর বিরোধীতা, জামাল ও সিফফিনের যুদ্ধ পরবর্তীকালীন সময় মুসলমান সমাজের রাজনৈতিক মত পার্থক্য বৃদ্ধি হয়। ফলশ্রুতিতে খারিজী ও শীয়া সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হয়। মুসলিম সাম্রাজ্যের ব্যাপক প্রসার ও বিভিন্ন রাজনৈতিক ও ধর্মীয় মত বিরোধ জনিত কারণে জাল বা মিথ্যা হাদীসের প্রচলন আরম্ভ হয়। নিম্নলিখিত কারণে জাল হাদীস বর্ণনার প্রবণতা দেখা যায়।

১। রাজনীতি ক্ষেত্রে নিজেদের মত প্রতিষ্ঠা ও প্রাধান্য স্থাপন, নিজেদের আচরিত রাজনৈতিক মতাদর্শকে প্রমাণিত করার উদ্দেশ্যে এবং তা জনগণের নিকট গ্রহণযোগ্য করার মানষে হাদীস জাল করা হয়। খারিজী ও শীয়া সম্প্রদায় সর্বপ্রথম রাজনৈতিক কারণে হাদীস জাল করা শুরু করে। মিথ্যা ও জাল হাদীস প্রচার যেহেতু খারিজী মতাদর্শের সাথে সাংঘর্ষিক তাই এ ব্যাপারে তারা বেশী দুর এগুয়নি। তাদের মতাদর্শ মতে গুনাহে কবীরা সংঘটনকারী কাফির হয়ে যায়। যেহেতু মিথ্যা বলা গুনাহে কবীরাহ তাই রাসূলের নামে মিথ্যা হাদীস বর্ণনাকারীও কাফির হয়ে যাবে। এজন্য খারিজীদের দ্বারা মিথ্যা বা জাল হাদীস বর্ণনার প্রবণতা নিজ থেকে শেষ হয়ে যায়। এখানে খুব অল্প সংখ্যক মিথ্যা হাদীস তাদের দ্বারা রচিত হয়েছে। শীয়া সম্প্রদায় কিন্তু হাদীস জালের ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। নবী করিম (সা.) এর পর হযরত আলী খলিফা হওয়ার অধিকারী; অন্য কেহ নয়, তা প্রমাণের জন্য তারা এরূপ হাদীস রচনা করেছিলেন। উদাহরণ স্বরূপ চারটি হাদীসের উদ্ধৃতি দেওয়া গেল।

ক) রাসূলে খোদা (সা.) বিদায় হজ্জ হতে প্রত্যাবর্তনের সময় গাদীরে খাম নামক স্থানে যে ভাষণ দেন তাতে তিনি হযরত আলীকে লক্ষ্য করে বলেছেন, "এ ব্যক্তিই আমার উত্তরাধিকারী, আমার ভাই, আমার পর সেই খলিফা, অতএব তোমরা সকলে তার কথা শুনবে এবং তাকেই মেনে চলবে।"

খ) "আলীর প্রতি ভালবাসা পোষণ এমন এক পূণ্য যে ইহা থাকলে কোন পাপই তার ক্ষতি করতে পারবে না। পক্ষান্তরে আলীর প্রতি প্রতিহিংসা পোষণ এমন এক পাপ, কোন নেক কাজই তাকে কোন ফায়দা দিতে পারে না।"

গ) "যে ব্যক্তি হযরত আলীর প্রতিহিংসা পোষণ অবস্থায় মরবে, সে ইহুদী কিংবা নাছারা হয়ে মৃত্যুবরণ করবে।"

ঘ) "আলী ইবনে আবু তালিবের জন্য অস্তমিত সূর্যকে পুনরোত্থিত করা হয়। প্রথম হাদীসটি গাদীরে খামে লক্ষ লোকের উপস্থিতিতে বলা হয়। কিন্তু রাসূলের সহচরগণ খলিফা নির্বাচনের সময় এর উদ্ধৃতি দিল না, নির্বাচনের প্রতিবাদ করল না।"

মোট কথা এ হাদীসগুলি যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য রচিত হয়েছে তা প্রথম দৃষ্টিতেই বুঝা যায়। এভাবে হযরত আলীর উত্তরাধিকার প্রমাণের জন্য বহু হাদীস রচিত হয়েছে যার ইয়ত্তা নেই।

এরূপ হযরত আবু বকর ও উমরের অতিরিক্ত প্রশংসায় যে সব হাদীস বর্ণিত হয়েছে তা জাল ছাড়া আর কিছু নয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়,

ক) "আমাকে যখন আকাশের দিকে মি'রাজে নিয়ে যাওয়া হয়, তখন আমি বললাম, হে আল্লাহ! আমার পর আলী ইবনে আবু তালিবকে খলিফা বানাও। তখন আকাশ-জগত কম্পিত হয়ে উঠল এবং সবদিক হতে ফেরেস্তাগণ অদৃশ্য ধ্বনি করে উঠল, হে মোহাম্মদ! আল্লাহর এ আয়াত পাঠ কর (যার অর্থ) তোমরা কিছু চাইতে পারবে না, আল্লাহ যা চাইবেন তাই হবে। আর আল্লাহ ইচ্ছা করেছেন তোমার পরে আবু বকর সিদ্দিকই খলিফা হবেন।"

খ) "বেহেস্তের প্রত্যেকটি বৃক্ষের প্রতিটি পাতায় লিখিত আছে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আবু বকর উমর ফারুক ওয়া উসমান যুন্নুরাইন।"

হযরত মোয়াবিয়ার প্রশংসায় ও হাদীস জাল করা হয়েছে, যেমনঃ- "তোমরা মোয়াবিয়াকে আমার মিম্বারে দাঁড়িয়ে খোতবা দিতে দেখবে, তখন তাকে তোমরা গ্রহণ করিও কেননা সে বড়ই বিশ্বস্ত, আমানতদার ও সুরক্ষিত।

এছাড়া 'জন্মভূমির প্রেম ঈমানের অংশ।' এবং "হে মোহাম্মদ! যদি তোমাকে সৃষ্টি করতে না হত, তাহলে এ আকাশ মন্ডল ও পৃথিবীই সৃষ্ট করতাম না।" এ হাদীসগুলিও জাল।

২। বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায় ও নেতৃবৃন্দের প্রশংসাও তাদের মতবাদের অভ্রান্ত হওয়ার দলিল হিসেবে বা অন্য দলের ভ্রান্ত হওয়ার প্রমাণ হিসেবে তাদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের কুৎসা রচনায় জাল হাদীস ব্যবহৃত হয়। যেমন- মামুন ইবনে হারাবীকে লক্ষ্য করে একজন বলল, "শাফেয়ী ও তাঁর খোরাসানী অনুসারীগণ সম্পর্কে তোমার কি ধারণা? নবী করীম (সা.) হতে বর্ণিত হয়েছে, "আমার উম্মতের মধ্যে এক ব্যক্তি হবে, যার নাম হবে মোহাম্মদ ইবনে ইদরিস। সে আমার উম্মতের পক্ষে ইবলীস হতেও ক্ষতিকর। আমার উম্মতের মধ্যে আর এক ব্যক্তি হবে যার নাম আবু হানিফা, সে আমার উম্মতের জন্য প্রদীপ স্বরূপ।" এভাবে একে অপরের কুৎসা রটনায় বা প্রশংসায় বহু মনগড়া হাদীস রচিত করেছে।

৩। ধর্মপরায়ন লোক জনগনের মধ্যে ইসলাম প্রচার ও ওয়াজ নছিহত দ্বারা জনগণকে অধিক ধর্ম পরায়ন বানানো, ইবাদত বন্দেগীতে অধিকতর উৎসাহী করা এবং পরকালের ভয়ে অধিক ভীত করে তোলার উদ্দেশ্যে হাদীস জাল করেছেন। বস্তুত: হাদীস জাল করার ব্যাপারে এ শ্রেণীর লোকের প্রচেষ্টা ছিল সবচেয়ে মারাত্মক। কারণ তারা ছিল বাহ্যত সৎ এবং আদর্শ ব্যক্তি। তাদের একনিষ্ট ইবাদত ও রিয়াযত- মেহনত দেখার পর তাদের অতি শত্রুও তাদের মিথ্যাবাদী বলে ধারণা করতে সাহসী হত না। কাজেই তারা রাসূলে খোদার নামে যে সব হাদীস বর্ণনা করতো লোকজন তা মনে প্রাণে বিশ্বাস করে নিত এবং কেউ তার বিরুদ্ধাচরণ করলে রুখে দাঁড়াতো। এদের সাথে যোগ দিয়েছিল বেশ কিছু সংখ্যক পেশাদারী ওয়ায়েজ যারা তাদের বক্তৃতা গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করার জন্য ও লোকদের তাদের বক্তৃতার প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য জাল হাদীসের সাহায্য নিত।

মোহাদ্দেস ইয়াহইয়া বিন সাঈদ কাত্তান বলেন, "আমি সে সব সৎ লোককে যেভাবে হাদীস জাল করতে দেখেছি, তেমনি আর কাউকে দেখিনি। বস্তুতঃ সে শ্রেণীর লোকেরা ভাল কাজে উৎসাহ প্রদান এবং মন্দ কাজে বাধাদানের উদ্দেশ্যে হাদীস জাল করাকে গর্হিত কাজ বলে মনে করতেন না। এ ছিল সবচেয়ে জঘন্য।

মোহাদ্দেস আবু আবদুল্লাহ নাহওয়ান্দি বলেছেন, "আমি খলিলের দাসকে জিজ্ঞাসা করলাম, "জনাব, মানুষকে কাঁদানোর জন্য এত বিপুল সংখ্যক হাদীস আপনি পেলেন কোথায়? সে উত্তরে জানাল ঐগুলি আমি নিজেই রচনা করেছি। দেখছেন না, মানুষ কেমন পাষাণ প্রাণ হয়ে পড়েছে।" কি আশ্চর্যের ব্যাপার চিন্তা করে দেখুন। বস্তুত: উক্ত খলিলের দাস এতটুকু ধর্মভীরু ও পরহেজগার বলে খ্যাত ছিল যে, তার মৃত্যুতে একদিনের জন্য বাগদাদের হাট বাজার বন্ধ রাখা হয়েছিল। আবু দাউদ লাঘারী নামক একব্যক্তি বৎসরে প্রায় সবদিনই রোজা রেখে কাটাত। সারারাত ইবাদতে মশগুল থাকতো। কিন্তু সে হতভাগ্য হাদীস জাল করাকে মোটেও পাপকার্য বলে মনে করত না। ওয়াহাব বিন হাফস নামক এক ব্যক্তি বিশ বছর পর্যন্ত কারো সাথে বাক্যালাপ না করে কেবল ইবাদতেই রত থাকত। অবশেষে তার মুখ যখন খুললো, তখন সে জাল হাদীস রচনা করে লোকদের ওয়াজ করতে লেগে গেল।

ইবনে আবি মাররাম নামক এক ব্যক্তি ছিলেন অত্যন্ত ইবাদত গোজার ও পরহেজগার হিসেবে বিখ্যাত। কিন্তু সে লোকদেরকে বেশী কোরআন পাঠের উৎসাহ দেওয়ার উদ্দেশ্যে বহু সংখ্যক হাদীস জাল করেছিল।

বস্তুত এসব অতি পরহেজগার লোকদের ও ধর্ম উপদেশ দানকারী অজ্ঞ ওয়ায়েজদের দৌরাত্মে বহু শ্রদ্ধেয় মোহাদ্দেসকে যে কত কষ্ট ও ব্যঙ্গ বিদ্রুপ সহ্য করতে হয়েছে তা বলাই বাহুল্য।

কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করা যায়। ইবনে জারীর তাবারীর নাম শুনেননি এমন লোক বিজ্ঞ সমাজে বিরল। তার তাফসীর ও তারিখ গ্রন্থ বিখ্যাত। এক কথায় মুসলমান জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থকারদের একজন তিনি। এহেন ইবনে জারীর বাগদাদের এক সভায় গিয়ে শুনতে পেলেন একজন ওয়ায়েজ লোকদের কাছে মাকামে মাহমুদ সম্বন্ধে ওয়াজ করছে। সে ব্যক্তি বলছে, "আল্লাহ পাক কেয়ামতের দিন হযরত রাসূলে করীমকে আরশের উপর আপন ডান পাশে বসাবেন।" আরশের উপর বসাবেন, তাও আবার ডান পাশে। আল্লাহ তো মানুষের মত নন যে হযরতকে নিয়ে বসবেন। ইবনে জারীর তীব্র ভাষায় এর প্রতিবাদ করলেন। ফল এ হল যে, লোকজন তাঁকে জোর পূর্বক সভাস্থল থেকে বের করে দেন। অগত্যা ইবনে জারীর নিজ বাড়ির দরজায় লিখে রাখলেন, 'মহান ও পবিত্র আল্লাহ পাকের সমকক্ষ কেউ নেই, তাঁর সাথে কেউ সমাসীন হবে না। লোকজন তা জানতে পেরে একে

রাসূলে পাকের অবমাননা বলে ধরে নিল। প্রস্তরাঘাতে ইবনে জারীরের দরজা ভেঙ্গে ফেলল। বাগদাদের পুলিশ বাহিনী সময়মত ঘটনাস্থলে না পৌছলে ইবনে জারীরের প্রাণহীন দেহই সেখানে পাওয়া যেত, এতে কোন সন্দেহ নেই। (মাউজুয়াতুল কবির)

তাঁর বিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থ জামেউল বয়ান রচনা করার সম্ভবত এটাই কারণ।

দুটি ঘটনা

১. ইমাম আবু হানীফার নাম সবারই জানা। ইমাম শাবী তাঁরই ওস্তাদ। তিনি ছিলেন বিরাট পান্ডিত্য ও প্রজ্ঞার অধিকারী এবং হাদীস শাস্ত্রের মহান ইমাম। এহেন ইমাম শাবী দামেশকের এক মসজিদে গিয়ে দেখতে পেলেন একজন ওয়ায়েজ লোকদের নিয়ে ওয়াজ করতে বসেছে। তার পরিধানে বিরাট আলখেল্লা ও পাগড়ী। শুভ্র, শশ্রু, মানানসই চেহারা, পীরানে পীরের ভাব। ইমাম শা'বী কিছুটা মুগ্ধ হয়ে তার ওয়াজ শুনতে বসলেন। লোকটি কিছুক্ষণ ওয়াজ করেই বলল "হযরত (সা.) বলেছেন, নিশ্চয় আল্লাহর দুটি শিঙা থাকবে। প্রতিটি শিঙায় দুটি করে ফুৎকার দেওয়া হবে। ইমাম শা'বী প্রতিবাদ করে বললেন, মাফ করবেন জনাব, ভুল হয়ে গেছে। শিঙা মাত্র একটি হবে দুটি নয় শুনা মাত্রই লোকটি চোখ দুটি রক্তবর্ণ করে গর্জে উঠল। এরপর মুহূর্তে পাশে রাখা পাদুকা উঠিয়ে তাঁর দিকে সজোরে নিক্ষেপ করল। লোকজন তার ইঙ্গিতে সাড়া দিতে মোটেই কার্পণ্য করেনি। তারা ইমাম শা'বীকে এমনভাবে জুতা পেটা শুরু করল ইমাম শাবীর ভাষ্য মতে, 'আমি প্রাণের ভয়ে শেষ পর্যন্ত স্বীকার করতে বাধ্য হলাম, হাঁ শিঙা একটি দুটি নয় ষাট ষাটটি শিঙা রয়েছে, প্রতিটি শিঙায় দুটি করে ফুৎকার দেওয়া হবে। অত:পর লোকজন উচিৎ শিক্ষা হয়েছে ভেবে আমায় ছেড়ে দিল।

২. মুসলিম বিশ্বের দু'জন প্রসিদ্ধ ও শ্রদ্ধেয় মোহাদ্দেস ইমাম আহমদ বিন হাম্বল ও ইয়াহইয়া বিন মুঈন নামাজ পড়তে গিয়ে দেখলেন, জনৈক ওয়ায়েজ লোকদেরকে ওয়াজ শুনাচ্ছে। লোকটি হযরত (সা.) এর নাম করে কলেমার ফজিলত সম্পর্কে আধাঘন্টাব্যাপী একটি হাদীস বর্ণনা করল। ওয়াজ শুনে লোকজন তো কেঁদে কেঁদে হয়রান পেরেশান। তখন সে বলল, ভাইসব, এ হাদীসটি অত্যন্ত শুদ্ধ ও প্রমাণিত। আমাকে আহমদ বিন হাম্বল এবং ইয়াহ ইয়া বিন মুঈন এ হাদীসটি বলে ধন্য করেছেন। লোকজন আহমদ বিন হাম্বল বা ইয়াহইয়া বিন মঈনকে কখনো দেখেনি। তবে তারা লোক মুখে তাঁদের

প্রশংসা শুনেছে। তাই তারা আরও বেশী আবেগপ্রবণ ও বিহবল হয়ে পড়েছিল। ওদিকে ইমাম আহমদ ফিস ফিস করে ইয়াহ ইয়া বিন মঈনকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি লোকটিকে বাস্তবিকই উক্ত হাদীসটি শিক্ষা দিয়েছেন? আমিতো জীবনে এ প্রথম শুনলাম। উত্তরে ইয়াহ-ইয়া বললেন, আমিও প্রথম। লোকটিকে জিজ্ঞাসা না করে ছাড়ছি না। ইমাম আহমদ বললেন, বসো, সভা শেষ হোক। তারা বসে অপেক্ষা করতে লাগলেন। সভাশেষে ইয়াহ-ইয়া বিন মঈন লোকটিকে কাছে ডেকে এনে নিজের ও ইমাম আহমদের পরিচয় দিয়ে ক্ষুব্ধ হয়ে বললেন, জনাব আপনার যদি একান্তই হাদীস জাল করার ইচ্ছা থাকে তবে এমনি পারেন। অযথা আমাদের জড়ান কেন? লোকটি প্রথমত: একটু ভ্যাবা চ্যাকা খেয়ে গেল। কিন্তু তা মুহূর্তের জন্যই। পরক্ষণে সে অট্টহাস্যে ফেটে পড়ে এবং বলে, ওহো আপনি বুঝি ইয়াহ ইয়া বিন মুঈন? আমি শুনেছিলাম ইয়াহ ইয়া বড় নির্বোধ, দেখছি তাই। ইয়াহ ইয়া বললেন জনাবের এ ধরণের বিপরীত ধারণার কারণটুকু জানতে পারি কি? লোকটি উত্তর দিল, আপনি কি মনে করেন পৃথিবীতে ইয়াহ ইয়া বিন মুঈন আর আহমদ বিন হাম্বল কেবল আপনারা দুজনই? ওই নামের আর কেউ হতে পারে না? আমি সতেরজন আহমদ বিন হাম্বলের কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করি। এ বলে লোকটি ব্যঙ্গ করে চলে গেলেন। বস্তুত: এ ধরণের শত শত চমকপ্রদ ঘটনা রিজাল শাস্ত্রের পাতায় বর্ণিত আছে।

ভ্রান্ত পন্থিদের হাদীস জাল

বেদআত পন্থিরা তাদের ভ্রান্ত মতবাদের সমর্থনে হাদীস জাল করতো। মোহাদ্দিস আবদুল্লা বিন ইয়াজিদ মক্কী বলেন, বিদআতীদের একজনকে তওবা করার পর বলতে শুনেছিলাম, আপনারা হাদীস সম্বন্ধে সতর্কতা অবলম্বন করবেন। কারণ ধর্মের প্রধান অঙ্গ হাদীস। যেহেতু ইতিপূর্বে যখনই আমরা কোন বিষয় চিন্তা করে ঠিক করতাম। তার সমর্থনে পাঁচ দশটি হাদীস রচনা করে জনসাধারণের মাঝে ছড়িয়ে দিতাম।

ইবনে লোহিয়া বলেন, আমি খারেজী সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তিকে জানি, সে তওবা করার পর আমাকে হাদীস সম্বন্ধে সতর্কতা অবলম্বন করতে বলেছিল। তিনি আরও বলেন, তাওয়াফকালীন আমি এক বৃদ্ধকে কাঁদতে দেখেছিলাম। সেও আমার কাছে হাদীস জাল করার কথা স্বীকার করেছিল।

মোহাদ্দীস আবু আবদুল্লাহ নিশাপুরী বলেন, মুরজিয়া সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি মোহাম্মদ বিন কাশিম উক্ত শ্রেণীভুক্ত ছিলেন। ইবনে আবী শায়বা এ প্রসঙ্গে একটি চমকপ্রদ ঘটনার উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, 'কোন একসময় আমি কাবা শরীফে তাওয়াফ কার্যে রত ছিলাম, আমি শুনলাম আমার পিছনে এক লোক এ বলে তওবা করছে এবং এ বলে কাঁদছে আল্লাহ আমাকে মাফ করো, যদিও জানি তুমি আমাকে মাফ করতে পারনা। আমি লোকটিকে ধমক দিয়ে বললাম, বল কি? আল্লাহর রহমত তোমার পাপের চাইতে বেশী, চিন্তা করো না। লোকটি বলল, আপনি জানেন না সাহেব আমি বহু সংখ্যক হাদীস রাসূলের নামে জাল করে লোকজনের মাঝে ছড়িয়েছি। এখনতো তা থেকে অব্যহতি লাভের আমার কোন উপায় নেই। বস্তুতঃ এ ধরণের বিদয়াতি লোকজন নিজ নিজ মতবাদের পক্ষে এবং প্রতিদ্বন্দ্বি সম্প্রদায়ের কুৎসা বর্ণনা করে শত সহস্র হাদীস জাল করে প্রচার করেছে তার ইয়ত্তা নেই। জবরীয়া, কাদেরীয়া, মরজিয়া, সূফী ও অন্যান্য দর্শন ভিত্তিক সম্প্রদায় এ অপকর্মে লিপ্ত ছিল।

যিন্দিক, ধর্মবিমুখ লোকেরা মিথ্যার আবরণে ইসলামের সত্যিকার রূপ ঢেকে ফেলার একমাত্র উদ্দেশ্যে মুসলমান হয়েছিল। সেসব লোক সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে আত্মপ্রকাশ করে নিরন্তর মিথ্যা ও জাল হাদীস রচনায় ব্যাপৃত থাকত। সাবায়ী, কারামেতা প্রভৃতি সম্প্রদায়ের নাম এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য।

ইবনে জাওযী বলেন, 'কিরমানের আবদুল্লাহ বিন ইসহাক নামক একলোক ছিল। সে মোহাম্মদ বিন আবু ইয়াকুবের নিকট হাদীস শিক্ষা করেছে বলে দাবী করতো। অবশেষে, লোকজন যখন তাকে প্রশ্ন করল, সে কেমন করে এমন একজন লোকের কাছে হাদীস শিক্ষা করতে পেরেছে যার মৃত্যুর নয় বছর পর তার জন্ম হয়। তখন বেচারা উপায়ন্তর না দেখে হতভম্ব হয়ে পড়ল। তদনুরূপ মোহাম্মদ হাতিম নামক একব্যক্তি আবদ বিন হামিদের রাওয়ায়েত হতে হাদীস বর্ণনা করতো। মোহাদ্দেস আবু আবদুল্লাহ নিশাপূরী জানতে পেরে বললেন, দেখ কান্ড, লোকটি আবদ বিন হামিদের নিকট হতে হাদীস শুনেছে বলতে চাচ্ছে, অথচ তার জন্মের অনেক আগেই আবদ বিন হামিদের মৃত্যু হয়।

বস্তুতঃ মোহাদ্দেস হাম্মাদ বিন যায়েদের মতে একমাত্র জিন্দিকদের দ্বারা বার হাজারের বেশী হাদীস জাল হয়েছে। তবে এটা হচ্ছে হাম্মাদ বিন যায়েদের অনুমান মাত্র। প্রকৃত পক্ষে নিম্নে বর্ণিত দু'জন লোকের জাল হাদীসই শুধু

একত্র করলেই বার হাজারের উর্ধ্বে দাঁড়াবে। এ দু'জন হল শায়খ রতন হিন্দী ও শায়খ কায়েস বিন তামীম আশাজ।

রতন হিন্দির কাহিনী

শায়খ রতন হিন্দী হিজরী ষষ্ঠ শতকে ভারতবর্ষে আবির্ভূত হয় এবং রাসূলের সাহাবী বলে দাবী করে। লোক জন অবাক বিস্ময়ে প্রশ্ন করে হযরতের (সা.) তিরোধানের পর ছয়শত বছর চলে গেছে। সে সাহাবী হলে এতদিন কেমন করে বাঁচতে পারে? রতন তার উত্তরে বলে কৈশরে একবার আমি আরব দেশে ভ্রমণ করতে যাই। সেখানে একটি পর্বতের সানুদেশে চন্দ্রতূল্য এক বালককে মেষ চারণরত দেখতে পাই। এমন সময় হঠাৎ প্রবল বেগে একটি পার্বত্য স্রোত নেমে আসে এবং মেষ-পালসহ বালকটিকে উদ্ধার করি। বালকটি সাক্ষাত মৃত্যুর কবল থেকে রক্ষা পেয়ে অত্যন্ত আনন্দিত হন এবং আমার বয়োবৃদ্ধির জন্য তিনবার আল্লাহর কাছে প্রার্থনা জানান। এরপর দীর্ঘদিন অতিবাহিত হয়ে যায়। একদা চতুর্দশী যামিনীতে আমি বন্ধু বান্ধবসহ মাঠের ধারে বসে গল্প করছিলাম। এমন সময় হঠাৎ অবাক বিস্ময়ে দেখতে পাই যে, আকাশের পূর্ণ চন্দ্র দ্বিধা বিভক্ত হয়ে পূর্ব পশ্চিমে অস্তমিত হয়ে যাচ্ছে। মূহুর্তে জগত অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে যায় এবং আমরা ভয়ে বিস্ময়ে আর্তনাদ করে উঠি। কিন্তু তা ছিল মূহুর্তের জন্যই। পরক্ষণেই পুণরায় উভয় খন্ড চন্দ্র আকাশে উদিত হয় এবং আমরা যখন ভালরূপে চেয়ে দেখি তখন আকাশে পূর্ণ শশী পূর্বের মতই বিরাজমান দেখতে পাই। দীর্ঘ দিন পর্যন্ত উক্ত ঘটনা আমার মনে দাগ কেটে থাকে এবং আমি সর্বদাই এর যুক্তিসংগত কারণ অনুসন্ধানে ব্যাপৃত থাকি।

এমন সময় একদিন লোকমুখে সংবাদ পাই যে, আরবদেশে শেষ নবীর আবির্ভাব হয়েছে। আমাদের চন্দ্র দ্বিখন্ডিত হওয়ার পূর্বদৃষ্ট ঘটনা মূলতঃ ঐ মহান নবীরই একটি মোজেজা মাত্র। শোনার পরপরই আমি তাঁর সাথে সাক্ষাত লাভের জন্য যাত্রা করি। দীর্ঘ দিন পদব্রজে চলার পর তাঁর সমীপে উপস্থিত হতে সক্ষম হই। আমি যখন সেখানে হাজির হই তখন হযরত (সা.) স্বপরিষদ বসে গল্প গুজব করছিলেন। আমাকে দেখা মাত্র তিনি চিনে ফেললেন এবং আমিও দেখে অবাক হই যে ইনিই সে বালক যাঁকে আমি একদিন স্রোতের কবল থেকে উদ্ধার করেছিলাম। দীর্ঘ পথ অতিক্রম করার দরুণ আমার অত্যন্ত ক্ষুধা পেয়েছিল। সাহাবাগণ আমার জন্য খেজুর নিয়ে দৌড়ে আসেন এবং আমি পেট পুরে তা খাই। অত:পর হযরত (সা.) আমায়

কাছে ডেকে নেন, কলেমা পড়িয়ে তিনবার আমার বয়োবৃদ্ধির জন্য দোয়া করেন ও স্বহস্তে আমাকে খেতে দেন। বস্তুতঃ হযরত (সা.) কর্তৃক ছয়বার দোয়া ও ছয়টি খেজুরের বদৌলতে আমি ছয়শত বছর বেঁচে আছি এবং বেশ সুখেই আছি। রতন হিন্দীর উপাখ্যান এখানে শেষ। ইমাম যাহবী মিজানুল ইতিদাল নামক গ্রন্থে রতন সম্পর্কীয় ঘটনার উল্লেখ করে বলেন, বৃদ্ধ রতন মিথ্যাবাদী, দাজ্জাল। এতে কোন সন্দেহ নেই।

শেখ আশাজের গল্প

শেখ আশাজ হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর লোক। কিন্তু সে সব সময় হযরত আলী (রা.) এর নামে হাদীস রেওয়ায়েত করতো। লোকজন তাকে এ সম্পর্কে প্রশ্ন করলে বলতো, আমি হযরত আলীর অশ্ব রক্ষক ছিলাম। একদা তাঁর একটি খচ্চর আমার মাথায় মারাত্মকভাবে আঘাত করে। এতে আমার মাথা কেটে রক্ত ঝরতে থাকে। হযরত আলী (রা.) দয়াপরবশ হয়ে আমার রক্ত মুছে দেন এবং দোয়া করেন যেন আল্লাহ্ পাক আমার বয়স বাড়িয়ে দেন। আমার দীর্ঘ জীবন লাভের ইহাই মূল উৎস। হাফিজে হাদীস ইবনে হাজার আসকালানী বলেন, কায়েস বিন তামীম আশজ, ভারতবর্ষবাসী বৃদ্ধ রতনের মতই মিথ্যাবাদী দাজ্জাল। অত্যধিক মিথ্যাবাদী লোকদেরকে মোহাদ্দীসগণ দাজ্জাল নামে আখ্যায়িত করতেন। বস্তুত এ ধরণের জিন্দিকদের দ্বারা হাদীস জাল ছিল নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। তারা এ ব্যাপারে কোন প্রকার চেষ্টার ত্রুটি করেনি।

ক্ষমতা অর্থলোভী ও অসতর্ক লোকদের জাল

বাদশাহ্ ও ক্ষমতাবান লোকদের খুশী করার জন্যও একদল লোক জাল হাদীস রচনা করতো। সুলতান মেহদী আব্বাসীর দরবারে আবদুর রহিম নামীয় জনৈক ব্যক্তি এ ধরণের একটি হাদীস বর্ণনা করতে গিয়ে ধরা পড়ে যায়।

ইসলামের বিস্তৃতির সাথে সাথে বিপুল সংখ্যক লোক বিভিন্ন ধর্ম ছেড়ে ইসলাম গ্রহণ করে। যেমন ইহুদী, নাছারা, মুজুসী প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীগণ। তারা তাদের পূর্বেকার ধর্ম বিশ্বাস ছেড়ে আসলেও কিন্তু তাদের মাঝে প্রচলিত নানা রকম পুরোকাহিনী তাদের মনের মধ্যে অংকুরিত ছিল। তারা সেসব পুরোকাহিনী ও বিশ্বাসকে হাদীসের আদলে মুসলমানদের মাঝে প্রচারিত করে। এসব কাহিনী পরবর্তীকালে জাল হাদীস হিসেবে

প্রচলিত হয়ে যায়। বিভিন্ন কিতাবে বর্ণিত ইসলামী কল্পকাহিনী ইহাদের মধ্যে অন্যতম যা ইসরাইলীয়াত হিসেবে মসহুর।

তাছাড়া বিভিন্ন অসতর্ক লোভী ব্যবসায়ী তাদের ব্যবসা বাণিজ্যের স্বার্থের সুবিধার জন্যও হাদীস জাল করতো। বেগুন বিক্রেতা বাজারে গিয়ে বেগুন বেচতো আর উচ্চস্বরে চিৎকার করে বলতো, হযরত বলেছেন বেগুনে সর্বরোগের ঔষধ নিহিত রয়েছে।

বেশ কিছু কাহিনী বর্ণনাকারী ব্যক্তিও জাল হাদীস বর্ণনার মাধ্যমে তাদের রচিত কিচ্ছা কাহিনী জনসাধারণের মাঝে প্রচার করতো। এ ধরণের একজন কিসসা কাহিনী বর্ণনাকারী ব্যক্তি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমরের নিকট এসে বসে। তিনি তাকে চিনতে পেরে সেখান থেকে সরে যেতে বলেন। কিন্তু লোকটি সরে যেতে অস্বীকৃতি জানায়। তাকে বিতাড়িত করার জন্য হযরত আবদুল্লাহকে পুলিশের সাহায্য নিতে হয়।

জাল হাদীসের কয়েকটি লক্ষণ

জাল হাদীস চিহ্নিত করণের জন্য মনিষীগণ বেশ কিছু নির্ভরযোগ্য নিয়ম নির্দিষ্ট করেছেন। এখানে কয়েকটি নিয়ম উল্লিখিত হল–

১। জাল হাদীস বর্ণনাকারীদের মধ্যে এমনসব লক্ষণ দেখা যায় যার ভিত্তিতে বর্ণনাকারী মিথ্যাবাদী বলে অনায়াসেই বুঝা যায়। যেমন- সায়াদ ইবনে জরীফ কর্তৃক ইবনে আব্বাস সূত্রে রাসূল থেকে বর্ণিত হাদীসটি। 'তোমাদের বালকদের শিক্ষকগণ তোমাদের মধ্যে অধিক দুষ্ট লোক। এতিম বাচ্চাদের প্রতি তারা খুব কম দয়াশীল এবং মিসকিনদের প্রতি অত্যন্ত কঠোর।' এরকম ইমাম শাফেয়ী সম্বন্ধে বর্ণিত হাদীসটি যাতে তার কুৎসা বর্ণিত হয়েছে এবং ইমাম আবু হানিফার প্রশংসা বর্ণিত হয়েছে। এ হাদিস দুটি হিংসা প্রণোদিত হয়ে রাসূলের নামে মিথ্যা কথাকে হাদীস বলে চালিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা লক্ষণীয়।

২। বর্ণিত হাদীসের মধ্যে এমন লক্ষণ পাওয়া যায় যা হাদীসটি জাল হওয়ার কথা অকাট্যভাবে প্রমাণ করে। যেমন মূল কথায় এমন কোন শব্দের উল্লেখ থাকা, যা অত্যন্ত হাস্যকর, কিংবা শব্দ ও অর্থ উভয়ই বাচালতা পূর্ণ। হাস্যকর অর্থ সম্বলিত জাল হাদীস এরূপ- 'তোমরা মোরগকে গালি দিওনা কেননা উহা আমার বন্ধু।' এরকম কথা রাসূলের হতে পারে না।

৩। হাদীস জাল হওয়ার আর একটি লক্ষণ হচ্ছে উহা স্বাভাবিক বিবেক বুদ্ধির বিপরীত বা সাধারণ অনুভূতি ও পর্যবেক্ষণের বিপরীত। যেমন দুই বিপরীত জিনিষকে একত্র করার সংবাদ দান কিংবা সৃষ্টিকর্তাকে অস্বীকারের কোন কথা। কারণ শরিয়তের কোন বিধান স্বাভাবিক ও সুস্থ বিবেক বুদ্ধি বিরোধী হতে পারে না। "আল্লাহ্ অশ্ব সৃষ্টি করলেন। উহাকে চালালেন। ফলে খুব ঘাম বের হল। অত:পর উহা হতে তিনি নিজেকে সৃষ্টি করলেন।" এরকম একটি হাস্যকর জাল হাদীস। তেমনি বেগুন সর্বরোগের মহৌষধ নামক হাদীসটিও জাল। কারণ পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে বেগুন নানা রোগ বাড়ায়। তাই এ হাদীসটি সাধারণ বুদ্ধি ও পর্যবেক্ষণের বিপরীত।

৪। হাদীস যদি কোরআনের স্পষ্ট বিধান কিংবা মোতাওয়াতীর হাদীস বা অকাট্য ইজমার বিপরীত হয় তবে তাকে জাল বা মওজু মনে করতে হবে। এ দৃষ্টিতেই যে সব হাদীসে দুনিয়ার আয়ুস্কাল নির্দিষ্ট করে বলা হয়েছে সেসব হাদীসকে জাল বা মিথ্যা ঘোষণা করা হয়েছে। কেননা তা কোরআনের আয়াতের বিপরীত। আল্লাহ বলেছেন, 'হে নবী লোকেরা তোমার নিকট জিজ্ঞাসা করছে কিয়ামত কখন হবে? তুমি বলে দাও। এ সম্পর্কিত জ্ঞান কেবলমাত্র আমার আল্লাহরই আয়ত্ত্বে, তিনিই সঠিক সময় উহা উপস্থাপিত করবেন।' হাদীস বিশারদগণ নিম্নোক্ত হাদীসটিকে বাতিল বা মাওজু ঘোষণা করেছেন। "অবৈধ সন্তান বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না।" কারণ ইহা কোরআনের আয়াত- "কোন বোঝা বহনকারীই অপর কাহারো (পাপের) বোঝা বহন করবে না।" এর বিপরীত।

এভাবে যেসব হাদীস এ ধরণের অর্থ প্রকাশ করে, তা মওজু 'যার নাম আহমদ কি মোহাম্মদ সে কখনো দোজখে যাবে না।' কারণ দোজখ থেকে রেহাই পাওয়ার একমাত্র উপায় হচ্ছে আমালুচ্ছালেহ- নেক আমল।

৫। যে সব হাদীসে বিপুল সংখ্যক সাহাবীর উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত কোন ঘটনার উল্লেখ থাকে, কিন্তু তা সে যুগে ব্যাপক প্রচার পায়নি এবং অল্প সংখ্যক লোকই তা বর্ণনা করেছে। যেমন- বিদায় হজ্ব হতে প্রত্যাবর্তনকালে গাদীরে খামে এক লাখ লোকের উপস্থিতিতে নবী করিমের হযরত আলীকে খিলাফত প্রদানের ঘটনা এ জাতীয় হাদীস।

৬। সাধারণ যুক্তি ও সুস্থ বিবেক বিরোধী কোন কথা কোন হাদীসে উল্লিখিত হলেও তাকে জাল মনে করতে হবে। যেমন হাদীস বলে কথিত কথাটি 'না তুর্কিদের জুলুম ভালো, না আরবদের সুবিচার।' কেননা জোর জুলুম সাধারণভাবে নিন্দিত, যেমন সুবিচার সকল অবস্থায়ই প্রশংসিত।

৭। হাদীসের বর্ণনাকারী যদি রাফেজী মতাবলম্বী হয় এবং রাসূলের বংশের লোকদের ফজিলত বর্ণিত হয় তাহলে বুঝতে হবে হাদীসটি জাল। বিশেষত যখন তারা প্রথম দু খলিফা ও সাহাবীদের গালাগালি ও কুৎসা বর্ণনা করে।

৮। কোন হাদীসে উল্লিখিত ঘটনা যদি বিশুদ্ধ নির্ভরযোগ্যও স্বপ্রমাণিত ইতিহাসের বিপরীত হয়, তাহলে হাদীসটি জাল। যেমন এক হাদীসে আছে খায়বারবাসীদের উপর হতে জিযিয়া প্রত্যাহার করা হয়েছিল হযরত সায়াদ ইবনে মায়াজের শাহাদাতের কারণে। এ হাদীস প্রকৃত ইতিহাসের বিপরীত। কারণ হযরত সায়াদ খন্দক যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন এবং তা খায়বার যুদ্ধের পূর্বে অনুষ্ঠিত ঘটনা। দ্বিতীয়তঃ জিযিয়া খায়বার যুদ্ধকালে বিধিবদ্ধও হয়নি বরং তাবুকের যুদ্ধের পূর্বে তা সাহাবীদের নিকট অপরিচিত ছিল। তৃতীয়ত, প্রত্যাহার পত্র হযরত মোয়াবীয়া কর্তৃক লিখিত হয়েছিল বলে বর্ণিত হয়েছে। অথচ হযরত মোয়াবীয়া মক্কা বিজয়ের সময় ইসলাম গ্রহণ করেন। খায়বার যুদ্ধকালীন সময় তিনি মুসলমানই ছিলেন না। এসব কারণে বলা যাবে হাদীসটি জাল।

৯। কেউ যদি আল্লাহ নির্ধারিত সাধারণ আয়ুস্কালের অধিক আয়ু লাভের দাবী করে। যেমন রতন হিন্দী ও আশাজের দাবী।

১০। সুফীগণের কাসফ বা স্বপ্ন যোগে প্রাপ্ত হাদীসের দাবীও জাল। স্বপ্ন বা কাসফ এর সূত্রে প্রাপ্ত বিষয় শরিয়তে গ্রহণযোগ্য নয়।

এসব অসর্তক ও স্বার্থ সংশ্লিষ্ট জনসাধারণের রচিত জাল হাদীস প্রতিরোধের জন্য বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। যথা (১) জালকারীকে শাস্তি দেওয়া (২) বর্ণনাকারীর নিকট সাক্ষ্য তলব করা (৩) বর্ণনাকারীর নিকট হতে হলফ গ্রহণ করা (৪) হাদীসের সনদ বর্ণনা করতে বাধ্য করা (৫) সনদ পরীক্ষা করা।

সনদ পরীক্ষা

হাদীসের সত্যতা যাচাইয়ের জন্য মোহাদ্দিসগণ বর্ণনাকারীদের সত্যবাদীতা ও নির্ভরযোগ্যতা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন যা রিজাল শাস্ত্র নামে খ্যাত। এতে প্রতিজন বর্ণনাকারীর পূর্ণ জীবনী অর্থাৎ কবে, কোথায়, কোন দেশে, কোন বংশে জন্মগ্রহণ করেছেন, কবে কোথায় কোন বয়সে মৃত্যুবরণ করেন, তার নাম লকব বা কুনিয়াত কি ছিল এবং তিনি কোনটির সাথে প্রসিদ্ধ ছিলেন; তিনি কার নিকট হতে হাদীস শিক্ষা করেছেন এবং কাকে

কাকে হাদীস শিক্ষা দিয়েছেন, তার আদালত বা বিশ্বাসযোগ্যতা এবং স্মরণ শক্তি বা যাব্‌ত কেমন ছিল ইত্যাদি আলোচিত হয়। এক কথায় রাবীর জীবনের এমন কোন ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর দিকও নেই যা মুসলিম মনিষীগণ অনুসন্ধান ও আলোচনা করেন নি বা তার দোষ-গুণ প্রকাশ করে দেননি। এভাবে পাঁচ লাখ বর্ণনাকারীর জীবনী রিজাল শাস্ত্রে বর্ণিত হয়েছে।

হাদিস বর্ণনাকারী বা রাবীদের গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য মোহাদ্দেসগণ চারটি গুণের অধিকারী হওয়া পূর্ব শর্ত হি.সেবে বর্ণনা করেছেন বর্ণনাকারীর মধ্যে এ চারটি গুন থাকা আবশ্যক। গুন চারটি হলো- (১) আকল (২) যাবত (৩) আদালত (৪) ইসলাম।

(১) **আকল:** বর্ণনাকারী অবশ্যই ভাল মন্দ পার্থক্য করতে পারার ক্ষমতা রাখবে।

(২) **যাবত:** বর্ণনাকারী বা রাবীর এমন প্রতিভা বা স্মরণ শক্তি থাকবে যার সাহায্যে সে লিখিত বা শ্রুত বিষয়ের যথাযথ ও সুক্ষ অনুধাবনে সক্ষম যা তাকে বিস্মৃতি থেকে রক্ষা করতে পারে এবং যে কোন সময় তা হুবহু বর্ণনা করতে পারে।

(৩) **আদালত:** শিরক, বিদায়াত, ফিসক প্রভৃতি কবীরাহ্‌ গুণাহ্‌ থেকে দুরে থাকা এবং পুনঃ পুনঃ সগীরাহ থেকে বেচে থাকা। যে কোন অশোভনীয় ও অভদ্র জনোচিত আচরণ থেকে দুরে থাকা, যদিও তা মোবাহ্‌। যেমন রাস্তা ঘাটে পেশাব করা, বেশী হাসি ঠাট্টা করা ও রসিকতা করা, হাটে বাজারে প্রকাশ্যে পানাহার করা ইত্যাদি।

(৪) **ইসলাম:** বর্ণনাকারী মুসলমান হওয়া। তবে রাবীর মুসলিম হওয়ার শর্তটি শুধু হাদীস অন্যের কাছে বর্ণনা করার সময়ই বিবেচ্য। অপরের নিকট হতে শ্রবণ কালে নয়। এজন্য বদরের যুদ্ধের বন্দী বিনিময়ের সময়ে শ্রুত হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে যোবায়ের বর্ণিত হাদীসটি "তিনি নবী (সা.)- কে সালাতুল মাগরিবে সূরায়ে তূর পড়তে শুনছেন।" বোখারীতে স্থান পেয়েছে। অথচ তখনও তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন নি। মক্কা বিজয়ের প্রাক্কালে তিনি মুসলমান হন।

বস্তুতঃ মোহাদ্দীসগণের হাদীস সংগ্রহ করার ব্যাপারে যতদূর কষ্ট স্বীকার করতে হয়েছে তার চেয়েও বেশী কষ্ট স্বীকার করেছেন রাবীদের জীবন চরিত সংগ্রহ কার্যে। এক্ষেত্রে তাদের বিচার মান যে কতদূর নিখুঁত ও কঠোর ছিল তা একটি মাত্র ঘটনা থেকে আঁচ করা যায়।

ইমাম বোখারী কোন একজন বর্ণনাকারীর বাড়িতে হাদীস শুনতে গিয়ে দেখতে পান উক্ত ব্যক্তি তার পশুকে বাঁধতে না পেরে একটি খালিপাত্র হতে নিয়ে পশুটিকে ধরার জন্য পাত্রটিকে পশুর সামনে রাখে। সে পাত্রে খাদ্য আছে এমন ধারণা সৃষ্টি করানোর চেষ্টা চালায় যাতে করে পশুর খাওয়ার জন্য পাত্রটির কাছে এলে ধরে ফেলবে। এটাই ছিল তার মূল উদ্দেশ্য। ইমাম বোখারী তা দেখে চমকে গেলেন এবং বললেন, 'আমি কখনো এমন লোকের নিকট হতে হাদীস সংগ্রহ করব না, যে সামান্য পশুর সাথে মিথ্যা আচরণ করে।'

দেরায়াত গত পরীক্ষা

মোহাদ্দিসগণের এহেন কঠোর বিচার বিশ্লেষণের ফলেই লক্ষ লক্ষ হাদীস তাদের প্রণীত গ্রন্থাদি হতে বাদ পড়ে। হাদিসের রাবীদের সূত্র পরম্পরা এসব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে দ্বিতীয় পর্যায়ে যাচাই বাছাই ও পর্যালোচনা করতে হয় মূল হাদীসের গুণাগুণ, মূল বক্তব্যের যথার্থতা ও বিশ্বস্থতা। এভাবে হাদীসের সনদ বা রিওয়ায়েত এবং বক্তব্যে পরখ করে নেওয়া হয়।

হাদীসের মূল বক্তব্য বা মতন পরখ করার মূলনীতিগুলি নিম্নে দেওয়া গেল-

(১) বর্ণিত হাদীস, কোরআনের আয়াতের স্পষ্ট অর্থের বিপরীত হবে না।

(২) বর্ণিত হাদীস, সাহাবায়ে কেরামদের সুস্পষ্ট ও অকাট্য ইজমার বিপরীত হবে না।

(৩) বর্ণিত হাদীস কোন মোতাওয়াতার সূত্রে প্রমাণিত সুন্নাতের বিপরীত হবে না।

(৪) বর্ণিত হাদীস বিবেকবুদ্ধি, সুস্পষ্ট যুক্তি, সাধারণ নিয়ম ও বাস্তব অভিজ্ঞতার বিপরীত হবে না। যথা- বেগুন সর্বরোগের মহৌষধ জাতীয় হাদিস।

(৫) বর্ণিত হাদীস, সমর্থিত নীতির বিপরীত হবে না।

(৬) বর্ণিত হাদীস, বিশুদ্ধ ও নির্ভুল হিসেবে গৃহীত অন্য কোন হাদীসের বিপরীত হবে না।

(৭) বর্ণিত হাদীসের ভাষা আরবী ভাষার রীতিনীতির বিপরিত হবে না। কারণ রাসূল (সা.) বিশুদ্ধ আরবী ভাষা ব্যবহার করতেন।

(৮) বর্ণিত হাদীসে এমন কোন অর্থ প্রকাশ করবে না যা হাস্যকর ও নবীর মর্যাদা হানিকর।

(৯) যে হাদিসে লঘু অপরাধের গুরুদন্ডের ব্যবস্থা রয়েছে সে হাদীস পরিত্যাজ্য।

(১০) যে হাদীসে সামান্য আমল বা কাজের জন্য মাত্রাতিরিক্ত পুরস্কার ঘোষণা হয়েছে তাও পরিত্যাজ্য।

(১১) যে হাদীসের অর্থ নেহায়েত হীন। যথা- জবেহ্ করা ব্যতীত কদু খাবে না, জাতীয় হাদীস মওজু বলে গণ্য।

(১২) যে হাদীসের বর্ণনাকারী এমন লোকের নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেছে যার সাথে তার দেখা হয়নি। অপর দিকে তার নিকট থেকে অন্য কোন রাবীও বর্ণনা করেনি।

(১৩) যে হাদীসে এমন বিষয় রয়েছে যা অবগত হওয়া সকল মুসলমানের পক্ষে আবশ্যক অথচ হাদীসটি একজন বর্ণনাকারী ছাড়া অন্য কেউ অবগত নয়।

(১৪) যে হাদীসের বর্ণনা অতিরঞ্জিত তাও গ্রহণযোগ্য নয়।

(১৫) যে হাদীসের বর্ণিত ভবিষ্যতবাণীতে কোন সুনির্দিষ্ট তারিখের উল্লেখ রয়েছে সে হাদীস গ্রহণীয় নয়।

(১৬) যে হাদীসে এমন কথা রয়েছে যা বাস্তবে ঘটলে বহু লোকই তা অবগত হওয়ার কথা। অথচ তা এ রাবী ছাড়া অপর কেউ অবগত নন তাই পরিত্যাজ্য।

(১৭) যে হাদীসের কথা কোন চিকিৎসকের হওয়া অধিক সংগত। তাই গ্রহণীয় নয়।

(১৮) যে হাদীসের বক্তব্যের সম্ভাব্যতার বিপক্ষে সুস্পষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান যথা ইবনে উনক সংক্রান্ত হাদীস।

(১৯) দাজ্জাল, মেহদী ও খাজাহ্ খিজির সংক্রান্ত হাদীসগুলি মওজু হিসেবে গণ্য।

(২০) কোরআনের বিশেষ বিশেষ সুরার বিশেষ বিশেষ ফজিলত বর্ণিত হাদীসও গ্রহণীয় নয়।

(২১) যে হাদীসে ব্যক্তি, গোত্র বা অঞ্চলের ফজিলত বা শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণিত হয়েছে সে হাদীস পরিত্যাজ্য।

কয়েকটি পরিত্যাজ্য হাদীসের দৃষ্টান্ত

ইবনে জাওযী, মোল্লাআলীকারী ও অন্যান্য মনিষী কর্তৃক বর্ণিত মূল নীতি ভিত্তিতে কয়েকটি পরিত্যাজ্য হাদীসের দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল।

(১) বোখারীতে বর্ণিত আছে হযরত আদমের (আ.) উচ্চতা ৬০ গজ। প্রাচীনকালের মানুষের আবিস্কৃত আবাসস্থল পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে তখনকার অধিবাসীগণ এতবেশী উচ্চতার অধিকারী নন। তাই এ হাদীস গ্রহণীয় নয়।

(২) "যদি রাসূলুল্লাহ (সা.) পুত্র ইবরাহিম জীবিত থাকত তাহলে তিনিও একজন পয়গম্বর হতেন।"

কথিত হাদিসটিও বাতিল। ইমাম নববী এ হাদীসের বিরূপ সমালোচনা করেছেন এবং বানোয়াট হাদীস বলে গণ্য করেছেন। কারণ হাদীসটি কোরআনে বর্ণিত রাসূলের শেষ নবী হওয়ার আয়াতের (৩৩-৪০) বিপরিত।

আবু দাউদে বর্ণিত কাজবীনের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কীয় হাদীসটি জাল হিসেবে গণ্য করা হয়।

(৩) "যে ব্যক্তি ভালবাসে, পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাকে এবং মৃত্যুবরণ করে সে শহীদ।"

কথিত হাদিসটিও জাল হিসেবে গণ্য। ইবনে আল কাইয়্যেম বলেন, যদিও হাদীসটির সনদ সূর্যের মত উজ্জ্বল হয় তবুও হাদীসটি মওজু।

(৪) দাজ্জাল, মেহদী ও খাজাহ খিজির সম্পর্কীয় হাদীসগুলিও নকল বলে পরিগণিত।

প্রচলিত কিছু জাল বা দুর্বল হাদীস

এভাবে সাহাবী যুগের অনুসরণ করে পরবর্তীকালে মোহাদ্দীসগণ দিরায়াত গত বা মর্মার্থ ও বক্তব্য ভিত্তিক পর্যালোচনা ও সমালোচনা করে হাদীসে রাসূলের গ্রহণযোগ্যতা পরখ করে নিতেন। এজন্য হাদীসের জারহ ওয়া তাদীলের বিস্তারিত নীতি ও নিয়ম কানুন নির্ধারণ করে গেছেন। তদানুযায়ী অতি প্রচলিত কিছু জাল ও দূর্বল হাদীসের বর্ণনা দেয়া হল-

(১) অজু থাকা অবস্থায় ওজু করা সোনায় সোহাগা।

(২) যে ব্যক্তি মসজিদে দুনিয়াদারীর কথা বলে আল্লাহ তার আমল নষ্ট করে দেন।

(৩) মসজিদে কথা বলা নেক আমলকে এমনভাবে খেয়ে ফেলে যেমন চতুস্পদ জন্তু ঘাস তৃণলতা খেয়ে ফেলে।

(৪) নামাজ দ্বীনের খুঁটী, যে ব্যক্তি নামাজ ছেড়ে দিল সে দ্বীনকেই ধ্বংস করে দিল।

(৫) যে নামাজ পরিত্যাগকারীকে বিন্দুমাত্র সাহায্য করল সে যেন সমগ্র নবীদেরকে হত্যা করতে সাহায্য করল।

(৬) যার কাছে সদকা করার কিছু নেই সে যেন ইহুদীকে ভৎসর্না করে। কেননা এটাই তার সদকাহ।

(৭) প্রত্যেক বস্তুর যাকাত থাকে আর শরীরের যাকাত হলো রোজা রাখা।

(৮) পাঁচটি বস্তুতে রোজাদারের রোজা ভংগ হয়ে যায়। মিথ্যা, চোগলখুরী, গীবত, কামুক দৃষ্টি এবং মিথ্যা কসম।

(৯) রজব মাস অবশ্যই মস্ত বড় মাস। যে ব্যক্তি এ মাসে একটি রোজা রাখলো তাকে সহস্র বৎসরের সওয়াব দেওয়া হল।

(১০) যে আমার কবর জিয়ারত করলো তার জন্য আমার শাফায়াত ওয়াজেব হয়ে যায়।

(১১) যে ব্যক্তি মক্কা ও মদীনার মাঝ পথে হজ্জ কিংবা ওমরা করা অবস্থায় মারা যাবে হাশরের মাঠে তার কোন হিসাব দিতে হবে না এবং তার কোন আযাবও হবে না।

(১২) বিবাহিতের দু'রাকায়াত অবিবাহিতের সত্তর রাকায়াতের চেয়ে উত্তম।

(১৩) নারীর অর্থ সম্পদ, কৌলিন্য ও সৌন্দর্য দেখে বিবাহ কর।

(১৪) দুনিয়াতে দুটি জিনিষ আমার প্রিয়, মেয়ে লোক ও খুশবু। নামাজ আমার নয়নের মনি।

(১৫) ওস্তাদ, ইমাম ও মুয়াজ্জিনের পারিশ্রমিক হারাম।

(১৬) ইলম দু' প্রকারঃ শারীরিক বিদ্যা ও ধর্মীয় বিদ্যা।

(১৭) কোন সম্প্রদায়ের পীর বা শায়খ সে জাতীর নবী সাদৃশ্য।

(১৮) আমার উম্মতের আলেমগণ বনী ইসরাইলের নবী সাদৃশ।

(১৯) আলেমের দিকে দৃষ্টি দেওয়াও ইবাদত।

(২০) আমার উম্মতের মতপার্থক্য রহমত স্বরূপ।

(২১) আমি শিক্ষকরূপে প্রেরিত হয়েছি।

(২২) আমার উম্মতের ফাসাদের সময় যে আমার সুন্নতকে আঁকড়িয়ে থাকবে তার জন্য রয়েছে শত শহীদের মর্যাদা।

(২৩) সৃষ্টির দিক থেকে আমি সর্বপ্রথম নবী এবং প্রেরণের দিক থেকে নবীগণের শেষ।

(২৪) আদম শারীরিক ও আত্মিকের মধ্যখানে থাকতেই আমি নবী ছিলাম। অপর হাদীসে আছে আমি সে সময় নবী যখন আদম পানি, মাটি কিছু ছিল না। এরকম আরও অনেক হাদীস।

(২৫) তোমাকে নবী (সা.) সৃষ্টি না করলে আসমান জমীন কিছুই সৃষ্টি করতামনা।

(২৬) আমার সাহাবীগণ নক্ষত্রের মত (চির ভাস্বর)। যে কেউ তাদের অনুসরণ করলে তারা হিদায়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে।

(২৭) যে হজ্জ করার আগে বিবাহ করবে সে যেনো গুণাহ করতে শুরু করল।

(২৮) যে আমার মসজিদে (নববী) কোন ওয়াক্ত বিরতি ছাড়া একাধারে ৪০ ওয়াক্ত নামায পড়বে তাকে আগুন থেকে মুক্ত, আযাব থেকে নাজাত প্রাপ্ত এবং নিফাক থেকে নিস্কৃতি প্রাপ্ত হিসেবে লেখা হয়।

(২৯) তোমরা হজ্জ কর, কেননা পানি দ্বারা ময়লা ধৌত করার ন্যায় হজ্জ গুণাহকে ধুয়ে মুছে দেয়।

(৩০) হজ্জ করার নিয়ত করে বের হওয়ার পর মারা গেলে সে কিয়ামত পর্যন্ত হাজী হিসেবে সওয়াব পেতে থাকবে।

(৩১) যে আল্লাহর সুলতানকে অপমান করে (দুনিয়াতে) আল্লাহ তাকে অপমান করবেন।

হাদীস বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় গ্রন্থাবলী

মুসলিম মনিষীগণ হাদীসে রাসূলের আলোচনা ও জারাহতাদীল সম্পর্কীয় বিভিন্ন গ্রন্থ রচনা করে গেছেন যা আসমাউর রেজাল নামে প্রসিদ্ধ। ইহা দু'ভাগে বিভক্ত। সাধারণ গ্রন্থ যাতে সাহাবী, অসাহাবী, ছেকাহ ও জয়ীফ সকল শ্রেণীর রাবী বা বর্ণনাকারীর সকল দিক আলোচিত হয়েছে। বিশেষ বিশেষ গ্রন্থ যাতে শুধু একশ্রেণীর বর্ণনাকারী যথা সাহাবী, ছেকাহ্ জয়ীফ বা জালকারীদের জীবনী আলোচনা করা হয়েছে। অথবা বর্ণনাকারীদের কোন একটি বিশেষ দিক আলোচিত হয়েছে। যেমন রাবীদের শুধু জন্ম-মৃত্যুর তারিখই বিশেষভাবে পর্যালোচনা করা হয়েছে। হাদীস বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় কয়েকটি গ্রন্থের নাম দেওয়া হলো।

১। তারীখে কবীর- ইমাম বোখারী (২৫৬ হি.)

২। কিতাবুল জারাহ ওয়াতা'দীল আবু হাতেম জাহরী ৭৪৫ হি.

৩। মিজানুল ইতিদাল- ইমাম জাহরী ৭৪৮ হি.

৪। আল-ইসতিয়াব- আবু ওমর ইউসুফ কুরতুবী ৪৬৩ হি.

৫। আল- ইছাবাহ- হাফেজ ইবনে হাজার আসকালীনী ৮৫২ হি.

৬। কিতাবুছ-ছিকাত - হাফেজ আহমদ বিন আবদুল্লাহ ২৬১ হি.

শুধু ছেকাহ রাবীদের জীবনী আলোচনা করেছেন আরও কয়েকজন মনিষী। তারা হচ্ছেন আবু হাতেম কুস্তি মোহাম্মদ বিন হাব্বান ৩৫৪ হি., ইবনে শাহীন ৩৮৫ হি. জায়নুদ্দিন কাছেম ৮৭৯ হি.।

৭। তাজকেরাতুল হোফফাজ- ইমাম জাহরী

৮। তাবাকাতুল হোফফাজ ইবনে হাজার আছকালানী

৯। কিতাবুজ জোয়াফা- ইমাম বোখারী ২৫৬ হি. হি.

১০। কিতাবুজ জোয়াফা- ইমাম নাছাই ৩০৩ হি.

জাল কারীদের জীবনী নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে। যেমন-

১। আল কানুনুল মাওজুয়াত- মোহাম্মদ বিন তাহের পাটনী ৯৮৫ হি.

২। আল-মাওজুয়াত ইবনুল জাওজী ৫৭৭ হি.

৩। আল-মাওজুয়াত মোল্লা আলীকারী।

মোহাদ্দেসীনগণ বিশেষ বিশেষ কিতাবে বর্ণিত হাদীসের সনদ পরীক্ষা করে বিভিন্ন কিতাব রচনা করে গেছেন। যেমন বোখারী, মুসলিম, মোয়াত্তায়ে মালিক প্রভৃতি প্রসিদ্ধ হাদীসের কিতাবে বর্ণিত সনদ পরীক্ষা করে হাদীস বিশেষজ্ঞগণ বেশ কিছু গ্রন্থ রচনা করেছেন। এছাড়া মোদাল্লেছীন, মোরছেলীনদের জীবনী নিয়েও গ্রন্থ রচনা করা হয়েছে। রাবীদের নাম, লকব, কুনিয়াত, জন্ম-মৃত্যু সম্পর্কে ও গ্রন্থাদি রচিত হয়েছে। (গ্রন্থাবলী সম্বন্ধে বিস্তারিত জানার জন্য শ্রদ্ধেয় মরহুম মাওলানা আজমীর হাদীসের তত্ত্বও ইতিহাস পড়ুন)

হাদীস গ্রহণে ইমাম বোখারীর শর্তাবলী নিম্নরূপ-

ক। হাদীসের বর্ণনাসূত্র পরস্পরা ধারাবাহিক, সংযুক্ত ও অবিচ্ছিন্ন হতে হবে।

খ। হাদীসের বর্ণনাকারীকে তার ওস্তাদের সহচর্যে অধিককাল বসবাসকারী হতে হবে।

গ। বর্ণনাকারীকে প্রথম শ্রেণীর বর্ণনাকারীদের মধ্যে গণ্য, প্রসিদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য হতে হবে।

ঘ। যিনি যার নিকট হতে হাদীস বর্ণনা করেন তাঁদের পরস্পরের সাথে বাস্তব সাক্ষাত প্রমাণিত হতে হবে।

এক কথায় মুসলিম মনিষী হাদীস বিশারদগণ রাবীদের জীবনী সম্পর্কে এত অধিক আলোচনা সমালোচনা করেছেন যার নজীর দুনিয়ায় অপর কোন জাতি পেশ করতে সক্ষম হবে না। প্রসিদ্ধ প্রাচ্য বিশারদ স্প্রীংগার বলেছেন, "দুনিয়ায় এমন কোন জাতি ছিল না ও নাই যারা মুসলমানদের ন্যায় আসমাউর রিজালের মত বিরাট শাস্ত্রের প্রণয়ন করতে পেরেছে যাদ্বারা আজ পাঁচ লাখ লোকের জীবনী জানা যাচ্ছে।"

পরিশিষ্ট ও শেষকথা

আল কোরআনের বিশ্বস্ততা সন্দেহাতীত। আল্লাহ পাক ইহাকে সুরক্ষিত রাখবেন এ মর্মে ঘোষণা দিয়েছেন। কোরআন নবীজী (সা.) এর শেষ জীবনে পরিপূর্ণভাবে সংরক্ষিতরূপ লাভ করে। হযরত আবু বকর (রা.) এর খেলাফতকালীন সময় তা সম্পূর্ণভাবে দুই মলাটের মাঝে লিপিবদ্ধ হয় এবং হযরত ওসমান (রা.) এর খেলাফতকালে তা আবার নির্ধারিত কোরাইশ উপভাষায় সংকলিত ও লিপিবদ্ধ করে তাঁর রাজত্বের প্রতি প্রান্তে প্রেরিত হয়। ফলে তা চিরদিনের জন্য সংরক্ষিত হয়ে যায়। কিন্তু রাসুল (সা.) এর হাদীস রাসুল (সা.) এর যুগে মুখে মুখেই আলোচিত হত যদি ও লিপিবদ্ধ করার প্রচলন তখন ছিল যা প্রতিষ্ঠানিক ছিলনা। রাসুল (সা.) হাদীস লিপিবদ্ধ করার ব্যাপারে নিরুৎসাহ করেছেন যাতে কোরানের সাথে ইহার মিশ্রন না হয়, যাতে সামান্যতম বিভ্রান্তিও যেন না হয়। খেলাফতের প্রাথমিক যুগে কোরান মজিদের লিপিবদ্ধকরণ ও সংকলনের দরুণ যখন চূড়ান্ত সংরক্ষণ নিশ্চিত হয় তখন থেকে হাদীস লিপিবদ্ধ করা আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়। বলা হয় তাবেয়ীদের যুগে হাদীস সংকলনের কাজ শুরু হয় এবং উমাইয়া খলিফা হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজিজের উদ্যোগে প্রধানতঃ হাদীস সমূহ সংরক্ষণ ও লিপিবদ্ধ করার কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হয়। হাদীস বর্ণনাকারীর নাম ও হাদীসের বিষয়বস্তু বা মতন উভয়ই বর্ণিত ও লিখিত হত। তাই বলা হয় ইলমে হাদীস দুটি নিয়মের অধীন। এর দ্বারা হাদীসের মতন ও সনদের অবস্থা জানা যায়। সনদ পর্যালোচনার নাম ইলমে রেওয়ায়েত আর বিষয়বস্তু বা মতন পর্যালোচনার নাম দিরায়াত।

ইসলামে হাদীসে রাসুলের গুরুত্ব অপরিসীম। ইহা ইসলামী আইনের দ্বিতীয় উৎস। ইসলামী আইন কোরআন মজিদের সংক্ষিপ্তভাবে বর্নিত হয়েছে, বিস্তারিত বিবরণ নেই। মুসলিম জাতির জীবন যাত্রার নিয়মাবলী পবিত্র কোরআনে মৌলিক নীতির আকারে বর্ণিত হয়েছে। কোরআনে বর্ণিত এসব আইন কানুনের বিস্তারিত ব্যাখ্যা পাই হাদীসে রাসুলে। কাজেই হাদীস কোরআনের পরিপূরক, কোরআনের মূলনীতি সমূহের ব্যাখ্যা। এসব কারণে ইসলামের প্রাথমিক যুগ থেকে হাদীস সংরক্ষণ, লিপিবদ্ধকরণ, উহার সত্যতা ও সঠিকতা যাচাই বাছাই এর ব্যাপারে যথার্থ জ্ঞান আহরণের নিমিত্তে হাদীস বেত্তাগণ যে কোনো ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত ছিলেন। এরই ফলশ্রুতিতে ইলমে হাদীসের বহু শাখা প্রশাখা বিস্তার লাভ করে এবং হাদীস সংক্রান্ত বিষয়ের সংখ্যা দাড়ায় প্রায় শতাধিক। হাদীসের যাচাই বাছাই এর জন্য হাদীস বেত্তাগণ যে সতর্কতা অবলম্বন করেছেন তা পৃথিবীর ইতিহাসে নজীরবিহীন। হাদীসের সনদ ও মতন, বর্ণনা ও মূলবক্তব্য এ দুটি ক্ষেত্রে মোহাদ্দেসগণ পরীক্ষা নিরীক্ষার মাপকাঠি কঠোরভাবে প্রয়োগ করেছেন। রাবীদের ব্যক্তিগত আচরণ, চরিত্র, বিশ্বস্ততা মেধা প্রভৃতি বিষয়ে পুংখানুপুংখভাবে নিষ্ঠার সাথে আলোচিত হয়েছে। তাই দেখা যায় লক্ষ লক্ষ হাদীস কঠোরভাবে পরীক্ষা করে তারা মাত্র কয়েক হাজার হাদীস তাঁদের গ্রন্থের জন্য মনোনীত করেছেন। ইমাম মালেক তাঁর মোয়াত্তায় এক লক্ষ হাদীস থেকে বাছাই করে মাত্র ১৭২০টি হাদীস গ্রহণ করেছেন। তেমনিভাবে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল তিন লাখ হাদীস তেকে বেছে নিয়েছেন ত্রিশ হাজার হাদীস তাঁর কিতাবের জন্য। ইমাম বোখারী তাঁর জামেয় ছহীতে প্রায় ৬ লাখ হাদীস থেকে মাত্র ৭৩৭৯টি হাদীস গ্রহণ করেছেন। আর ইমাম মুসলিম ৩ লাখ হাদীস থেকে তাঁর গ্রন্থে ৪ হাজার হাদীসের সংকলন করেছেন। এভাবে আরো অনেকের নাম উল্লেখ করা যায়। নিঃসন্দেহে বলা যায় আমাদের মোহাদ্দেসগণ রাসুল (সা.) এর হাদীসের বিশুদ্ধতা রক্ষায় যে সব কার্যক্রম গ্রহণ করেছিলেন অন্য কোনো জাতি তাদের মুখ্য ধর্মীয় গ্রন্থের জন্যও করেননি। তাই ঐতিহাসিক ম্যাগলিউথ যথার্থই বলেছেন "হাদীসের জন্য মুসলমানগণ যত ইচ্ছে গর্ব করতে পারেন- তা শুধু তাদের পক্ষে শোভা পায়। আর এর স্বাক্ষ্য হচ্ছে তাদের প্রনীত বিরাট জীবনী সাহিত্য যা আসমাউর রিজাল ও ইলমে জারহে ওয়া তা'দীল নামে খ্যাতি লাভ করেছে।"

হাদীসের বিশুদ্ধতা ও তার সংরক্ষণের জন্য মোহাদ্দেসগণ যে কার্যক্রম গ্রহণ করেছিলেন তার ফলশ্রুতি হিসেবে আজ ১৪০০ বছর পরও আমরা সন্দেহাতীতভাবে জানতে পারি বর্ণিত প্রত্যেক হাদীসের প্রকৃত অবস্থান। এ প্রচেষ্টায় যে তারা সাফল্য অর্জন করেছিলেন তা অতুলনীয়। তার অকাট্য প্রমাণ সাম্প্রতিককালের কিছু উদ্ধারকৃত অতি প্রাচীন মূল দলিল। বিভিন্ন মোহাদ্দেসগণের বর্ণনামতে রাসুলে করিম প্রায় আড়াইশ দাওয়াত নামা, সন্ধিপত্র, নির্দেশ নামা, বিভিন্ন সময় লিখিতভাবে প্রেরণ করেছিলেন। মোহাদ্দেসগণ তার বিষদ বিবরণ তাঁদের গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করে গেছেন। কালের গর্ভ থেকে এসবের যে কয়টি উদ্ধার হয়েছে তা থেকে প্রমাণ হয় যে মুসলিম মনিষীগণ কতদুর বিশ্বস্ততার সাথে হাদীস সংগ্রহ সংকলন ও সম্পদনা করেছেন। উদ্ধারকৃত দলিলগুলির বর্ণনা দেওয়া গেলঃ

(১) সম্রাট মাকাওকিছের নিকট লিখিত পত্রঃ

হোদায়বিয়ার সন্ধির পর অসংখ্য দাওয়াত নামা বা ইসলাম গ্রহণের আহ্বান সম্বিলিত চিঠি আরব ভূমির নিকটে অবস্থিত রাজ্যগুলির রাজন্যবর্গের নিকট পাঠানো হয়। তার একটি ছিল মিসরের খৃষ্টান শাসনকর্তা মাকাওকিসের এর নিকট লিখিত দাওয়াত নামা। এ দাওয়াত নামার বর্ণনা প্রায় সব হাদীস গ্রন্থে পাওয়া যায়। দাওয়াত নামাটি ১৮৫০ সালে মিসরের এক গির্জায় ফরাসী পন্ডিত মসীয়ে বারতোলমী কর্তৃক আবিস্কৃত হয় যা বিশেষজ্ঞদের মতে রাসুলুল্লাহ (সা.) কর্তৃক লিখিত মূল চিঠি বলে সাব্যস্ত হয়। এ চিঠি খানা বর্তমানে ইস্তাম্বুলে সংরক্ষিত আছে। উদ্ধারকৃত চিঠির বিবরণ এবং হাদীস ও সিরাত গ্রন্থে বর্ণিত চিঠির বিবরণে কোথাও গরমিল নেই শুদু মাত্র একটি শব্দ ছাড়া। চিঠিতে রয়েছে দে আয়াই- আর কিতাবে আছে দাইয়াহ। তবে দুটি শব্দের ভাবার্থ এক (রাসুলে আকরাম কি ছিয়াছি জিন্দেগী- ১৩৬ পৃ.)।

এখানে প্রনিধানযোগ্য যে এ চিঠি খানির উপর প্রাপ্ত সীলমোহর ও তার রূপরেখা হুবহু হযরত আনাস (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস মোতাবেক যাতে ৩টি শব্দ মোহাম্মদ, রাসুল, আল্লাহ তিন সারিতে খোদাই করা ছিল বলে বলা হয়েছে। এ হাদীসটি সহীহ মোসালেম ও বোখারীতে উল্লেখ আছে।

(২) মুনজির ইবনে ছাওয়ার এর নামে পত্র ঃ বাহরাইনের শাসনকর্তা মুনজির ইবনে ছাওয়ারের নিকট তার ইসলাম গ্রহণের পর রাসুলে করিম এর লিখিত নির্দেশ নামা ইবনুল কায়েম তাঁর জাদুল মাআদ এবং কাস্তালানী কর্তৃক মাওয়াহিবে লাদুনিয়া গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। রাসুল কর্তৃক লিখিত মূল

চিঠিখানি ১৮৬২ সালে দামেস্কে পাওয়া যায়। প্রাপ্ত চিঠির বিবরণ বর্ণিত চিঠির বিবরণের সাথে কোন গরমিল নেই শুধু একটি শব্দ ছাড়া। চিঠিতে আছে "লাইলাহা গাইরাহু" কিন্তু কিতাবে আছে "লাইলাহা ইল্লাহু" এ দুয়ের অর্থ এক।

(৩) নাজ্জাশীর নামে লিখিত পত্রঃ ১৯৩৮ সালে দামেস্কে নবী করীম কর্তৃক লিখিত একটি পত্র সম্রাট নাজ্জাশীকে লিখা পাওয়া যায়। পত্রখানা ১৩$\frac{১}{২}$ ×৯ চওড়া একটি কোমল চামড়া ১৭ লাইনে লিখিত। পত্র খানার নিম্নভাগে নবী (সা.) এর সীল মোহর রয়েছে। প্রাপ্ত চিঠি ও সিরাতে হালাবিয়ায় বর্ণিত পত্রখানির বিবরণ একই রকম।

(৪) ইরান সম্রাটের নিকট লিখিত পত্র- ইরানের সম্রাট খসরু পারভেজের নিকট ইসলামের দাওয়াত দিয়ে রাসুলে খোদা একখানা চিঠি পাঠান। দূত আব্দুল্লাহ ইবনে হুজায়ফা চিঠিখানা বাদশাহ খসরুকে হস্তান্তর করার পর খসরু ক্রোধান্বিত হয়ে তা ছিঁড়ে ফেলেন। এ ঘটনা হাদীস ও ছিরাত গ্রন্থ সমূহে বর্ণিত হয়েছে। এ ছেড়া চিঠিখানি ১৯৬২ সালের নভেম্বর মাসে লেবাননের প্রাক্তন মন্ত্রী হেনরী ল্যাজের ব্যক্তিগত পাঠাগারে ছিল। প্রাপ্ত চিঠিখানির মধ্যেখানে ছেড়া এবং নিম্নভাগে রাসুলুল্লাহর সীলযুক্ত। ২১ জুন ১৯৬৩ সালে কোহিস্তান পত্রিকায় পূর্ণ বিবরণ সহ এ চিঠির ছবি প্রকাশিত হয়।

(৫) সহিফায়ে হাম্মামঃ হযরত আবু হোরায়রা (রা.) তার শাগরিদ হাম্মাম ইবনে মোনাবেহকে শতাধিক হাদীস লিখে দিয়েছিলেন যা ছহিফায়ে হাম্মাম নামে প্রসিদ্ধ। এ সব হাদীসগুলি ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল তাঁর মোছনাদে স্থান দেন। এ ছহিফার ২টি পাভুলিপি হালে আবিস্কৃত হয় এবং ডঃ হামিদুল্লাহর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। পাভুলিপিতে লিখিত হাদীস ও মোছনাদে গৃহীত হাদীস একইভাবে বর্ণিত হয়েছে। মোহাদ্দেছীনদের রেওয়ায়েতে অতুলনীয় বিশ্বস্ততার নজীর এর চেয়ে আর বেশী কি হতে পারে?

উপরিল্লিখিত মূল পাভুলিপি আমাদের মোহাদ্দেছ ও হাদীস সংগ্রহকারীদের বিশ্বস্ততা ও নিষ্ঠার অকাট্য প্রমাণ।

প্রসিদ্ধ প্রাচ্য বিশারদ ডাঃ স্প্রীংগার বলেছেন "দুনিয়ার এমন কোন জাতি ছিল না ও নাই যারা মুসলমানদের ন্যায় আছমাউর রিজালের মত একটি শাস্ত্রের আবিস্কার করতে পেরেছে। যা দ্বারা আজ পাঁচ লক্ষ লোকের জীবনী জানা যাচ্ছে।

গ্রন্থপুঞ্জি

১. বিজ্ঞান, সমাজ, ধর্ম- প্রিন্সিপ্যাল আবুল কাসেম
২. ইসলাম সোপান- প্রিন্সিপ্যাল ইব্রাহীম খাঁ ও আহছান উল্লাহ
৩. কোরআন অধ্যয়নের মূলনীতি- সাইয়েদ আবুল হাসান নদভী
৪. তাফসীরে মারেফুল কোরআন- মুফতী মোঃ সফি
৫. মুসলিম সংস্কৃতির ইতিহাস- সম্পাদনা হাদীসুর রহমান
৬. তাফহীমুল কোরআনের ভূমিকা- আল্লামা আবুল আ'লা মওদূদী
৭. মহাগ্রন্থ আল কোরআন কি ও কেন?- মাওলানা একেএম ইউসুফ
৮. তাহরীফ মুক্ত কোরআন- মাওলানা ছমিরুদ্দিন
৯. কোরআন পরিচিতি- মহিউদ্দিন খাঁন
১০. আহমদ দিদাত রচনাবলী- আহমদ দিদাত
১১. কম্পিউটাওে কোরআন- তারিক সিদ্দিকী, আব্দুর রাজ্জাক
১২. মাসিক পৃথিবী- অষ্টম সংখ্যা, ১১বর্ষ
১৩. আল কোরআনের পরিচয়- মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী
১৪. বাইবেল কোরআন বিজ্ঞান- ড. মরিস বোকাইলি
১৫. ফাতহুল বারী-
১৬. হাদীসের তত্ত্ব ও ইতিহাস- মাওলানা নুর মোহাম্মদ আজমী
১৭. হাদীস সংকলনের ইতিহাস- মাওলানা মোহাম্মদ আব্দুর রহীম
১৮. কিতাবুল মাওযুয়াত- মোল্লা আলী কারী
১৯. হাদীস সংকলনের ইতিহাস- মাওলানা মুফতী আমিনুল ইসলাম
২০. সীরাতে ইবনে হিশাম- ইবনে হিসাম
২১. উম্মুল কোরআন- চৌধুরী পাড়া মাদ্রাসা
২২. জঈফ ও মওজু হাদীসের সংকলন- আল্লামা নাসিরুদ্দিন আলবানী
২৩. Life of Mohammad- Willium Muir
২৪. History of Arabs- P.K. Hitti
২৫. The Holly Book of Islam- Dr. M Q M Abdullah
২৬. History of the printings of the Quran- Dr. Mufakhar Hussain
২৭. The Sprite of Islam- Dr. Afif A. Tabarrah
২৮. Selected Arabic & Persion Epgraph- Yeakub Ali
২৯. মাওজ ও মোনকীর, রাওয়ায়েত ডঃ সাঈদ আহসান সাউদ
৩০. মোকাদ্দমায়েই ছহিহ মুসলিম

------- সমাপ্ত-------

লেখক পরিচিতি

জনাব এ কে এম এনামুল হক ১৯৩৭ সালের ১ সেপ্টেম্বর ফেনী জেলার সোনাগাজী উপজেলার চরচান্দিয়া গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা মরহুম হাকীম মাওলানা আবদুল হক সাহেব একজন স্বনামধন্য সত্যনিষ্ঠ আলেম ও ওলিয়ে কামেল ছিলেন। তাঁর সমাজসেবা জনহিতকর কাজ বিশেষ করে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাই তিনি দীর্ঘ ২৫ বছরের বেশী সময় ৬নং চরচান্দিয়া ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট/চেয়ারম্যান ছিলেন। তিনি ওলামা বাজার ও তথায় অবস্থিত হোছাইনিয়া মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা। জনাব এনামুল হক সাহেব তাঁর পিতার প্রতিষ্ঠিত সেই মাদ্রাসার প্রথম ছাত্র। তিনি দেওবন্দ মাদ্রাসায়ও অধ্যয়ন করেন এবং পরবর্তীকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে বি. এ (সম্মান) ও এম. এ ডিগ্রী অর্জন করেন। পরবর্তীতে বিমান বাহিনীতে কমিশন্ড অফিসার হিসেবে নিযুক্তি প্রাপ্ত হন। এছাড়াও বাংলাদেশ বিমানে জেনারেল ম্যানেজার ও নাইজেরিয়া এয়ার লাইনস-এ সিনিয়ার প্লানিং ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে চাকুরী করেন। বর্তমানে তিনি অবসর যাপন করছেন।

৪৩৫/ক, ওয়ারলেস রেলগেইট, বড় মগবাজার
ঢাকা-১২১৭, ফোন: ০১৭১-১১২৮৫৮৬, ০১৫৫২৩৫৪৫১৯